লীলা মজুমদার
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

প্রকাশক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাশ
৩/১ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৬৭

প্রচ্ছদ
তাপস দত্ত

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ—

সূচীপত্র

আসামী

বিহার ও পশ্চিম-বাংলার মাঝখানে বেশ খাণিকটা জংলী বুনো জায়গা আছে। তার বিষয়ে মাঝে মাঝে নানান্ অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। ভূতের গল্প, জানোয়ারের গল্প, আদিবাসীদের গল্প। সাধারণ লোক সে সব জায়গায় যায় ও নি আর সম্ভবতঃ দু চারজন ছাড়া কেউ যাবে ও না। তবে জঙ্গলের ধার দিয়ে যে-সব ভারতীয় রাজ-পথ গিয়েছে, সেখানে যথেষ্ট যান-বাহনের চলাচল আছে। ঘন বনের মাঝে মাঝে ধান-খেত আছে, কয়েক ঘর লোকের বাস আছে। আরো লোক আছে, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের লেন-দেন খুব কম, তাদের এক রকম বনবাসীও বলা চলে। ঘন জঙ্গলে তাদের ছোট ছোট গাঁ আছে, তাদের জীবন যাত্রার ধরণ সেই আদ্যিকালের মতো, অজানা সব দেবতার পুজো করে, প্রত্যেক ঋতুকে সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে পরবের দিন পালন করে। কত রকম তন্তর-মন্তর তুক-তাক করে ওরা, কত রকম গাছ গাছালি দিয়ে ওষুধ বানায়, বাঘকে বশ করবার নিয়ম জানে। সুন্দর-বন এলাকার বাঘ সব মেরে মেরে শেষ করে দিয়েও, ভারতের অন্যান্য জায়গায়, বিশেষ করে মধ্য-প্রদেশে এখনো বেশ কিছু বাঘ আছে। এখানেও আছে।

ভাল্লুক, বুনো শূওর, অজগর সাপের কথাও শোনা যায়। লোকে সাবধানে চলে।

মাঝে মাঝে দেখা যায় ভারতীয় রাজপথের দুই ধারেই ঘন বন। বেশির ভাগই সংরক্ষিত বন, সেখানে শিকার করতে হলে, কিম্বা কাঠ কাটতে বা আঠা মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হলে অনুমতি পত্র নিতে হয়। আটি দশটা গাঁয়ের জন্য একটা ছোট পোস্টাপিস; থেকে থেকে ছোট শহর আছে, সেখানে একজন পাস করা ডাক্তার, নিদেন কম্পাউণ্ডার থাকে, সদর শহরে হাসপাতালও আছে। তবে ওষুধ-পত্রের-জন্য গাঁয়ের লোকদের টোটকার ওপরেই বেশি বিশ্বাস। অন্যায়ের সাজাও মোড়ল-ই দিয়ে থাকে।

এ-সব জায়গায় বেশ ট্রাক চলাচল আছে কয়লা দিয়ে যায়; চাল, চূণ, ইঁট, আলু দিয়ে যায়; আর কাঠ বোঝাই হয়ে ফিরে যায়। তাই পেট্রলের ব্যবস্থা রাখতে হয়; পেট্রল স্টেশন না থাকলেও, তেলের গুদাম আছে। তেল কোম্পানির ছোকরা অফিসারদের-ও এ-সব জায়গায় খুব যাতায়াত। জায়গাটার ভারি একটা মোহ আছে, একবার শুনলে অমনি যেতে ইচ্ছে করে, একবার গেলে আবার যেতে ইচ্ছে করে। তাই পথের ধারে চা-জলখাবারের আস্তানাও আছে।

বর্ষার শেষের দিকে সন্ধ্যেবেলায় এই রকম একটা আস্তানায় জনা দশ-বারো লোক জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পরস্পরের অচেনা, বাধ্য হয়ে চেনা করে নিতে হচ্ছে। কারণ বৃষ্টি কখন থামবে তার ঠিক কি, আর বৃষ্টি থামলেও আশে পাশের নদী-নালাগুলো ফুলে ফেঁপে গর্জন করে যে-রকম ছুটে চলেছে, যে তাদের ওপরে পুলগুলো কোথাও কাঁপছে, কোথাও ডুবেছে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

সবার শেষে যে ট্রাকটা এসে দাঁড়াল, সেটা একেবারে খালি হলেও, তার চালকটি ঝম-ঝম বৃষ্টির মধ্যেও তিরপল তুলে টর্চ ফেলে,

গাড়ির পেছন দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করে নিল। তেল-গুদোমের সঙ্গে লাগোয়া চায়ের দোকান, ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করা যায়, একই মালিক বোধ হয়। জানলা দিয়ে সবাই নবাগতর কাণ্ড দেখে অবাক হল।

সে ভিতরে ঢুকে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল "কি জানি, বিশ্বাস নেই!" শুনে সবাই বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকাল। দোকানের পেট্রোম্যাক্সের আলো বৃষ্টির ধারায় লেগে কেমন ঝকঝক করছে, তার বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না! বাঘ-টাঘ নয় তো?

লোকটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বলল, "কি চাকরি বলুন তো মশাই প্রাণ হাতে নিয়ে ঘোরা! এমনি তেই বাঘ, ভালুক, সাপের উপদ্রব, তার ওপর এই!" সবাই একবাক্যে বলল "কি এই? এই কি?" লোকটা কপালে দুচোখ তুলে বলল, "ও মা! সে খবরও পৌঁছয় নি বুঝি, ঘনিষ্ঠ থলিতে জোড়া খুন! চারদিকে খানা-তল্লাসি চলছে। ওহে মালিক, দরজা বন্ধ করলে পার। এমনিতেই এই দুর্যোগে বনের পশু ঘরে সেঁদোয়!" বাকিরা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, "জোড়া খুন!" লোকটা একটু বিরক্ত হল, "আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এ তো হামেশাই হচ্ছে।। রাতে বোধ হয় এখানেই বাস করা। ওহে মালিক, খাবার-দাবার পাওয়া যাবে না?"

মালিকের মুখটাও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। তবে এই দুর্যোগে তো উনুন ধরে নি, কাঠ-কয়লার বড় আংটায় দুধ জ্বাল হয়েছে। বন-বিভাগের জন্য অনেক পাঁউরুটি এসেছে, লালচিনি আছে, গুড় আছে। খাবারের কি অভাব। কিন্তু মলটা কারা?"

লোকটা গায়ের ছেঁড়া বর্ষাতি আর পায়ের পুরনো জুতো খুলে ফেলে আরাম করে বসে বলব, "কে সদরের মহাজন আর তার সাকরেদ। কই, খাবার-দাবার আন, কাল রাতে শেষ খেয়েছি।" রোগা লিকপিকে ভীতু মতো চেহারা লোকটার, ট্রাক চালায় কি করে কে জানে? নিশ্চয় পিঠের দিকে বালিশ রাখে। হাতের পায়ের মাস্‌লগুলো পাকানো দড়ির মতো উঁচু উঁচু। গায়ের রং খুব কালো।

ও-রকম দুধ এরা কেউ জীবনে খায় নি। দুধ তো নয়, যেন ক্ষীর, তাতে এত মাখন যে ঠোঁট চটচট করে, আর চিনি না হলেও চলে এমনি মিষ্টি. আর সে কি সুগন্ধ! কিসের দুধ কে জানে, গোরুর নিশ্চয় নয়। "কি মালিক, ভয়সার দুধ নাকি?" মালিক হাসল, "পোষা ভয়সার দুধ কি এত ভালো হয় বাবুজি? এ হল বুনো ভয়সার দুধ। কলেকটর সায়েব বলেছেন এদের বাইসন বলে।

তেল কোম্পানির ছোকরা অফিসারের সঙ্গে এ অঞ্চলের বিখ্যাত বন দেখতে এসে, বেচারা ছোটমামা, পানু, গুপি এতক্ষণ ভয়ে শীতে শিঁটিয়ে ছিল, এবার ছোটমামা হঠাৎ বললেন, "ঐ একই, ভঁয়সা থেকে বাইসন। সায়েবরা বলে বাইসন, আমরা বলি ভঁয়সা, জংলী ভঁয়সা। জংলী ভঁয়সা দোয়ালে কি করে?" মালিক বলল, "ঠিক জংলী নয়, বাবুজি. সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বুনো জানোয়ারের পালে মহামারী লাগলে ওরা রুগ্ন জানোয়ারগুলোকে ফেলে ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে দলে দলে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। কয়েক বছর আগে বাইসনদের দলে বসন্তরোগ হল, তারা সতেরোটা রুগ্ন

জানোয়ার ফেলে পালিয়ে গেল। বনবাসীরা তাদের টোটকা ওষুধ-পত্র করল। বড়গুলো সব মরে গেল। সাতটা বাচ্চা বাঁচল এরা তাদের বংশধর। এখন বনের গাঁয়ে মস্ত বাইসনের পাল হয়েছে। বাইস সের করে এই রকম দুধ দেয়। আমরা কেউ অন্য দুধ খাই না।"

ছোট-মামা পানুকে বললেন, "নোট করে রাখ, ভারি ইনটারেস্টিং। কিন্তু জোড়া খুনের কথা শুনে অবধি আরো কিছু ভালো লাগছিল না। রোগা ট্রাক চালক এবার বলল, "তাই বলে কি আর সত্যি সত্যি মরে গেছে।" "এ্যাঁ, বল কি? মরে নি? তবে যে বললে জোড়া খুন?" "কি এমন তফাৎটা হল, বলুন? পিটিয়ে পাট করে দিয়েছে। দাঁতটা নড়ে গেছে, ঠোঁট ফুলে শাঁকালু, কপালে কালসিটে, খামচা-খামচা চুল ছেঁড়া, উঃ!" লোকটা শিউরে উঠল! তারপর একগাল হেসে বলল, "ওদের মুগুর ভাঁজার মুগুর দিয়ে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছে।"

সবাই বলল, "দেখে এলে নাকি? এত জানলে কি করে?

"তা জানব না? ও ছাড়া তো কারো মুখে কোন কথা নেই! সবাই খুব খুসি। মহাজন ব্যাটা কত লোকের সর্বনাশ করেছে, হবে না খুসি! নাকি এদিকে পালিয়ে এসেছে। "বনবাসী-কাসী কি না কে জানে!"

মালিক উঠে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল। "বনবাসীরা মিছিমিছি খুন-খারাবি করে না, বাবুজি, তবে থেকে থেকে সাজা দেয়।" "নাকি কার ট্রাক চুরি করে, ট্রাক ড্রাইভার সেজে পালিয়েছে। এইখানেই কোথাও আছে বোধ হয়। এই ঘরেই থাকতে পারে। কে-ই বা কাকে চেনে।" এই বলে লোকটা বিশ্রী করে হাসতে লাগল। সবাই ফ্যাকাশে মুখে বলল, ক্—ক্—ক্—কি? ক্—ক্—ক্—কে?" লোকটা সাপটে সুপটে খেয়ে বলল, পুলিসের লোক চারদিকে চারিয়ে আছে, তার ফাঁক দিয়ে ব্যাটা না

সুড়ুৎ করে গলে যায়।" শুনে ছোট মামা একটু উস্‌খুস্‌ করে উঠলেন। পান্নুগুপি এ ওকে কনুইয়ের গুঁতো মারল যেন খুনে গুণ্ডা যে কে সেটা ওদের বুঝতে খুব বাকি নেই। বাকিরা সবাই পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

রোগা লোকটার পকেট থেকে একটা জঘন্য বিড়ি বের করে বলল, এত ভয় পাবার কি হল বুঝলাম না? শুনে এলাম মহাজন ব্যাটারা [illegible]লোকের সর্বনাশ করেছে। কিছুদিন আগেই নাকি এক[illegible] বিধবাকে ছেলেপুলে সুদ্ধ ঘরছাড়া করেছে, তাও মাত্র পাঁচশো টাকা দেনার দায়ে। ক্যায়সা কড়া জান রে বাবা! ভালো লোক হলে মরে ভূত হয়ে যেত। দুষ্টুদের স্বাস্থ্য বড় ভালো হয় দেখছি। আর হ্যাঁ, ওদের ঠিক ঐ পাঁচশো টাকাই খোয়া গেছে। সিন্দুকের বাকি জিনিস যেমন কে তেমন? একজন আধবয়সী ভদ্রলোক বললেন, বনবাসীদের কাজ নাকি? ওদের গাঁয়ে গিয়ে তদন্ত করলে হয় না? মালিক কাষ্ঠ হেসে বললে, তা যাক না তদন্ত করতে, বন-পুরুত ওদের ধূলো-পড়া করে সকলের চোখের সামনে নস্যাৎ করে দেবে না! "রোগা লোকটা বেজায় হাসল।" তা হলে গুণ্ডারা দেশের ও দশের উপকার করেছে বল। আচ্ছা, চলি! আর হ্যাঁ, এই ধর আমার ট্রাকের চাবি, আমার আবার জলে ভিজে ডান ঘাড়ে খিল ধরে গেছে। গেলাম।" এই বলে গাড়ির চাবি টেবিলের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে, স্যাঁৎ করে লোকটা ঝড়-বাদলে মিলিয়ে গেল। সবাই একেবারে হাঁ!

ছোট মামা একবার জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললেন, "ইয়ে কি বলে, এমনি এমনি পালিয়ে যেতে দেওয়াটা কি ঠিক হল? হাজার হক খুনে গুণ্ডা তো। সবাই মিলে ঘিরে ফেললে হত না? ঐ তো রোগা পটকা!" তেল গুদোমের চাকরটা বলল "তাতে কি এসে গেল, বাবুজি, যে ঐ ঢাউস দুটো মহাজনকে পিটিয়ে কাদা বানায়, তার গায়ের জোরের কমতি নেই। ক্যায়সা পাকানো

দড়ির মতো হাত দুটো দেখেছিলেন ? "তেল কোম্পানির ছোকরা অফিসার বলল, "সব কায়দা, মশাই, কায়দাটি জানা থাকলে গায়ের জোরের দরকার করে না। গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্বি হলেই যদি চলত তবে আমাদের মালিকই-তো গুণ্ডা বনে যেত ! কি বল মালিক ? মালিক ভয়ে ভয়ে ইদিক উদিক তাকিয়ে বলল, "যাই, ও পাশের দোরে খিল দিয়ে আসি।

গেল তো গেলই, ফেরার নাম করে না। সবাই হাসা-হাসি করতে লাগল। চাকরটা উঠে মালিকের ঘরে গিয়ে দেখে এল, "কি জানি, মালিককে তো দেখছি না। হয়তো ঘাবড়ে গেছেন।"

ততক্ষণে বৃষ্টিও ধরে গিয়েছে, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এখন কি করা, সকালের আগে তো জল নামবে না। এমন সময় চ্যাঁচামেচি, আলো, লোকজন। সদর থেকে পুলিস এসেছে, মহাজন ঠ্যাঙানির তদন্ত চলছে। সবাই এক বাক্যে রোগা পটকা লোকটার বর্ণনা দিল, চাবি-গাছি দেখাল, পরিত্যক্ত ট্রাকটা দেখাল। তার বেশি কিছু বলতে পারল না। সব দেখে পুলিসরা অবাক ! "আরে এ যে আমাদেরই ভাড়া করা ট্রাক দেখছি !" মালিকের ভয় পাওয়া নিয়ে খুব একটা হাসা-হাসিও হল। অনেকেই ওকে চেনে, নাকি সন্ধ্যের পর বাড়ির বার হয় না। যাই হক, ভোরে একবার বনের গ্রামে গিয়ে দেখলেই হবে।

এমনি করে রাত কেটে গেল। ভোরে ছোট মামা পানু গুপিকে নিয়ে তেল কোম্পানির অফিসারের গাড়িতে চড়ে বসলেন। বনে বেড়াতে আসাটা বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপারেই দাঁড়াল শেষটা। এর মাস ছয় পরে, তেল কোম্পানির ছোকরার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হলে গুপি পানু মহাজন ঠ্যাঙানোর রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করল, "পল্টুকাকা, আপনি ওখানে আবার গেছিলেন নাকি ? ফেরারী আসামী ধরা পড়ল ?"

পল্টুকাকা হাসলেন, "আরে দুঃ, দুঃ, তাই পড়ে কখনো ?

দেখলি না কেমন বুনো গিরগিটিটা মতো দেখতে, ওকে পাবে পুলিসে, তোরাও যেমন!" ছোট মামা বললেন, অবিশ্যি রোগা লোকটা কিছু ফেরারী আসামী নয়। ও আমাদের সমাদ্দার ইনভেস্টি-গেশনসের পি চৌধুরী। যেখানকার যত গুণ্ডা ধরা ওর কাজ নয়। যথেষ্ট ক্লু দিয়ে গেছিল তবু পুলিসরা না ধরতে পারলে কি ওর দোষ!" পল্টুকাকা বললেন, "চাঁদুদা, তুমি ক্ষেপেছ!" পরে ছোট মামা গুপি পানুকে বললেন, "কে আসামী কে গোয়েন্দা তাও চিনলি না? যাকে দেখে আসামী মনে হয়, সে গোয়েন্দা আর যাকে দেখে ভীতু কাপুরুষ মনে হয়, সে-ই আসামী। অর্থাৎ তেল গুদোমের মালিক। সে হল মোড়লের ছোট ভাই, অন্যায়ের সাজা দেওয়া ওর কাজ। পি চৌধুরীর কাছে শোনা।"

———

গোয়েন্দা আপিসে চাকরি পেয়ে অবধি গুপির ছোট মামার দিনগুলো নানারকম লোমহর্ষক অভিজ্ঞতায় ভরে থাকত। গুপি হিংসায় জ্বলে যেত। অঙ্ক ভুল করত। তাই নিয়ে স্কুলে আর বাড়িতে দু'জায়গায় অশান্তি হত। গুপির দাদামশাই মাঝে মাঝেই ওর বাবাকে বলতেন, 'ভাগ্যিস চাঁদুর চাকরি-স্থল বর্ধমানে, নইলে তোমার ছেলের পড়াশুনো হয়েছিল আর কি! অথচ ছোটমামা যখন কলকাতায় আসত তখন ওর জন্য বড় বড় চিংড়ি মাছ খুঁজে আনা হত; গয়লাবাড়িতে গিয়ে বেশি করে দুধ চোখের সামনে দুইয়ে আনা হত, নইলে নাকি পায়েস ভালো হত না। বলা বাহুল্য সেই দুদিন গুপিকে দাদুর বাড়িতে যেতে দেওয়া হত না, যাতে ছোট মামা ওর উপর বড় বেশি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। গুপির হাসি পেত। কারণ তাতে গুপির খুব বেশি অসুবিধা হত না। যেহেতু রবিবারে পানুদের বাড়িতে গিয়ে, বড় মাস্টারের গল্প শোনা আর রাম কানাইয়ের হাতে তৈরি ভালো মন্দ খাওয়া আজকাল একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছিল। পানুর মাঝে পায়ের অসুখ হয়ে চলাফেরা বন্দ হয়ে গিয়েছিল, এখন সে-সব একেবারে সেরে

গেছে। এবার সে স্কুলের স্পোর্টসে যোগ দিয়ে বেগুনতোলা রেসে প্রথম হয়ে 'দুর্গমের দুঃসাহসী' বলে একটা বেজায় ভালো বই প্রাইজ পেয়েছিল। সেই-বই পড়ে আর পানুর চুল খাড়া। ছোট মামাও বইটা চেয়ে নিয়ে বর্ধমানে গিয়ে পড়েছিল। ফিরিয়ে দেবার সময় বলেছিল, 'বই মন্দ তা বলছি না, কিন্তু আমার একেক দিনের অভিজ্ঞতা এর চেয়েও শত-গুণে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর।'

আশাকরি এর থেকেই সবাই বুঝতে পেরেছে যে পানুদের বাড়িতেই ছোটমামার গুপির সঙ্গে দেখা হত। মাঝে মাঝে পানুর মেজকাকা আর তাঁর সি-আই-ডি বন্ধু কানু সামন্তও এসে হাজির হতেন। দু'একবার দিল্লীর পুলিসের চীফ বিনু তালুকদার পর্যন্ত এসেছিলেন। সেই নেপোর বইয়ের ব্যাপারটা থেকে এদের নিজেদের একটা দলের মতো গড়ে উঠেছিল। বিনু তালুকদার অনুপস্থিত থাকলেও সে-ই ছিল এক রকম দলের চাঁই

পুজোর ছুটির আগের রবিবার সকালেই গুপি শুনেছিল সে ছোটমামা এসেছে দেখা করে যেতে, কারণ ছুটিতে তার আসা হবে না। নাকি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে। শুনে বড় মাস্টার মুখের উপর একটা হাত ঢাকা দিয়ে একটু খক্ খক্ করে কেশে নিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে কাঠের ঠাঙের উপর খানিকটা চুলকে নিলেন। বলা বাহুল্য এই শেষের ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই রবিবার সন্ধ্যার আগে পানুদের বাড়িতে।

বড় মাস্টার সবে বরানগরে তাঁর মামার বাড়িতে গুপ্তধন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর এক গল্প ফেঁদেছেন, এমন সময় স্বয়ং ছোটমামা এসে উপস্থিত। অমনি তখনকার মতো গল্পটা শিকেয় তোলা রইল। তার বদলে ছোটমামাকেই সবাই ঘিরে ধরল। পাশের ঘর থেকে নেপো বেড়ালের ফ্যাঁস ফ্যাঁস আর ঘরের মেঝের উপর নখে শান দেবার খড়-খড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আজকাল রবিবার বিকেলে তাকে ঘণ্টা তিনেক কুকুরের কলার আর চেন দিয়ে

বেঁধে রাখতে হয়। তা না হলে বড় মাষ্টার মশাই আর ছোটমামা দুজনের ছাল-চামড়া আস্ত থাকত না!

বড় মাষ্টার মশাই উঠে পড়লেন, নাকি নূন গোলায় তাঁর নতুন ছাত্রকে সাত দিনে সত্তরটা অঙ্ক শিখিয়ে দিতে হবে। উনি চলে গেলেই ছোটমামা পা গুটিয়ে আরাম করে বসে বলল, 'হাঁরে পানু, আমি যদি এখন কিছু না খাই, তা হলে রাতে কি আটটার মধ্যে রামকানাই আমাকে কিছু খাইয়ে দিতে পারবে? সাড়ে নটার ট্রেনটা ধরে বর্ধমান যেতে চাই।'

রামকানাই ছোটমামার সামনে একপেয়ালা চা আর ফুলকপির সিঙ্গাড়া নামিয়ে রেখে বলল 'ও আবার নতুন কি কথা হল? প্রত্যেক রবিবার ত রাতে না খেয়ে ওঠেন না।' পানু বলল, রামকানাইদা থামো'। আরেকটু সন্ধ্যা হতেই, এইবার চারদিকে তাকিয়ে ছোটমামা নিচু গলায় বলল, 'তোরা একটু কাছে আয়। কে কোথায় শুনে ফেলবে, ভয় করে। তদন্তের সময় সাবধানের মার নেই।'

'কিসের তদন্ত, ছোটমামা, সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা নাকি?'

পানু, গুপি আরও কাছে ঘেঁষে বসল। 'ঠিক তাই। মুস্কিল হয়েছে যে আমার দুজন হেল্পার দরকার। কিন্তু কাজটা খুব বিপজ্জনক। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। ভাবছি তোদের সাহসে কুলোবে কি না।'

শুনে দুজনেই রেগে গেল। 'আহা, কি কাজ তাই বল না। তোমার চেয়ে আমাদের কম সাহস নাকি? তাহলে আর আমাদের বেছে নিতে না।' ছোটমামা একটু হাসল। 'অসাধারণ সাহসের জন্য তোদের বেছে নিচ্ছি না। তোরা লোকের ভিড়ে বেমালুম মিলিয়ে যেতে পারবি বলেই বলছি। কাকপক্ষীও তোদের গোয়েন্দার চর বলে চিনতে পারবে না। আচ্ছা ঢিল-টিল ভালো ছুঁড়তে পারিস্ তো?'

গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো ছুঁড়তে পারি মানে?' 'মানে আমার গায়ে-পায়ে লাগবে না তো? আমার আবার একটু লাগলেই বড্ড লাগে। ব্যথা ট্যথা একেবারেই সইতে পারি না। শরীরে ভিটামিন ডি'র অভাব।'

গুপি বলল, 'বাজে কথা রাখ। কিন্তু যাব কি করে? বাড়ি থেকে দিলে, তবে তো যাব।'

ছোটমামা কাষ্ঠ হাসি হাসল, 'চাঁদু অত কাঁচা কাজ করে না হে। তোদের অঙ্কের স্যার আমার ছোটবেলার বন্ধু, তা জানিস? সে-ই তোদের গার্জিয়ানদের বলে, তোদের বর্ধমানে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অঙ্ক কষাবে!'

পানুরা তো হাঁ! পূজোর ছুটিতে অঙ্ক স্যারের বাড়িতে বসে অঙ্ক কষতে হবে? ছোটমামা উঠে দাঁড়াল। 'থাক্ তবে দরকার নেই আমার কপালে যা থাকে, হবে। নেপোকেও তো একাই খুঁজে এনে দিয়েছিলাম। ব্যাটা এখন আমাকে থামচালে কি হবে।'

রেগে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু পানু গিয়ে তাকে জাপ্টে ধরতেই ধপাস করে সে তক্তোপোষের উপর বসে পড়ল। 'তুমি গার্জিয়ানদের রাজি করাও, ছোটমামা, আমরা গিয়ে অঙ্ক কষব। তাতে কি হয়েছে। অ্যানুয়েলে বেশি নম্বর পাব।'

ছোটমামা বলল, 'বেশি হাতি পাবি! অঙ্ক কষবার কতটুকুই বা সময় পাবি? আর তারও হয় তো দরকার হবে না। কারণ এও মনে রাখিস যে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। এতটুকু কস্কালেই হয়ে গেল। খালি তোদের মা-বাবাদের জন্য একটু দুঃখ হয়। কে জানে তারা হয়তো তোদের অভাবে কাতর হবে। কিছুই বলা যায় না।'

এই বলে ছোটমামা খাবারের সন্ধানে ওঘরে সরে পড়ল। পানু একটু গম্ভীর হয়ে যাওয়াতে, গুপি বলল, 'চল্, বেশ মজা হবে। বিপজ্জনক না আরো কিছু! ওর বড় সায়েব কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ

ওকে দিল আর কি! তবে গতবারের ভালুকের ব্যাপারটাও কম উপভোগ্য ছিল না। এবং আরেকটু হলেই বেশ গুরুতর হয়ে উঠত অন্ততঃ আমার পক্ষে।'

ছোটমামার যেমন বলা তেমনি কাজ! দেখতে দেখতে গার্জিয়ানদের সঙ্গে অঙ্ক স্যার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। এর মধ্যে যে আবার ছোট মামা আছে সেটা ঘুণাক্ষরেও জানা গেল না। মহালয়ার দিন সকালে একটা লড়-ঝড়ে পুরনো ডজ গাড়িতে অঙ্ক-স্যার এসে গুপি পানুকে তুলে নিলেন। গাড়ির চালকটিও তেমনি কিম্ভুত, রোগা টিংটিঙে, এক মুখ দাড়ি, একটা চোখের উপর সবুজ তাপ্পি লাগানো। ন্যাশন্যাল হাই-ওয়েতে পড়েই গুপি বলল, 'ও দাড়ি আমার চেনা। আর তাপ্পিটাও আমার সেই নাটকের হারানো তাপ্পিটা না?' চালক কাষ্ঠ হাসি হেসে দাড়ি তাপ্পি খুলে ফেলতেই, ভিতর থেকে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। গর্বের সঙ্গে বলল, 'গাড়িটা একজনরা ফেলে দিয়েছিল। কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে নিজে সারিয়েছি। সেই পুরনো লোহালক্কড় দিয়ে।' এরা শুনে অবাক। পথে ওরা পরটা আর কাবাব খেল। বর্ধমানে পৌঁছতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল। লোহালক্কড় আর পুরনো পার্টস দিয়ে সারানো পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো গাড়ি তার চেয়ে আর কত তাড়াতাড়ি যাবে?

বর্ধমানে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা হিম-ঘর আছে। সেখানে আসতেই অঙ্ক-স্যার বললেন, 'চাঁদু, একটু অসাবধান হয়ে পড়ছ নাকি?' ছোটমামা গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি, দাড়ি তাপ্পি পরে অচেনা লোক হয়ে গেল। তারপর যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, অমনি একটা কালো। আম্বাসাডর ওদের গা ঘেঁষে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে একজন আধাবয়সী মোটা ভদ্রলোক বাজপাখির মতো চোখ করে ওদের এক নজর দেখে নিলেন, এইটুকু গুপির চোখে পড়ল।

বর্ধমান স্টেশনের পিছন দিয়েই শের শা'র তৈরি সেকালের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড গেছে, এখন তাকে ন্যাশনাল হাই ওয়ে টু বলে। তারি উপরে একটা খাবারের দোকানের মাথায় ছোটমামার আপিস। ছোটমামা তার সুটকেস নিয়ে সেইখানেই নেমে পড়ল। অঙ্ক-স্যার চালকের জায়গায় বসলেন। পানু গুপি বেশ নার্ভাস। কিন্তু উনি বেশ সহজভাবেই আরো খানিকটা আগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের একটা সরু গলি ধরে, ধান ক্ষেত পেরিয়ে, তালপুকুর ছাড়িয়ে, হয়তো মাইল পাঁচেক গিয়ে একটা ছোট গ্রামে ঢুকলেন। বড় বড় আম কাঁঠাল গাছে ঘেরা গাঁ, চারদিকে ধান ক্ষেত; মাঝখান দিয়ে পথ গিয়ে গ্রামটাকে দুই ভাগ করে দিয়েছে। ডান দিকে একটা কাঠ-গুদাম তারপরে একটা কালো দীঘি, তারপরে একটা পাঁচিল ঘেরা শ্যাপলা ধরা পুরনো দোতলা বাড়ি। তার চারদিকে ফল-ফুলের বাগান, অযত্নে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। সবটাই কেমন নড়বড়ে পোড়ো-পোড়ো দেখাচ্ছিল। খালি এক মানুষ উঁচু পাঁচিলটা আর লোহার পাতের ফটকটাকে সদ্য মেরামত করা হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল।

অঙ্ক-স্যার তিনবার হর্ণ দিতেই গেটটা খুলে গেল। ওরা ঢুকতেই পানু গুপি স্তম্ভিত হয়ে দেখল বাড়ির এক পাশে সেই কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে ঠেস দিয়ে বাজপাখি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবির একটা পকেট এমন ভাবে ছিল যে দেখেই বোঝা গেল ভিতরে কম করেও একটা রিভলবার আছে। গুপিদের হাত-পা হিম। এই নাকি প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়ানো? অঙ্ক-স্যার কিন্তু হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এদিকে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাহলে, কাকা?" লোকটি কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'এরা কারা?'

অঙ্ক-স্যার আড় চোখে গুপিদের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বললেন, 'কাকাকে প্রণাম কর। এরা আমার দুটি ছাত্র, কাকা, ছুটিতে একটু

কোচিং নেবে।' কাকা তাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'তা হলে যেমন গুরু তেমনি চ্যালা বল। কিন্তু সাবধানে কাজ কর, ব্যোমকেশ। সবাইকে সব কথা বলে কাজ নেই। গাড়িটা বুঝি সের দরে কিনলে?' এই বলে কাকা চলে গেলে অঙ্ক-স্যারকে একটু গম্ভীর মনে হল। গেটটা ভিতর থেকে তালা দিয়ে বাড়ির চওড়া বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। অমনি ভিতর থেকে টিকলো নাক, টিংটিঙে রোগা একটা গেঞ্জি পরা বেরিয়ে এসে, গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। অঙ্ক-স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে?' ওরা চমকে উঠল। 'উনি কে মাস্টার মশাই?' 'শুনলেই তো আমার কাকা। এটা আমাদের পৈত্রিক বাড়ি। একতলাটা ওঁর, দোতলাটা আমার। ওঁর হার্টের ব্যামো। তবু উনিই দেখাশুনো করেন। আর দেখ, গুপি তোমার ছোট মামার কথা ওঁর সামনে কখনো বলবে না, তা হলেই কিন্তু সব পণ্ড হয়ে যাবে। এবার চল, চানটান করতে হবে। অবিনাশ বেজায় ভালো রাঁধে। শুঁটকো লোকটার নাম অবিনাশ।'

দোতলায় পানুদের দক্ষিণমুখী ঘরে কে যেন ওদের ছোট সুটকেস দুটি রেখে গেছিল। দুটি সরু তক্তোপোষে পরিপাটি দুটি পাতলা তোষক দিয়ে বিছানা পাতা। জানালার সামনে সরু লম্বা একটা কাঠের টেবিল। একটা আলনা, একটা বেঞ্চি একটা পুরনো কাঠের চেয়ার, দুটি টুল। অথচ ঘরের দেয়ালে আশ্চর্য সব নক্সা কাটা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর। এদিকে বিজলি-বাতি নেই। বোধ হয় কোনো পূর্বপুরুষ শখ করে আঁকিয়েছিলেন। বেজায় খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তোয়ালে সাবান নিয়ে ওরা বাড়ির পিছনে কুয়োর পাড়ে গেল। সেখানে একজন সামনের দাঁত ভাঙা ষণ্ডামার্কণ্ড লোক গামছা পরে দাঁড়িয়েছিল। সেই জল তুলে বালতি বালতি ওদের গায়ে মাথায় ঢেলে দিল। সে যে কি আরাম, যে ও-ভাবে না নেয়েছে, সে বুঝবে না। ওরা গা মাথা মুছছে, এমন

সময় লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে? কি উদ্দেশ্যে?'

বিনু তালুকদারের চ্যালার কানে কথাগুলো ঠক্ করে লাগল। এ তো জল-তোলার লোকের ভাষা নয়। পানু বলল, 'ব্যোমকেশ বাবুর ছাত্র আমরা। ছুটিতে ওঁর কাছে পড়ব বলে এসেছি।' ওদের বুক টিপটিপ করতে লাগল।

বিনু তালুকদার বলেন, চারদিকে চোখ খাড়া রাখতে হয়। এতটুকু বেমানান কিছু চোখে পড়লে, সেই সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালাতে হয়। যখন তখন শরীর বিপদের সঙ্কেত দেয়। না শুনলে পস্তাতে হয়। ওদের প্রত্যেকটা লোমকূপে বিপদের সঙ্কেত।

গুপি বলল, 'তুমি কে?' লোকটা বলল, 'আমি নিকুঞ্জ।' এই বলে বালতি ভরে জল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রান্নাবাড়িটা একতলা; আসল বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। বড় সিঁড়ি দিয়ে নামলে একদিকে যেমন সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি পিছনের দরজা দিয়ে ঢাকা অন্দরের বারান্দাতেও চলে যাওয়া যায়। সেটা গেছে সোজা রান্না ঘরে।

ওরা দোতলায় গিয়ে শুকনো কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে সেইখানে গেল। দরজার কাছে থান-পরা চূড়ো করে খোঁপা-বাঁধা মোটা একজন মেয়েমানুষ ওদের দেখেই খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ আবার কাদের জুটিয়ে আনলিরে ট্যাপা? বলে এমনিতেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, আবার গোদের উপর বিষ-ফোঁড়। তবে না—' অঙ্ক-স্যার ছুটে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'স-স্-স চুপ, বড় পিসি, চুপ।' কিন্তু ল্যাকপ্যাকে অঙ্ক-স্যার ঐ জাঁদরেলের সঙ্গে পারবেন কেন? একবার গা ঝাড়া দিতেই ট্যাপা ছিটকে খাবার ঘরের ওপাশে গিয়ে পড়লেন। ওরাও গুটি গুটি সেদিকে এগুল।

বড় পিসিমার খোঁপা খুলে গেছিল, বাঁধতে বাঁধতে বললেন,

এ্যাই, খবরদার! আগে বল তোরা কে? খবরদার যদি ভাগ বসাবার চেষ্টা করেছিস! আমি আগেই বলেছি—' নিকুঞ্জ একটা শুকনো কাপড় গায়ে জড়িয়ে এসে উপস্থিত হতেই বড় পিসি থেমে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। নিকুঞ্জ গুপি পানুর দিকে ফিরে এদিকে সাদা সাদা মুক্তোর মতো সুন্দর দাঁত বের করে, ওদিকে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'চল, চল, অবিনাশের রান্না খেলে আর ভুলবে না। পিসিমা পরিবেষণ করবেন। বসে পড়ুন ব্যোমকেশবাবু, অত চিন্তার কি আছে?' অঙ্ক-স্যার ততক্ষণে উঠে পড়েছিলেন।

খাবার ঘরে সরু সরু টুল পাতা! যেন অনেক লোকের বসবার ব্যবস্থা। কিন্তু বসল শুধু অঙ্ক-স্যার আর ওরা দুজন। নিকুঞ্জ নাকি নিরামিষ ঘরে বড় পিসিমার হাতে খায়। তার কনুইয়ের উপরে এক গোছা মাদুলী বাঁধা। সে একটা টুলে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বসে রইল। খাবার পর ওরা যখন আঁচাতে গেল, অবিনাশ জল ঢেলে দিল। পানু জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ নিকুঞ্জও কি এখানে কাজ করে?' অবিনাশ ফিক করে হেসে বলল, 'তা করে। আবার করায়ও বলতে পার।' এই বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

অঙ্ক-স্যারকে কাছের গোড়ায় দেখতে না পেয়ে, ওরা দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। ঘুম পেয়েছিল বেজায়; একে ভোরে ওঠা, তায় এতদূর গাড়িতে এসে, ভরপেট খাওয়া। চোখ জড়িয়ে আসছিল। বাস্তবিক অবিনাশ বেজায় ভালো রাঁধে। টপাটপ শুয়ে পড়ল দুজনে! এর মধ্যে অঙ্ক-স্যার দরজা ঠেলে ঢুকে বললেন, 'দরজায় ভিতর থেকে খিল না দিয়ে কখনো শোবে না! এই রকম বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছ আর এত অসাবধান! আর দেখ, চাঁদুর নাম মুখে আনবে না। অঙ্কের খাতাটাতা এনেছ আশা করি?'

শুনে ওরা তো অবাক! অঙ্ক কষতে এসেছে আর খাতা আনবে না! অঙ্ক-স্যার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে, অত উত্তেজিত

হবার কি আছে? ও বেলায় বলা যাবে 'খণ'। ইয়ে-কি-বলে, ঐ নিকুঞ্জ, অবিনাশের সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। দরজায় খিল দাও।' এই বলে উনি চলে গেলেন। গুপি উঠে দরজায় খিল দিতে দিতে বলল, 'ট্যাপা বড় খ্যাপা! অমনি দুজনার ফিক-ফিক হাসি। হঠাৎ নিচে থেকে কর্কশ গলার আওয়াজ শোনা গেল। 'বড্ড বাড় বেড়েছে, না!! বের করে দেব এখান থেকে!! নিকুঞ্জর গলা মনে হল। হঠাৎ থেমেও গেল। মন্দ বলেনি ছোটমামা, দিনগুলো রহস্য রোমাঞ্চে ঠাসা। সেই কথা ভাবতে ভাবতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

ঘুম ভাঙল দরজায় গুম-গুম কীল আর প্রবল কড়া নাড়ার শব্দে। দরজা খুলতেই অঙ্কের বই হাতে অঙ্ক-স্যার আর খুঞ্চিপোষে, অর্থাৎ ছোট ছোট খুরো দেওয়া পুরনো এক বর্মী ট্রেতে তিন পেয়ালা চা আর ছোলার ছাতুর কচুরির সঙ্গে ঝাল ঝাল আলুর দম নিয়ে অবিনাশ ঢুকল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দোতলার ছোট চানের ঘরে হাত মুখ ধুয়ে ওরা এসে টুল টেনে সরু টেবিলে বসল। অঙ্ক-স্যার চেয়ারটাতে বসলেন। আগে খাওয়া দাওয়া হল। তারপর ঘরের দরজা খুলে রেখে, খুব জোরে জোরে ঘণ্টাখানেক অঙ্ক কষা। তার মধ্যে একবার বড় পিসিমা আর একবার নিকুঞ্জ বাজে অছিলায় ঘুরে গেল।

নিকুঞ্জের পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মিলিয়ে যেতেই, পানু লাফিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের উপর—উঃ', অঙ্ক-স্যার বেজায় জোরে ওর হাতে চিমটি কেটে, ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে চুপ করতে বললেন। তারপর দেয়ালের আঁকা সুন্দর ছবিগুলোর দিকে দেখিয়ে খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'আমার ঠাকুরদার একজন চীনে

বন্ধু এই ছবি এঁকেছিলেন। ছবির নাম রিভার অফ লাইফ। উপর দেখ বরফের পাহাড়ের বুকে নদীর উৎপত্তি। ছোট নদী, তার তীরে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা খেলা করছে দেখ। তারপর নদীতে কত উপনদী এসে মিলেছে, নদী বড় হয়েছে। নদীর তীরে যারা পুঁথি নিয়ে পড়তে বসেছে, তারা আরেকটু বড় ছেলে। তারপর নদী এঁকে-বেঁকে পাহার থেকে সমতল মাটিতে নেমেছে। যারা মাছ ধরছে তারা তীরের ধান-ক্ষেতে কাজ করছে, তারা আর ছোট ছেলে নয়, বয়সে যুবক হয়েছে। তারপর দেখ নদীর তীরে বড় বড় শহর গ্রাম; আধ বুড়োরা দোকানে বসে টাকা গুণছে। তারপর দেখ নদী প্রায় মোহনায় এসে গেছে, বুড়োরা তীরে বসে মালা জপছে। একেবারে শেষে দেখ নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। থুত্থুরে বুড়োরাও বালির উপর দেহ রেখেছে। এই হল রিভার অফ লাইফ, জীবন-নদের বিখ্যাত প্রাচীন চীনে চিত্র। পানু দেখতো দরজার বাইরে কেউ আছে কি না।' পানু গুপি অবাক হয়ে অঙ্ক-স্যারের কথা শুনছিল। বাস্তবিক ছবিটা বড় ভালো। স্যারের কথায় চমকে উঠে পানু দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে এল।

'না, স্যার, কেউ নেই! খালি ঐ নিকুঞ্জ পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দেখলাম।' অঙ্ক-স্যার কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম চল, এবার একটু বেড়িয়ে আসা যাক।' দরজা খোলাই রইল, যাতে যার খুশি এসে দেখে যেতে পারে। ওরা নিচে এসে, রান্নাবাড়িতে উঁকি মারল। মাংসে মশলা মাখা হচ্ছিল। অবিনাশ মাখছিল। নিকুঞ্জ টুলে বসে দেখছিল। বড়পিসিমা তোলা উনুনে পাটিসাপ্টা ভাজছিলেন। এক গাল হেসে নিকুঞ্জ বলল, 'বুঝতেই পারছ, খোকাবাবুরা, রাতের খাওয়াটি বেড়ে হবে। এসবের সঙ্গে লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন-ভাজা। বেরুচ্ছ নাকি?'

অঙ্ক-স্যার বললেন, হ্যাঁ, গাড়িটা নিয়ে ওদের একটু শহর দেখাই। শুধু পড়লে শরীর নষ্ট হবে। অবিনাশ, গোয়াল ঘরের

চাবি দাও, গাড়ি বের করি।' নিকুঞ্জ টপ করে টুল থেকে নেমে পড়ল। 'চলুন, আমি খুলে দিচ্ছি। চাবি তারি কাছে ছিল। রান্না বাড়ির ওপাশে কলা-বাগান, তার আড়ালে গোয়াল-ঘর। একটাতে ছুটো গরু দেখা গেল। একটায় তালা দেওয়া। নিকুঞ্জ খুলে দিল, অঙ্ক-স্যার গাড়ি বের করলেন।

সামনের ফটকও নিকুঞ্জ খুলল, আবার বন্ধও করল। আমরা শহরের দিকে চললাম। কিন্তু ছোটমামার আপিসের সামনে থামলাম না। গাড়ি আস্তে করে তিনবার পঁক পঁক করতেই দোতলার একটা জানলা দিয়ে একটা হাত একটা সাদা রুমাল নেড়ে দিল। অঙ্ক-স্যার আবার স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঘুরেই, একটা বাঁশ বাগানের পাশে চায়ের দোকানের পিছনে থামলেন। বললেন, 'কোনো ভয় নেই, এটা আমার এক আত্মীয়ের দোকান। চাঁছুর রাঁদেভু, অর্থাৎ একসঙ্গে মিলবার স্থান।'

ততক্ষণে আলো কমে আসছিল। ব্যস্ত হয়ে ওরা বারবার পথের দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় উল্টো দিক দিয়ে সাইকেলে চেপে ছোটমামা এসে উপস্থিত। অঙ্ক-স্যারের কানের কাছে আচমকা ক্রিং করতে তিনি তো হাত-পা ছুঁড়ে তিনি যান আর কি? ছোটমামা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'এই সাহস নিয়ে কাজে নামলে তোমার পৈত্রিক ধন উদ্ধার হল আর কি!' অঙ্ক-স্যার বললেন, 'আঃ চুপ। তোদের সঙ্গে আমাকে দেখা গেলে চলবে না। ওরা চিনে ফেলবে।'

এই বলে অঙ্ক-স্যার অন্ধকারে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। ছোট মামা আমাদের নিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকল। 'চাটা সত্যিকার খাওয়া নয়, শুধু এখানে বসে থাকার অজুহাত, বুঝলি গুপি পানু। এর জন্য আপিস থেকে পঁয়তাল্লিশ পয়সার বেশি খরচ দেবে না। সামনের রাস্তার দিকে চোখ রাখ।' একটু পরেই বলল, 'ঐ যে নজর করে ত্থাখ্।' ওরা দেখল ছু'জন মহিলা, মাথায়

কাপড়, পায়ে চটি একজন আগে, একজন পেছনে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে। 'নজর করে ত্যাখ। একজন বাঘ, একজন হরিণ। হরিণ যেমন বাঘের শিকার, তেমনি বাঘ হল আমাদের শিকার। চেহারা মুখস্থ করে নে, যাতে যে কোন সাজে চিনতে পারিস। তোদেরই পাছু নিতে হবে, কারণ আমাকে এদিককার অনেকেই চেনে। যা, ওঠ! আবার দেখছিস কি? শেষটা শিকার হবে পগার পার। আজ শুধু দেখে আয় কোথায় যায় পরে সব খুলে বলব। লোমহর্ষক ব্যাপার।'

উঠে পড়ল দুজনে। যদিও মহিলার পিছনে গুপ্তচর লাগাটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। তবে টিকটিকিদের অত ভাবলে চলে না। অন্যায়কারী ধরা নিয়ে কথা। কে যে বাঘ, কে যে হরিণ আর বলে দিতে হল না। একজনের জোরালো শরীর, বড় বড় পা ফেলে হাঁটে, মুখটা কালো তোলো হাঁড়ি। অন্যজনের পিক-পিকে হাত-পা, খুর-খুর করে অর্ধেক হাঁটে, অর্ধেক দৌড়ে চলে। খানিকটা পেছিয়ে পড়ে আবার দৌড়ে সঙ্গিনীকে ধরে ফেলে। বাঘ যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এমনি ভাবে যাচ্ছে। খালি আলো পড়লেই মনে হতে লাগল, চোখ দুটো জ্বলছে। একটু অন্ধকার পেলেই লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়তে কতক্ষণ।

পানু গুপি পথের অন্য ধার দিয়ে, যেন নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল। বাঘ গিয়ে অন্য একটা পোদ্দারের দোকানে গিয়ে ঢুকল: হরিণও খুর-খুর করে ছুটে এসে, তার পিছন পিছন ঢুকল। ভিতরে লোকজন, আলো। গুপি পানু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পানু বলল, 'কোথায় গেল দেখা হল। চল, ফিরি। মাথা ধরে গেছে।'

খানিকটা যেতেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে ছোট মামা ওদের সঙ্গ নিল। 'কোথায় গেল?' পোদ্দারের দোকানে।' এই খেয়েছে!' বাঁশবনের ধার থেকে সরু গলায় গান শোনা যাচ্ছিল। ছোটমামা ছুটে গেল। 'ক্ষেপেছিস্, ট্যাপা?

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাস নাকি?' অঙ্ক-স্যার আমতা-আমতা করে বললেন, 'সূর্য নেবার পর বাঁশ-বাগান খুব ভালো জায়গা নয়, বোধহয় শুনে খুসি হবি যে ওরা পোদ্দারের দোকানে ঢুকেছে।' অঙ্ক-স্যার আঁৎকে উঠলেন। পোদ্দারের দোকানে? সে কি? ওরা সব পেয়ে নাকি? নইলে যাদের পোড়ো বাড়ির ছাদ দিয়ে চাঁদের আলো ঢোকে, তারা গেছে পোদ্দারের দোকানে? কেন? পানু গুপি, তোমাদের কাছ থেকে এর উত্তর আশা করি।' ছোট মামা বলল, 'রাখ্ আর তেজ দেখাতে হবে না। ছেলেমানুষের উপর যত হামলা! তোমার আত্মীয় স্বজনদের জন্য ওরা দায়ী নয়।' জোঁকের গায়ে নুন দিলে যেমন কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে যায়, অঙ্ক-স্যারের তেমনি হল। মুখে কোন কথা নেই। সেই সুযোগে ছোটমামা তাপ্পি পরে ড্রাইভারের জায়গা দখল করল। স্টার্ট দিতে গিয়েই রেগে উঠল, 'ইসটাঁপা, তিন দিনেই দেখছি গাড়িটার দফা রফা করেছিস! গাড়ি চালানো ছেলে ঠ্যাঙানোর মত অত সহজ নয়। না খেয়ে না ঘুমিয়ে অত খাটলাম এটার পিছনে, হ্যাঁরে তোর কি একটু দয়া-মায়াও নেই?'

বোধ হয় অঙ্ক-স্যারের একটু রাগ হল। বলে বসলেন, 'গাড়িটাত আমার। আমি তো সেই কুড়ি টাকা দিয়েছিলাম, নইলে আর তোর কিনতে হত না। তখন তো তুই বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বেকার যুবক। ট্যাঁক তোর গড়ের মাঠ। এখনি না হয় কানু সামন্তের সুপারিশে টিকটিকি হয়েছিস। মাইনে পাচ্ছিস, কোয়ার্টার পাচ্ছিস আমাদের মতো—যাক্ গে সে সব তুই বুঝবি না।' ছোট মামা বলল, 'আরে তুই কি ঠাট্টাও বুঝিস না নাকি? এই কি আমাদের নিজেদের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচি করার সময় নাকি? ওরা পোদ্দারের দোকানে গেছে, তার মানে তো বুঝেছিস নিশ্চয় কিছু পেয়েছে।' উত্তেজনার চোটে অঙ্ক-স্যার চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে যায় আর কি! ছোটমামা তাকে ভাগ্যিস চেপে ধরল।

'কি—কি পেয়েছে ?' 'হতে পারে উইল, নয়তো ধন-রত্ন।' অঙ্ক-স্যার সীটের উপর এলিয়ে পড়লেন। ছোটমামা বেজায় বিরক্ত। 'এতো মহা গেরো ! নে ওঠ কোমর বাঁধ, ঝাঁপিয়ে পড়।'

ক্ষীণস্বরে অঙ্ক-স্যার বললেন, 'আমাকে কেন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ? তোদের আপিসে টাকা দিই নি ?' ছোটমামা ফ্যাক করে হেসে বলল, 'ওরাও দিয়েছে। কিছু বেশিই দিয়েছে। এ্যঁ, কারা ? কারা ! কারা বেশি টাকা দিয়েছে ?' 'দুজনরাই।' 'দুজনরাই মানে ?' মানে এরাও, আবার ওরাও।' অঙ্ক-স্যার বললেন। 'সাব্বনাশ হয়েছে।' 'কিসের সব্বনাশ ? তোদের বড় সাহেবের মতো দুঁদে ডিটেকটিভ এ অঞ্চলে আর নেই। শুনেছি ওর কচ্ছপের কামড়। একবার ধরলে আর ছাড়ে না।' 'তাহলে ওদেরই জয় হোক ?' কাদের হবে ? খুড়োর না পিসের ? তারাও তো পরস্পরের শত্তুর। তুমি বাদ যাবে কেন ভুলে যেও না, তোমার গুরুতর তদন্তের ভার, আমার হাতে। আমি কি বসে আছি ? দুজন দক্ষ চর লাগিয়েছি, তাই বল।' অঙ্ক-স্যার আমতা আমতা করে বললেন, 'তিনপক্ষের হয়েই তোমরা তদন্ত করছ, এ কি খুব সৎ-কাজ হল ?'

ছোটমামা তো অবাক ! ঘ্যাঁচ করে পথের ধারে অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'কিসের অসৎ ? দুঃস্থ ওয়ারিশদের জন্য উইল আর সম্পত্তি খুঁজে দেওয়া কি খারাপ কাজ ?' 'তা নয়। কিন্তু তিনজন বিপক্ষ-দলীয় ওয়ারিশের হয়ে একজন'—'একজন আবার কোথায় পেলে ? বড় সায়েব তার তিনজন সবচেয়ে দক্ষ ডিটেকটিভ লাগায় নি-বলতে চাস ? ও উইল আর ধনরত্ন না বেরিয়ে যায় না। চল্, চল্, এখন আর রাত করলে হুঁকোমুখোর আবার সন্দেহ হল। আর দ্যাখ্, বিপদগ্রস্থ না হলে কেউ ডিটেকটিভ লাগায় না। আমাদের বড়সায়েব কখনো বিপদ গ্রস্থকে ফিরিয়ে দেন না।'

ছোটমামা আপিসের পাশের গলিতে নেমে পড়ল। এতক্ষণে

বোধহয় খেয়াল হল যে গাড়িতে আরো দুজন আরোহী ছিল। বলল, 'ভালো কথা' ব্যাপারটি বোধ করি এতক্ষণে তোদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। পানু পিসির পিছনে আর গুপি খুড়োর পিছনে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরবি। কিন্তু খবরদার যেন ওরা টের না পায়। আমি কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করার আগেই যদি (এক) সেনগুপ্ত কিম্বা (দুই) সমাজপতি কৃতকার্য হয়, তাহলে আর আপিসে আমাকে মুখ দেখাতে হবে না। কে জানে ওরাও হয়তো অলক্ষ্য চর লাগিয়েছে। যাক, ভেবে কাজ নেই। ট্যাপা বাড়িতে এ বিষয়ে ঠোঁট ফাঁক করবি না। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবি। কাল সকালে দশটার সময় ঠিক এই জায়গায় পানু অপেক্ষা করবি। হরিণ, বাঘ বাজার করে যখন ফিরবে, পিছন পিছন গিয়ে গতিবিধি লক্ষ্য করবি। গুপিকে খুড়োর বাড়ি দেখিয়ে নিস্ ট্যাপা। সে বেরুলেই ফলো করতে হবে।'

গুপি বলল, 'কিন্তু ছোটমামা, খুড়ো যে আমাকে দেখেছে?' 'ভালোই তো, ভাববে যারা অঙ্কে এত কাঁচা, তারা আবার কি জানে!' ছোটমামা চলে গেলে ওরা দুজন অঙ্ক-স্যারকে চেপে ধরল, 'স্যার, সব ধাঁধা লাগছে। যেতে যেতে একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দিলে, তদন্ত করা ভারি শক্ত।'

অঙ্ক-স্যার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা বলছি। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা এমনি ঘোরেল হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে হতাশ হয়ে পড়ছি। শোন তাহলে আমার ঠাকুরদা যেমনি চালাক তেমনি খেয়ালী ছিলেন। বেচা কেনার ব্যবসা করে মেলা টাকা আর এই বর্ধমান শহরে দুটো বাড়ি করেছিলেন। মারা যাবার সময় ছোটবাড়িটা তাঁর মেয়েকে আর বড় বাড়িটা ভাগাভাগি করে আমার বাবাকে আর খুড়োকে লেখাপড়া করে দিয়ে যান। তা ছাড়া রাশি রাশি ধনসম্পত্তি থাকার কথা ছিল, কিন্তু তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। শুধু তাঁর উকিল শশধর মল্লিকের কাছে একটা সীল করা চিঠি

রেখে গেছিলেন। খামের উপরে লেখা ছিল, 'আমার মৃত্যুর পনেরো বছর পর খোলা হবে।' সেই চিঠি নিয়েই যত গোলযোগের শুরু।

সামনে তিনটে সাইক্‌ল্ রিকশ, একটা বাস, একটা গরুর গাড়ি তিনটে সাইকল আর গোটা দশেক প্রাইভেট মোটর, দুটো ট্রাক আর পঁচিশটা পথযাত্রী এসে পড়াতে, অঙ্ক-স্যারকে মিনিট পাঁচেক চুপ করতে হল তারপর আবার বলতে লাগলেন।

'এই আষাঢ় মাসে ঐ পনেরো বছর শেষ হল। শশধর মল্লিক আমাদের সামনে সীল ভেঙে চিঠি পড়লেন। ঠাকুরদা এমনি বদ-রসিক যে উইল লুকিয়ে রেখেছে। তিনজন ওয়ারিশের নাম দিয়েছে, এক, খুড়ো; দুই, পিসির মেয়ে টেঁপি; তিন, আমি। আমাদের মধ্যে যে উইল খুঁজে বের করতে পারবে, সে-ব্যক্তি সম্পত্তির হদিস পেয়ে যাবে। কারণ সেটা উইলেই লেখা আছে। সম্পত্তির অর্ধেক তার, আর বাকিটা অন্য দু'জনের। এবার বুঝলে সমস্যাটা? উইল আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কারণ অন্যরা কেউ পেলে, যদি আমাদের ন্যায্য ভাগ না দিয়ে, বেমালুম চেপে গিয়ে নিজেই সব গাপ্ করে দেয়, ভাই বা ঠেকাচ্ছে কে? বাড়ি-ঘর তো নয় যে দলিল থাকবে। স্রেফ টাকা, মোহর, সোনা, হীরে মণি-মুক্তো নিশ্চয়।

তারপর সে আর কি বলব, ঝগড়া ঝাঁটি রাগারাগি, পরস্পরকে সন্দেহ করা। পিসির বাত; বাড়ি থেকে বেরোয় না। পিসে জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে স্বর্গে গেছে। পিসির মেয়ে টেঁপিকে পিসি কখনও শ্বশুর বাড়ি পাঠায় নি। তারা নাকি গরীব। বেজায় চালাক পিসি। শুয়ে পরামর্শ দেয়, টেঁপি সে সব কাজে লাগায়। এদিকে ভয়ও আছে যথেষ্ট। এক ঝি রেখেছে সর্বদা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, কখনো একলা বেরোয় না। কাল তো তোমরা তাদের দেখেইছ। নিজেদেরই চলে না, ওরা মাইনে দেয় কোত্থেকে কে জানে, এদিকে বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে। একতলা ভাড়া দিয়েছে

ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। এখন আবার পোদ্দারের দোকানে যাওয়া আসা কেন ভেবে পাচ্ছি না। নানা রকম সন্দেহ হচ্ছে।

আর খুড়োর কথা আর কি বলব। ঐ হিমঘরের সিকিউরিটি অফিসার হয়েছে। কি করে কে জানে। ঐখানেই থাকতে হয়, খাসা একখানা গাড়ি চড়তে পায়, অথচ এ বাড়িটাও দখলে রাখতে চায়।'

গুপি বলল, 'তা চাইবে না কেন, স্যার? আপনিও তো কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে থেকে কাজকর্ম করেন, তাই বলে কি এ বাড়িটার অর্ধেক ছেড়ে দেবেন?'

চমকে উঠে অঙ্ক-স্যার প্রায় ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগান আর কি? 'তুমিও তো কম যাও না, ছোকরা। সত্যি কথা বল, ওদের কারও চর নও তো?' শুনে গুপিও বেজায় রেগে গেল, 'কি বলছেন, স্যার? আপনাকে সাহায্য করবার জন্যেই ছোটমামা আমাদের এনেছে, যাতে কারো না সন্দেহ হয়। আর আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন স্যার?' অঙ্ক-স্যার অপ্রস্তুতের একশেষ। গুপির পিঠ চাপড়িয়ে দিতে গিয়ে গাড়িটা খানায় ফেলেন আর কি! 'না না কিছু মনে কর না, ভাবনা চিন্তায় আমার মাথার কি আর ঠিক আছে! তোমরাও ক্লান্ত। লুচি-মাংস খেলে সব অন্য রকম মনে হবে, দেখো।'

বাস্তবিকই তাই। খাবার-দাবার তৈরিই ছিল, এদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। হাত ধুয়ে বসে পড়ল সবাই। তারপরে পিছনের বারান্দায় অবিনাশ হাত ধোবার জন্য গরম জল দিল। ওপরে উঠবার সময় পানুর মুখে হাসি ধরে না। দুটো দুটো ধাপ এক সঙ্গে পার হতে লাগল। অঙ্ক-স্যার পশ্চিমের ঘরটাতে ঢুকে পড়লেন। একবার শুধু ডেকে বললেন, 'মনে থাকে যেন দরজায় খিল দিয়ে শোবে।'

ঘরে ঢুকেই দেখা গেল দেওয়ালে ঝোলানো সবুজ ডোম দেওয়া

ছোট একটা ল্যাম্প জ্বলছে। তক্তোপোষে দুটি মশারি। পায়ের কাছে সুজনি। খোলা জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। সত্যি মনটা ভালো হয়ে গেল। গুপি জানলার কাছে গিয়েই শিউরে উঠল। পানু, শিগগির আয়। ঐ দ্যাখ, খিড়কি দিয়ে বড় পিসি বেরিয়ে যাচ্ছে না? এত রাতে বেরুনো তো ভালো বুঝছি না।'

পানু বলল, 'তা বেরুবে না কেন? সবে তো ন'টা বেজেছে। সারাদিন বেচারি হয়তো সময় পায় না। ওই নাকি রাঁধুনী বামনী। ওরই রাঁধার কথা, অবিনাশের অন্য কাজ আর নিকুঞ্জ নাকি খড়োর ক্ষেত খামার দেখে। ওভারশিয়র। অঙ্ক-স্যার তো তাই বললেন।'

কাল বেলা দশটার মধ্যে কাজে লাগতে হবে, আর কথা নয়। দুজনে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল। একবার মনে হল কে দরজা ঠেলে দেখল, হয়ত অঙ্ক-স্যারই হবেন। ঘর তো সারা বিকেল খোলাই ছিল! কারো সার্চ করার ইচ্ছে থাকলে করে গেছে নিশ্চয়। তারপর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওরা দুজনেও ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে অবিনাশ দোতলায় ওদের ঘরেই চা টোস্ট, ডিমপোচ এনে দিয়ে বলল, 'কাকা বোধহয় দুগ্‌গো পূজো করবেন এখানে। খালি গোয়ালঘর থেকে গাড়িটা সরাতে বলেছেন।' অঙ্ক-স্যারও ওদের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন, তিনি গেলেন চটে। 'গাড়ি সারাতে হবে আবার কি? ঐ গোয়ালটা তো আমার। আমার অনুমতি না নিয়ে ওখানে কিছু হতে পারে না। খবরদার গাড়িতে হাত দেবে না!'

অবিনাশ হাসল। 'হাত দেবে না আবার কি? দেখেন গিয়ে গাড়ি বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে, দেয়ালে ঠুক ঠুক করা হচ্ছে। নাকি লাল সালুর উপর চাঁদ মালা বসবে!'

অঙ্ক-স্যার তো অবাক! বলে—গাড়ি তো লক্ করা, চাবি ওঁর কাছে, ঐ পুরনো ডজ গাড়ি পাঁজা-কোলা করে তুলে বাইরে আনা কি চাট্টিখানি কথা 'গাড়ি টেনে ফেললি কি করে, শুনি?' 'কেন আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে ব্রেক ছাড়ালাম, তারপর তার দিয়ে ইয়ে—' এই বলে অবিনাশ খাঁ করে খালি ট্রে তুলে নিয়ে দে পিট্টান।

অঙ্ক-স্যার মাথা নেড়ে বললেন, 'আশ্চর্য!' তারপর অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ডিম-পোচ দুটো খেয়ে ফেলে, পানুর একটাও তুলতে যাচ্ছিলেন, তা পানু দেবে কেন?

খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অঙ্ক স্যার বললেন, আর দেরি কেন? চটপট তৈরি হও, চাঁদুর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু

যাওয়া দরকার বললেই তো আর যাওয়া হয় না। সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখা গেল, সিঁড়ির মাথায় মজবুত টানা-গ্রীলের দরজাটা কেউ টেনে বন্ধ করে ওদিক থেকে এই বড় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। অঙ্ক-স্যার বসে পড়লেন। এই গ্রিল তিনিই করিয়েছিলেন তালা তাঁরি কেনা। যাতে খুড়োর দল যখন তখন উপরে উঠতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা। 'এখন নাও ঠ্যালা।' অঙ্ক-স্যার মাথায় হাত দিলেন।

গুপি বলল, 'আমাদের আবার ডিউটি আছে দশটায়। তার যে খুব বেশি দেরি আছে তাও নয়। ওঠ, পানু।' অঙ্ক-স্যার হাঁ। 'ওঠ পানু আবার কি? পাখি তো খাঁচায় বন্ধ।' পানু হাসল। 'বিনু তালুকদার বলেন সবার আগে পালাবার পথটি ঠিক করে রাখতে হয়। ছুঁচোরা তাই মাটির নিচের বাসার দুটি মুখ রাখে।' 'বিনু তালুকদার আবার কে?' পানু হঠাৎ গম্ভীর মুখ করে বলল,

'একজন লোক।' গুপি বলল, 'তা হলে আমরা যাই, স্যার? গাড়ি তো ওরা ঘেরাও করে রেখেছে। হেঁটে যেতে হবে বুঝতে পারছি। কাল স্যার কাকার বাড়িটা তো দেখিয়ে দেননি? অবিশ্যি তার দরকার হবে না, কারণ কাকা অপারেশন-গোয়ালঘর চালাচ্ছেন। চলি।'

অঙ্ক-স্যার মুখ তুলে বললেন, 'রোসো, বেরুবে কি করে? বিনু তালুকদারের পালাবার পথ ঠিক করেছে?' পানু বলল, 'হ্যাঁ স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ! আবার কোথায়?' ঐ পায়খা—মানে বাথরুম দিয়ে, স্যার। ওর জানলার শিকে ঝাকি দিতেই দুটো খুলে এলো। আপনার ঠাকুরদাকে স্যার, কনট্রাক্টর বেজায় ঠকিয়েছিল।' অঙ্ক-স্যার এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তারপর কি করবে? ওখানে তো আর বাদুড়ঝোলা হয়ে থাকা যায় না।' 'না, স্যার। নিচে থেকে ঐ দিকটা দেখা যায় না। কার্ণিশ ধরে একটু গেলেই ঐ বড় আমগাছটা পেয়ে যাবো। ওটা কি আপনার?' 'না, না, কাকার। তারপর বল।' 'তারপর আর কি! আমগাছের ডাল বেয়ে মাটিতে নেমে পড়ব। ওরা গোয়ালঘরে ব্যস্ত থাকুক। আমরা গেট টপকে সটকান দিই!' গুপি একটু বোকার মতো হাসতে লাগল।

অঙ্ক-স্যার লাফিয়ে উঠলেন, 'রাইট! তবে তুমি যাবে না। তোমার শিকার তো এই বাড়িতেই রয়েছে। তুমি তার উপর শ্যেন দৃষ্টি রাখবে। ঈগল পাখি যেমন ইয়ে—

পানু বলল, 'ভেড়ার ছানার উপর—'গুপির রাগ দেখে কে! 'কেন স্যার, আমি সব ভালো জিনিস থেকে বাদ যাব কেন স্যার? তাছাড়া—'গুপির মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল! স্যার বললেন, 'তা ছাড়া কি?' পানু বলল, 'ও বলতে চায় স্যার আপনার তো বয়স হয়েছে, আপনি কি আর জানলা বেয়ে, কার্ণিশ পেরিয়ে, আমগাছের ডাল ধরে নামতে পারবেন? তারপর গেট টপকাতে হবে।'

অঙ্ক-স্যার উঠে দাঁড়ালেন! 'কি, এত বড় কথা! তোমরা জান যে আমি যখন স্কুলে পড়তাম পরপর পাঁচ বছর আমি স্পোর্টসে অবসটেকল-রেসে থার্ড প্রাইজ পেয়েছিলাম। এই সামান্য কাজটুকু আমার কাছে কিছু নয়। তাছাড়া, আমার বয়স হয়েছে মানে কি? তেইশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। বুড়ো হতে অন্ততঃ তেত্রিশ হওয়া চাই।'

গুপি হাঁড়িমুখ করে বলল, 'এখান থেকে গোয়াল ঘর দেখা যায় না। চোখ রাখব কি করে? তার চেয়ে তিনজনেই যাই।' স্যার চটে গেলেন, 'এ কি রকম ডিসিপ্লিন তোমাদের দলের? একজনকে ঘাঁটি আগলাতে হবে না? কেউ হাঁক দিলে তাকে ভাঁওতা দিতে হবে না?' 'আমাকে—আমাকে ছেলেমানুষ একা পেয়ে ওরা যদি সবাই মিলে—'স্যার হাসলেন। 'তোমাকে পেলে তবে তো! গ্রিল যেমন বাইরে থেকে তেমনি ভেতর থেকেও বন্ধ করা যায়। ওরাও ঢুকতে পারবে না। কিন্তু খবরদার, আমরা না ফেরা অবধি তালা খুলে দেবে না। এক যদি চাঁদু আসে। তবে তার বেশি সম্ভাবনা নেই, তার অনেক আগেই ওরা তাকে কচুকাটা করে দেবে।' গুপি না হেসে পারল না। 'কাকে কচুকাটা করবে, স্যার? ছোট-মামাকে? যে গোরিলা ঘোষালের সামনে থেকে জ্যান্ত ফিরে এসেছিল?' পানু বলল, 'হ্যাঁ স্যার অতি সহজে। স্রেফ দৌড়ে।'

অঙ্ক-স্যার বললেন, 'তবে আর কোনো ভাবনা নেই। তালা দিয়ে আমরা দুজন বেরিয়ে যাই। গুপি, তুমি থাক। সমস্ত দোতলাটা তোমার রাজ্য। কারো কিছু বলার অধিকার নেই। এ ঘর ও ঘর করবে। নিজে আড়ালে থেকে, আমার ঘরের জানলায় গিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে লক্ষ্য করবে। আর ইয়ে—কি বলে কাল যে-সব আঁক করলাম, তারপর থেকে কষে যাবে।' শুনে গুপি অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি?

ভাগ্যিস বাথরুমটা যে-দিকে, সেদিকের নিচেই ছোট আম-

বাগানটা। কাজেই ওদের প্রস্থান পর্বটি কারো চোখে পড়ল না। অঙ্ক-স্যার একটু হুঁপ-হাঁপ করলেন বটে, কিন্তু নিচে নেমে, দৌড়ে গিয়ে গেট টপকে, গুপিকে অবাক করে দিলেন। তবে হাঁটতে রাজি হলেন না। মোড় ঘুরেই একটা সাইকল্-রিক্সা পেয়ে যাওয়াতে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বড়-রাস্তায় পৌঁছেই স্যার রিক্সাটাকে ছেড়ে ছিলেন। 'না হে, বড়ই রিস্কি। তুমি টেঁপির দলের পাছু নাও, তোমাকে কেউ চিনবে না। আমি ওর নিজের মামাতো ভাই, আমাকে চিনতে ওর বাকি নেই। তা ছাড়া ওর ঐ ফেউটিকে বড় ভয় পাই। আমি একটু চাঁছুর আপিসে গিয়ে পরামর্শ এবং গা-ঢাকা দিই। গ্রিলে তালা দেওয়া মানেই কাকা আমাদের নজর বন্দী করে রাখতে চান। চাঁছুর সাহায্যে তাকে কেমন কলা খাওয়াই দেখো। আচ্ছা এবার পথ দেখ।'

অঙ্ক-স্যার চলে গেলে পানু ছোটমামার দেখানো জায়গাটাতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বিনু তালুকদার তাই-ই বলেন। 'খবরদার এক জায়গায় টার্গেটের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াবে, তাহলে কারো তীর গায়ে লাগবে না।' পানু হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। ভেবে আশ্চর্য হল যে দেড় বছর আগেও যে এক-পাও হাঁটতে পারত না, আজ সে স্বচ্ছন্দে তুর্ওদের পিছনে লেগেছে।

ঠিক এই সময় তারা দুজন টুপ করে একটা সরু গলি থেকে বেরুল। বাঘ আর হরিণ। পাশাপাশি চলতে লাগল তারা খ্যাচা-খেঁচি করতে করতে। পানু লক্ষ্য করল আস্কারা পেয়ে পেয়ে হরিণের বেজায় বাড় বেড়ে গিয়েছে। বাঘকে সে যা মুখে আসছে সে তাই বলছে। বাঘ মাঝে মাঝে তার দিকে আড়-চোখে চাইছে। মুনিবকে হরিণ এ রকম তাচ্ছিল্য করতে সাহস পাচ্ছে দেখে গুপি আশ্চর্য হয়ে গেল।

চট্ করে আবার বিনু তালুকদারের সেই কথা মনে পড়ে গেল—

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই, সেই দিকে নজর রাখবে। কেউ দেখছে বলে যখন অন্যায়কারীরা সন্দেহ করে না তখন তারা স্বাভাবিক ব্যবহারই করে। এটা মনে রেখ।' এরা তাহলে অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে কেন ? এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। মেয়েদের উপর চোখ রাখতে হবে শুনে কাল ছোট মামার উপর একটু রাগ হয়েছিল। আজ পানু বুঝল ছোটমামার কি ভয়ঙ্কর বুদ্ধি।

হঠাৎ চোখে পড়ল বাঘের হাতের বাজারের থলিটার তলাটা কি রকম অস্বাভাবিক ভাবে ঝুলে পড়েছে। পানুর গায়ের রক্তগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। কালকের মতো রাস্তার অন্য ধার দিয়ে, ওদের চেয়ে হাত দুই পিছনে থেকে পানু এগুতে লাগল। মেয়েমানুষ হলে কি হবে, বেশ পা চালিয়ে চলল ওরা। পানুরই বরং হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে আর বলে দিতে হল না এদিক-ওদিক এক নজর দেখে নিয়ে টুপ করে দুজনে আবার সেই পোদ্দারের দোকানেই ঢুকল। আজও দোকানে অনেক লোক। বাজারের থলে এতদূর বয়ে এনে ওদের বোধহয় হাত ব্যথা হয়ে গেছিল। তাই থালি দুটোকে কাউণ্টারের এক পাশে আড়াল করে রেখে, ওরা তর্ক করতে করতে ভিড় ঠেলে পোদ্দারের কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বিনু তালুকদার বলেন, 'সুযোগ কখনো ছাড়তে হয় না। আগে কাজ, তারপর বিচার। নইলে ব্রাহ্মমুহূর্ত কারো জন্য বসে থাকে না।' কাজেই পানু আর অপেক্ষা করল না, স্যাঁত করে বাঘের লাল কালো ডোরা-কাটা থলি তুলে নিয়ে দে দৌড় !

আর যাবে কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে ধর-ধর পালাল-পালাল 'চোর চোর ! পানু বেজায় অবাক হয়ে গেল। ওদের কি পিছনেও চোখ আছে নাকি ! অবাক হলেও পায়ের বেগ কমল না। বাতাসের আগায় খড় কুটোর মতো ছুটল। এ গলির ভিতর দিয়ে, ও গলির

পাশ কাটিয়ে, বাঁশ বন, আম বন, পানা পুকুর কোথায় পিছনে পড়ে রইল। বুক হাপরের মত উঠছে পড়ছে, কান বোঁ-বোঁ করছে, চোখে অন্ধকার দেখছে। এমনি হয়। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে। বিনু তালুকদারকে নাকি দু-একবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। একবার হেরে বেঁচে ফিরে এলে, আরেকবার চেষ্টা করে জয়লাভ হতে কোন বাধা নেই।

একটা নির্জন পুকুর পাড়ে পানু বসে পড়ল। বসে পড়েই অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কোথাও কেউ নেই। কখন তারা পেছনে দৌড়ান ছেড়ে দিয়েছে কে জানে! পানু রেহাই পেয়েছে। কিন্তু বিনু তালুকদারই বলেন, 'ভাগ্যকে বেশি পরীক্ষা করতে হয় না। ভালোয় ভালোয় প্রাণ নিয়ে পালান অনেক সময় দরকার হয়।' পানু বুঝল এই হল সেই রকম একটা সময়। গায়ের সার্ট খুলে তাই জড়িয়ে বাজারের থলিটাকে একটা পুঁটলি বানিয়ে বগল দাবাই করে. ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলল। যেন কিছুই ছিল না।

এবার কে সার্ট-পরা লাল-কাল থলি-হাতে ছেলে বলে চিনবে! সবাই দেখবে গেঞ্জি গায়ে পুঁটলি বগলে একটা ছেলে যাচ্ছে। বুকে সাহস ফিরে এল। কিন্তু বড় বেশি দূরে চলে এসেছে, বড় অচেনা জায়গায়। এখান থেকে পথ চিনে অঙ্ক-স্যারের পৈতৃক বাড়িতে

ফেরাই এক ব্যাপার। না জানে রাস্তার নাম, না জানে বাড়ির নম্বর। এখানে বাড়ির নাম্বার থাকে কিনা, তাই পানু জানে না।

তার চেয়ে বরং ছোটমামার আপিসে গিয়ে দেখলে ভালো হয়। সেটা অবিশ্যি ছোটমামার পছন্দ নয়। কারণ সেনগুপ্ত আর সমাজপতি, এরা, কিছু কাঁচা ছেলে নয়। কাজেই ছোটমামার আপিসে গুপি পানুকে না দেখা গেলেই ভালো। আর ছোটমামাও ওদের সঙ্গে থাকলেই দাড়ি তাপ্পি পরে থাকবে, ঠিক হয়েছিল। তবু নিরুপায় হয়ে সেই যেতে হল। বিনু তালুকদার বলেন, 'যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, সে কোন নিয়ম মানে না।'

উনি অবিশ্যি আইনভঙ্গকারীদের কথা মনে করেই বলেছিলেন। পানু এখন আবিষ্কার করল কথাটা আইনভঙ্গকারীদের শত্রুদের বেলাও খাটে।

ন্যাশনাল হাই-ওয়ে ট্রাম মোড়টা খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট করতে হল না। মাত্র সাতবার জিজ্ঞাসা করতে হল। তারপর সামনেই দেখে ছোট্ট দরজাটা। তার পাশেই আরেকটা দরজা। তার পাশে ছোট্ট একটা নেম-প্লেট, তাতে লেখা শশধর মল্লিক এম-এ, বি-এল। এই নিশ্চয় সেই শশধর। স্যারের ঠাকুরদার উকীল। এই সব নস্টের গোড়া, স্যার বলেছেন। বুড়োকে যত কু-পরামর্শ নাকি ইনিই দিতেন। ছোটমামাদের দরজাটা খোলাই ছিল। সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে পানুর কানে এল। একটা শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার। 'কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও!'

ঐ তো ছোটমামার গলা না? স্যারও হয়তো আছেন। গুপি তো বলে ছোটমামার এত সাহস, কিন্তু বিপদে পড়লেই গলা থেকে চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরোয়। ছোটমামা নিজেই জানেন না, কেন! শরীরে ভিটামিন ডি'র অভাবেই হবে না। সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো একরকম উড়ে পার হয়ে, পানু দরজার উপরকার ছিটকিনি নামিয়ে

দল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা আর অঙ্ক-স্যার হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন।

'চল, চল, এক মুহূর্ত সময় নেই। কাকা সর্বনাশ ঘটাবেন।' পানু পুঁটলি বগলেই তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ছুটল। দেখল ওঁদের দুজনেরই উস্কো খুস্কো চুল, উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

॥ চার ॥

নিচে নামতেই শশধরের দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে এল সে নিকুঞ্জ ছাড়া আর কেউ নয়। আর যাবে কোথায়, ছোটমামা আর অঙ্ক-স্যার দুজনে বাঘের মতো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কীল চড়ে লাথি ঘুঁষি চালিয়ে একাকার করে দিলো। বোঝা গেল ও-ই নিশ্চয় ওঁদের ঘরে বন্ধ করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ওই তাগড়া চেহারা, অথচ নিকুঞ্জ প্রথমটা আরে—আরে—আঁ-আঁকরে, তার পরেই ওরে বাবারে মেরে ফেললে রে—বলে সে কি চেল্লালো! রাস্তার লোকরা দু-একজন যদি বা ফিরে তাকাল, তারাও বলল, 'রাজনীতি করবার আর জায়গা পেলি না, ব্যাটাচ্ছেলে!'

সুযোগ পেয়ে পানুও একবার নিকুঞ্জের ঘাড়ে কষে রামচিমটি বসিয়ে দিল! কিন্তু দুঃখের বিষয়, বগলে পুঁটলিটা থাকাতে চিমটিটা ঠিক জায়গায় না পড়ে পড়ল স্যারের পিঠে। স্যার ভাবলেন এমন বেগতিকে পড়েও নিকুঞ্জর তেজ কমে নি। তাই 'আবার চিমটি কাটা হচ্ছে! তবে রে ব্যাটা!' বলে দুবার তার কান মলে দিলেন।

কারো কোনো দিকে হুঁস ছিল না। কখন যে শশধর মল্লিকের দরজা খুলে স্বয়ং শশধর মল্লিক বেরিয়ে এসেছেন, মোড়ের থানা থেকে পুলিস ডেকে এনেছেন, কারো খেয়াল নেই। এবার চারদিকে ভিড় দাঁড়াল। নিশ্চয় চোর। 'ঐ যে ছেলেটার বগলে পুঁটলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, ঐ ব্যাটাই নিশ্চয়ই চোর!'

পানু এতক্ষণে নিজের বিপদ বুঝে পালাবার পথ খুঁজছে, এমন সময় ভিড় ঠেলে সেই বাঘের শিকার হরিণ ছুটে এসে পুঁটলি ধরে টানাটানি! 'দে শীগগির' আমার জিনিস দে বলছি। শশধর বাবু, দেখুন।' গোলমালে শার্ট ছিঁড়ে লাল কালো থলি একেবারে প্রকট হয়েছে।

শশধরবাবু বললেন, 'আঃ, কি কর, টেঁপি মা, ও যে আমার মক্কেলের লোক।' 'আপনার মক্কেলের লোক মানে? আমি তো আপনার মক্কেল!' শশধরবাবু বললেন, 'আহা, তুমি ছাড়া কি আমার আর মক্কেল নেই? তা হলে তো আমাকে না খেয়ে মরতে হত, পয়সা-কড়ি তো দাও না।'

ততক্ষণে পুলিসের লোক দুজন এগিয়ে এসে পুঁটলি ধরে টানতেই টেঁপি চিৎকার করে উঠল, 'আহা, হা মৎ ছোঁও। হামরা গুরুদেবকো আশীর্বাদের পুঁটলি। দিস্‌নে বাবা ওকে, তোকে কিছু দেব। পুলিশ দুজন ফ্যালফ্যাল করে শশধরবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন, 'যেতে দাও, বাবা, কেউ কিছু চুরি করে নি। এরাও মারামারি থামিয়েছে, সবাই আমার নিজের লোক, আর থানা পুলিস করে কি হবে।'

খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা চলে গেল। তখন শশধর বাবু বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, 'আর ফুটপাতে খেল দেখিয়ে কি হবে? চল আমার আপিসে।'

তাই গেল সবাই শেষ পর্যন্ত। চেয়ারে টুলে বেঞ্চিতে টেবিলে যে যেখানে পারে বসে পড়ল। শশধর মল্লিক নিজের জায়গায় বসে, হতাশভাবে নিকুঞ্জকে বললেন, সব চাইতে অবাক হচ্ছি নিকুঞ্জ, তুমি আমার স্টেনো হয়ে কি করে পথের মধ্যে দাঙ্গায় নামলে? টেঁপি খন-খনে গলায় বলল, আপনার স্টেনো আবার কি? ওতো সমাজপতি টিকটিকির চর! বাঘামামার পেছনে ওকে লাগানো হয়েছে।' সবাই এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। 'বাঘা মামা?

বাঘা মামা কে ?' দরজা ঠেলে বাঘের মতো মুখ করে পানুর দ্বিতীয় শিকার ঘরে ঢুকতেই, অঙ্ক-স্যার তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার কাকাবাবু।' শশধর মল্লিক লজ্জিতভাবে হেসে ফেললেন। 'যা ঝগড়া কর তোমরা, কে কার কি হও, ভুলে যাই। তা ট্যাঁপা, নিকুঞ্জকে দুজনে মিলে পেটাচ্ছিলে কেন?

শুনে ছোটমামা ফেটে পড়ে আর কি! 'পেটাব না? আপনি জানেন ও আমাদের ঘরে ছিটকিনি বন্ধ করে পালিয়েছিল! ভাগ্যিস আমার ভাগনের বন্ধু পানু দৈবাৎ এসে খুলে দিল। নইলে ঐখানে দুজনে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যেতাম না ?'

'কেন, তোমাদের বড় সায়েব, সেনগুপ্ত সমাজপতি এঁরা সব কোথায় গেলেন ? ওঁরা খুলে দেন নি কেন?' ছোটমামা বলল ওরা পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছেন। আমি একটা জরুরি তদন্ত নিয়ে একলা আছি।'

অঙ্ক-স্যার বললেন, 'স্যার, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি না গেলেই নয়। আজই একটা ফয়সালা হয়ে যাক। টেঁপি কাউকে ভাগ দিতে চায় না।'

টেঁপি আকাশ থেকে পড়ল। 'কিসের আবার ভাগ ?'

'পোদ্দারের দোকানে যে পুঁটলি টেনে নিয়ে গেছিল, তার ছাড়া আর কিসের ভাগ।'

টেঁপি রেগেমেগে পানুর বগল থেকে পুঁটলি টেনে নিয়ে উলটো করে ধরল। ঝুপ ঝুপ করে একরাশি লাল শাক, রাঙা আলু, মুখি কচু আর একটা ছোট টিনের বাক্স পড়ল। টেঁপি কিছু বলার আগেই অঙ্ক-স্যার ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে, সকলের সামনে সেটা খুলে ফেললেন। ভিতরে কতকগুলো শুকনো পাতা! টেঁপি ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

ঠিক সেই সময় অঙ্ক-স্যারের কাকাও এসে ঘরে ঢুকলেন! বাঘা মহিলাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, সে কি, আপনি প্রকাশ্যে

এখানে এসেছেন যে বড় ? সেনগুপ্ত যাবার আগে বারণ করে যায় নি ?'

বাঘা বলল, 'আপনি ভুল গন্ধ ধরে ছিলেন। কৌটোতে উইল নেই, শুকনো গাঁজার পাতা আছে।'

টেঁপি তার গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় কষিয়ে বলল, আমাদের ছাদে টবের গঁাজার গাছে দাও নি তুমি জল ! আবার ন্যাকা সাজছ ! তুমি বাঘামামার শেয়াল জানলে কবে তোমাকে—' শশধরবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই টেঁপি থামল। কিন্তু চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। আর একেই না পানু হরিণ ঠাউরেছিল ? বিনু তালুকদার ঠিকই বলেন, বাইরের চেহারা দেখে কাউকে বিচার করবে না !' বাঘা মহিলাকে এখন পাঁঠা মনে হচ্ছে।

কাকা বললেন, 'তুই থাম দেখি টেঁপি, আমার শেয়াল আবার কি, ও সেনগুপ্তের চর। তবে আরেকজন চর-ও আছে, শেষ অবধি সেই হয়তো কার্যোদ্ধার করবে।' অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। তারপর কোথা থেকে দুটো পুরনো গাড়ি যোগাড় হল ! সবাই মিলে অঙ্ক-স্যারদের বাড়ি গেলেন। কাকা নিজের গাড়িতে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে সবার চক্ষু চড়কগাছ ! বাড়ির পিছনে অঙ্ক-স্যারের গোয়াল ঘরের চাল নামিয়ে ইট খুলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ! অবিনাশ বসে বসে ছোটমামার গাড়ির পার্টসগুলো আলাদা করে রাখছে।

সে হেসে 'এমনি করেই সার্চ করতে হয় দাদা '

ছোটমামা আর থাকতে না পেরে তাকে হয়তো মেরেই ফেলত, এমন সময় দোতলায় স্যারের ঘরের জানালা থেকে মুখ বের করে গুপি চ্যাঁচাতে লাগল 'ইউরেকা ! পেয়েছি, পেয়েছি !'

তখন যে যার কাজ ও ঝগড়া ফেলে দুদ্দাড় করে দোতলায় উঠে গেল। গ্রিল বন্ধ। 'ওরে গুপি খোল, খোল !, গুপি ওদিক থেকে চাবি দিয়ে খুলল, এদিক থেকে অবিনাশ চাবি দিয়ে খুলল। ইস,

অবিনাশ যে এমন বিশ্বাসঘাতক, ছোটমামার এত কষ্ট করে তৈরি গাড়ি খুলে তচনচ করবে কে ভেবেছিল। পরে অবিশ্যি ছোটমামা বলেছিল, 'থাক, ও এত ভালো রাঁধে, ওকে ক্ষমা করা যাক। অন্ কণ্ডিশন যে ও আমার বাড়িতে রাঁধবে।'

যাক, ও সব পরের কথা। তখনকার মতো সকলেই দোতলার প্যাসেজে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে, গুপির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শশধরবাবুকে দস্তুরমত নার্ভাস মনে হতে লাগল। টেঁপি আর অঙ্ক-স্যারের ধৈর্য্য সব চেয়ে কম। 'কোথায় উইল? বের কর উইল।' গুপি আস্তে আস্তে হাত ঝেড়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে নিজেদের শোবার ঘরে ঢুকল। পানু পর্যন্ত অবাক।

শুধু শশধরবাবু বললেন, 'ভারি চালাক। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!' ঘরের মধ্যে ঢুকে গুপি দেয়ালের সেই রিভার অফ লাইফ ছবির কাছে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কে কে দেবনাগরি পড়তে পারে?' দেখা গেল পানু ছাড়া কেউ পারে না। আর সবাই হয় শেখেই নি, নয় তো ভুলে গেছে। অবিশ্যি শশধরবাবুর কথা আলাদা। তিনি থেকে থেকে গুপির পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল রহস্যটা তাঁর কাছে কিছু রহস্য নয়।

গুপি সমুদ্রতীরের দেহ-রাখা বুড়োর জোব্বায় একটা নক্সা দেখিয়ে বলল, 'এটা কি?' পানু বলল 'দেবনাগরিতে লেখা তালব্য 'শ।'

'তার উপরের মানুষটার হাতে কি?' 'তালব্য শ'

'তার উপরে?'

• 'একটা ধ'

এমনি করে সবটা পড়া হল। নিচে থেকে উপরে একেকটা মানুষের গায়ে একেকটা অক্ষর, তাও সব মানুষের গায়ে নয়। 'শশধর, তাকে ধর, পাবে বর, গুণধর বংশধর।' এ কি! এই নাকি উইল? সই কোথায়?

গুপি বলল, তাও আছে। টেবিলে চড়ে চড়ে পড়েছি, সবচেয়ে উপরে বরফের পাহাড়ের গায়ে, খাঁজকাটার মতো করে লেখা, কামিনীচরণ চৌধুরী।

শশধরবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এইটাই উইল : উইল যেখানে খুসি লেখা যায়। সাক্ষী চাই। পাহাড়ের অন্য গায়ে সাক্ষীদের সব নাম আছে। তবে সত্যিকার উইল একে বলে না। এক যদি বল 'উইল' মানে 'ইচ্ছা'। কামিনীচরণ আমার বন্ধু ছিল, এই ছিল তার ইচ্ছা।'

ওয়ারিশরা ছাড়বে কেন। কোথায় আমাদের সম্পত্তি, দিন শীগগির।' শশধরবাবু পকেট থেকে সত্যি উইল বের করে দিলেন। তাতে লেখা 'চারটি কাঁচকলা কেনার জন্য শশধর মল্লিকের কাছে এক টাকা রাখিয়া গেলাম। বাকি সম্পত্তি জীবনকালেই গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি।'

টেঁপি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। 'তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের যে কিছু নেই। পোদ্দারের গোপন গাঁজার ব্যবসা, তার কাছে গাঁজা বেচে আমাদের বড় কষ্টে চলে!'

তখন নিকুঞ্জ এগিয়ে এসে বলল, 'আমি তো আছি। শশধরবাবু তাড়িয়ে না দিলে, আমার চাকরিও আছে। আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার স্বামী। আমরা গরীব বলে তোমার মা তোমাকে আমাদের বাড়ি পাঠান নি। তাঁর ভারও আমি নিতে প্রস্তুত। তা নইলে আর তোমাদের হয়ে টিকটিকিগিরি করব কেন?'

সবাই বলল, 'সাধু, সাধু।'

শশধরবাবু বললেন, 'একেবারে যে কিছু নেই তাও নয়। তোমার দাদুর দেওয়া দিদিমার গয়নাগুলো আমার কাছে গচ্ছিত আছে। উইল পাওয়া গেলে তোমাদের দিয়ে দেবার কথা।'

এর মধ্যে বড়পিসি উপরে এসে কান্নাকাটি লাগালেন 'আমাকে

কেউ কিছু দেয় নি। আমি মিনি মাগনা খেটে মরেছি। টেঁপি বলেছিল সম্পত্তি পেলে একশো টাকা দেবে। আমি এদের নিজের মামাতো পিসি হই তবু আমাকে এত হেনস্তা!'

আরে সম্পত্তিই নেই তো একশো টাকা!

স্যারের কাকা বললেন, 'বেশ যার যা পাওনা আমাকে জানিও, আমি দেব। আমি সবার বড়। তাছাড়া আমার সম্পত্তি এরা দুজনেই পাবে। তবে, আমি মলে। হিমঘরটা আসলে আমার। যারা যারা চাকরি চাও, দরখাস্ত পাঠাও। খালি অবিনশটা কিছু পাবে না।'

অবিনাশ বলল, 'আমার চাকরি হয়ে গেছে, কর্তা।'

কারো কিছু বলবার রইল না। কাকা বললেন, 'এবার তা হলে দুর্গো পূজোর আয়োজন করা যাক। এই বাড়িতে হোক। প্রতিমার অর্ডার দিয়েছি। তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন।'

শশধরবাবু বললেন, 'এবার কাঁচকলাগুলো নিয়ে গিয়ে আমাকে দায়মুক্ত কর।'

এর আগেও বলেছি বোধ হয় যে গুপিদের বাড়িতে কারও জন্মদিন হয় না। বয়স অবিশ্যি সবারি প্রত্যেক বছর ঠিক ঠিক এক বছর করে বেড়ে যায়। এটাই গুপির একটা বড় দুঃখ। মানে বয়স বাড়াটা নয়, জন্মদিন না করাটা। তাই আমাদের বাড়িতে ওর জন্মদিন করা হয়। রামকানাইদা ওকে খুব একটা পছন্দ করে না, কিন্তু পাছে ও আমাদের বাড়ির রান্নার মধ্যে কোনো খুঁৎ খুঁজে বের করে, তাই সেদিন খুব সকাল থেকে রামকানাইদা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে আর সারাদিনের মধ্যে বেরোয় না।

এ বছর বেজায় ভালো খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। মোগলাই পরটা, সামি কাবাব, আলু মাকাল্লা অর্থাৎ জলের বদলে তেল দিয়ে সেদ্ধ আলু, টোমাটোর চাটনি, পায়েস, পাটিসাপ্টা। অথচ ছোটমামা একটু দেরী করে এসে, কিছুই খেলেন না। আমার ঘরের তক্তাপোষের উপর দুহাতে মুখ গুঁজে বসে রইলেন।

এ তো মহা গেরো। ওদের নতুন মক্কেলের নৌকো করে আমাদের সুন্দরবনের দিকে যাবার কি ব্যবস্থা হল না হল, আজকেই সে বিষয়ে পাকাকথা সব শোনার কথা। অথচ ছোটমামা মুখও

তোলেন না, রা-ও কাড়েন না। গুপি আমার দেওয়া নতুন বাইনকুলারটা দিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল।

আমি ছোটমামার সামনে চেয়ারে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। টেবিল বোঝাই খাবার।

বাবা বড়পিসির বাড়ি গেছিলেন ; মা এ সব ব্যাপারের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করে দিয়ে, নিজে ঘরে বসে থাকেন। গুপি আর আমি এ ওর মুখের দিকে চাইছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বড় মাস্টারমশাই এসে গুপির হাতে একটা এই মোটা বই দিলেন। পুরনো বই, পাতায় পাতায় অদ্ভুত সব ছবি, নাম বর্মার জঙ্গলে। বললেন, কতকগুলো পয়সা নষ্ট করে, বাজে জিনিস না কিনে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার এই বইটা তোকে দিলাম। প্রকাশকরা কবে মরে-ঝরে গেছে বইটা পাওয়া যায় না। আমার নিজের কপিটা তোকে দিলাম। আমার আর কি দরকার? আর যদি নেহাৎ দরকার হয়ও এর চেয়েও মোটা এর চেয়েও লোমহর্ষক অন্য সব অভিজ্ঞতার বিষয়ে লিখে ছেপে নিলেই হবে। এত ভালো বইয়ের তো আর প্রকাশকের অভাব হবে না। শুধু ঐ বিলিতী ক্রিম-লেড পেপার পাওয়া যায় না বলেই এতদিন ছাপা হয় নি।—লোকটা অমন হতাশভাবে বসে আছে কেন?'

এতক্ষণ পরে ছোটমামা মাথা তুললেন। হয়তো বড় মাস্টার এসে অবধি তাঁর দিকে কোন নজর দেন নি বলে একটু চটে থাকবেন। চুল সব খাড়া, চোখ টকটকে লাল, মুখে যেন কেউ এক পোচ কালি লেপে দিয়েছে। গুপি সেদিকে না তাকিয়ে বলল, 'ও মাস্টারমশাই আপনার লেখা বইতে রচয়িতা, টি-ই, মারে, অনুবাদক, শঙ্খ সরকার লেখা কেন?'

বড় মাস্টারমশাই কাষ্ঠ হাসি হাসলেন, 'তা দেবে না তো কি রচয়িতা শশাঙ্ক ঘোষ দেবে নাকি? তাহলে লোকে কিনল আর কি। সায়েবরা না লিখলে এ ধরণের সত্যি অভিজ্ঞতার বই কেনেও না,

সত্যি বলে বিশ্বাসও করে না। আসলে ঐ মারেও আমি, শঙ্খও আমি। এটাকে এরকম আমার বর্মা জীবনের ডাইরি বলতে পারিস্।—তা চাঁদুবাবুর হয়েছেটা কি ?'

ছোটমামা বললেন, গোবরা আমাকে ফাঁসিয়েছে।' শুনে আমরা তো অবাক। ,গোবরা আবার কে ? তাছাড়া সুন্দরবনে যাওয়ার কি হল ?' ছোটমামা বেজায় রেগে গেলেন, 'স্যারকে কে বা কারা গুম করে রেখেছে। গোবরা মালিক হয়েছে আর তোরা এখনো কোথায় যাবি আর কি খাবি তাই নিয়েই মশগুল !'

গুপি বলল, 'বাঃ তুমিই তো বলেছিলে মক্কেলের লঞ্চে করে আমাদের—' 'আরে, মক্কেল বেঁচে থাকলে তবে তো !' রহস্যের গন্ধ পেয়ে বড় মাস্টার কাঠের পা সুদ্ধই আসন পিঁড়ি হয়ে আমার তক্তপোষে বসে বললেন, 'কি ব্যাপার হে ?' ছোটমামার খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে মোগলাই পরটার ভিতরে একটা সামি কাবাব পুরে লাঠি বানিয়ে, বড় একটা কামড় দিলেন।

ছোটমামার মুখের ভাব দেখে রামকানাই তাড়াতাড়ি বড় মাস্টারের প্লেটটা ওঁর সামনে এগিয়ে দিল। ছোটমামা উদভ্রান্তের মতো বললেন, এত কি হবে ? আগে দুটো কাবাব আর একটা পরোটা আনো তো। ব্যাপার আবার কি ? আজ সাত দিন হল ওঁর শালা গোবরার হাতে আপিসের ভার দিয়ে স্যার সুন্দরবনের মক্কেলের সঙ্গে তদন্তের ব্যাপারে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। আছেন কি না কে জানে। এদিকে গোবরা আমাদের সব ছুটি বন্ধ করে দিয়েছে আর বলছে স্যার নেই, ফিরবেন কিনা সন্দেহ' এদিকে টাকার টানাটানি, নাকি মাইনে কমাবে। তার উপর—'

এই বলে ছোটমামা খানিকটা আলু-মাকাল্লা মুখে পুরে দু হাতে চোখ ঢাকলেন। বড় মাস্টার তাঁর কোঁকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে বললেন, 'ও কি ! বিষম লাগবে না ? তার উপর কি ? আর ছুটি বন্ধ আবার কোথায় ? এই তো দিব্যি ছুটিতে এসেছ দেখছি।'

ছোটমামা আরেকটু আলু-মাকাল্লা মুখে নিয়ে বললেন, 'ছুটি! একে আপনি ছুটি বলেন? প্রাণ হাতে নিয়ে ভূতের বাড়ি তদন্তে যাওয়াটা আপনার কাছে ছুটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা ঐ তদন্তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়, তাদের কাছে একটুও ছুটি নয়। গুপি, হাঁ করে দেখছিস কি? খালি পেটে তদন্ত করা যায়? সমস্ত শক্তিগুলোকে নখের আগায় নিয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। আজ তোর জন্মদিন না হলে, এক চাঁটি মারতাম। এই নে ধর।'

এই বলে ছোটমামা পকেট থেকে একটা নতুন পেন্সিল-টর্চ বের করে গুপির হাতে দিলেন। গুপি বোকার মতো হাসতে লাগল। আমি গলা খাঁকরে বললাম, 'ইয়ে কি বলে, ছোটমামা, আমাদের তো কাল থেকে ঈস্টারের ছুটি, আমাদের সঙ্গে নাও না কেন? সুন্দরবনকে-সুন্দরবনও যাওয়া হবে, ভূতের বাড়ি-কে ভূতের বাড়িও দেখা হবে। সুন্দরবনের পথে মক্কেলের পৈত্রিক বাড়ির বড় বদনাম বলেছিলে না? সেই বাড়িই নিশ্চয়?'

আমরা যাব শুনে ছোটমামা এমনি খুশি হলেন যে আরো অনেকগুলো কাবাব খেয়ে ফেললেন।

তারপর লজ্জিতভাবে বললেন, 'আর কিছু নয়, তবে জানিস-ই তো কোনো এক্সাইমেণ্ট হলে আমার হাতে পায়ে খিল ধরে, তাই একা যেতে ঘাবড়াচ্ছিলাম! তোরা গেলে কথাই নেই।'

বড় মাস্টার অন্য লোকের কথাবার্তা সইতে পারেন না! তিনি বললেন, 'আমারো ঈস্টারে সুন্দরবনের দিকে যাবার ইচ্ছা। তবে মক্কেলের লঞ্চে নয়। আমি যাব আমাদের ছাপাখানার বড় সায়েবের বেয়াইয়ের মাল নৌকোতে। জানিস তো, এখানকার বন্দরে জায়গা কুলোয় না তায় নিত্যি ধর্মঘট। আপিসে কাগজ বোঝাই জাহাজ গঙ্গাসাগরের কাছে একমাস ধরে অপেক্ষা করছে। আমরা মাল খালাস করতে যাব। ইচ্ছে হলে তোরা সঙ্গে যেতে পারিস। খাওয়া-দাওয়ার ভার তোদের, যাওয়া আসার ভার আমার—কি বলিস?'

ছোটমামা বড় মাস্টারের কাঠের ঠ্যাঙ জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। 'বাঁচালেন, স্যার, হাতে চাঁদ গুজে দিলেন। গোবরা যাতায়াতের আর থাই-খরচার জন্য একশো টাকা দিয়েছে। তাইতেই আমাদের চারজনের রাজার হালে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু নৌকো কে চালাবে তাহলে? ছোটবেলায় আমার হাতের কব্জিতে টিকটিকি কামড়ে ছিল কিনা তাই একেবারে জোর পাই না।'

বড় মাস্টার বললেন, 'গোরিলার ভাই অত কাঁচা কাজ করে না হে। বড় সায়েবের ভায়রার আটজন মাঝি সঙ্গে থাকবে। তারাই আমাদের সব কাজকর্ম করে দেবে। সুন্দরবনের পথে ঘুরে ঘুরে ভূত-ফুতের ভয় ঘুচে গেছে। তবে আগে মাল খালাস, তারপর তদন্ত। জাহাজ তো আর বসে থাকবে না।'

ছোটমামা বললেন, 'তবেই তো মুস্কিল! যত দেরি করা যাবে, স্যারের জীবন ততই বিপন্ন হবে।' গুপি বলল, বেশ তো যাবার সময় মাস্টার মশায় আমাদের নামিয়ে দেবেন, আমরা তদন্ত করতে থাকব; ফেরার সময় তুলে নেবেন। তবেই তো লেঠাটা চোকে।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। বাড়ি থেকে আগেই অনুমতি নেওয়া ছিল, ছোটমামার মক্কেলের লঞ্চে বেড়াতে যাব। তার উপর বড় মাস্টারও চলেছেন, এতে কারো আপত্তি থাকারও কথা নয়, হয়ও নি। তবে মাল নৌকোয় যাওয়ার কথাটা ছোটমামা চেপে যেতে বললেন। নাকি গোবরার কানে উঠলে, তাই নিয়ে সে মহা ঝামেলা পাকাবে।

গুড ফ্রাইডের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা তক্তাঘাটের পাশে বাঁধা খালিমাল নৌকোতে উঠলাম। খালি বলে একেবারে খালি নয় অবিশ্যি, খোলটা চূণ সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়ে বোঝাই। মাল নৌকো কখনো খালি যাওয়া আসা করে না উল্টে যাবার ভয় থাকে। তাছাড়া যেতে আসতে মাল থাকলে ডবল রোজগার হয়।

বেশ বড় নৌকো, তলাটা মনে হল চ্যাপ্টা। স্যার বললেন তা হলে বালির চরে আটকে যাবার ভয় থাকে না। পাটাতনের উপরের দু দিকে দুই গাদা পাটের দড়ি। মাঝখানটা ফাঁকা। মাঝিরা ফাঁকাতেই থাকতে নাকি ভালোবাসে। খোলা পাটাতনে তোলা উনুনে রাঁধা-বাড়া করে, কাঠ কয়লার আঁচে। ক্যাবিনের ছাদে বসে খায়, অনেক সময় শোয়ও।

আমাদের সঙ্গে দুটো জনতা স্টোভ, বাসনপত্র, চাল, ডাল, তেল, ঘি, আলু, পেয়াজ, ডিম, টিনের মাংস, রুটি, মাংস, বিস্কুট, চা, গুড়ো দুধ, শুকনো মিষ্টি, কুচো গজা ইত্যাদি। মাছ তরকারি নাকি পথেই কেনা যায়। তাছাড়া আমরা তিনদিন পরেই নেমে যাব। ছোটমামা বললেন, মোটরে গেলে নাকি এক দিনেরো কম, তবে অনেক অসুবিধা আছে। তাই মক্কেলরা লঞ্চেই যাওয়া আসা করে।

রাতের খাবার যা সঙ্গেই দিয়েছিলেন। তার আগে আমরা ডেকে পা ছড়িয়ে বসে দেখছিলাম নদীর দুপাশে আলোগুলো কেমন পেছিয়ে পড়ছে। শেষটা চারদিকে কেমন অন্ধকার। কোথাও মিটিমিটি গাঁয়ের আলো জ্বলছে। নেড়ি কুত্তোরা চেঁচাচ্ছে। স্টিমার, লঞ্চ, নৌকো কত আসছে যাচ্ছে। অন্ধকারে জলের উপর কেমন একটা চওড়া আলোর দাগ কেটে সব চলেছে। অদ্ভুত সব জিনিস ভেসে যাচ্ছে। বড় মাস্টার বললেন, 'শুশুক দেখেছিস তোরা? হাঙ্গর চেনা যায় জলের উপর তুলে ধরা তিন-কোনা পাখনা দেখে। একবার—'

এই বলে মাস্টারমশাই থেমে গিয়ে ছোটমামাকে বললেন, 'চাঁদ, ব্যাপারটা খুলে বল।' ছোটমামা বললেন, 'গোবরা বলছিল,

কথা পাঁচ কান না হওয়াই ভালো।' স্যার রেগে গেলেন, 'ভালো চাও তো বল, নইলে বয়ার উপর নামিয়ে দেব।' ছোটমামা বললেন, 'নতুন মক্কেল তাঁর বাবার দূর সম্পর্কের কাকার সম্পত্তি পেয়েছেন। ঐ বিশাল বাড়ি আর লাখ বিঘে জমি। তার অনেক আয়। কিন্তু একটা শর্ত হল, ঐ বাড়িতে থাকতে হবে।

বড় মাস্টার বললেন, 'ভালোই তো। সম্পত্তির কাছে থাকা হবে।'

ছোটমামা বললেন, 'ও বাড়িতে ভূতের উপদ্রব।'

বড় মাস্টার হা-হা করে এমনি জোরে হেসে উঠলেন যে দুই ধারের উঁচু পাড়ি থেকে বিশ্রী প্রতিধ্বনি হতে লাগল। ভূতের উপদ্রব একটুও অদ্ভুত মনে হল না।

ছোটমামা বললেন, 'ইচ্ছে হয়তো হাসতে পারেন। কিন্তু টিকতে না পেরে অনন্ত রায় 'সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশনের' শরণাপন্ন হয়েছেন। আমাদের স্যার নিজে তাঁর সঙ্গে তদন্ত করতে গেছিলেন। পাঁচ দিন আগে ফেরার কথা ছিল। আজ অবধি দুজনার কারো পাত্তা নেই : অনন্তর বর্ধমানের হোটেলের ঠিকানায় কেউ কিছু জানে না। ভূতের বাড়ির ঠিকানাও কারো জানা নেই। শুধু এইটুকু শুনেছিলাম নামথানা খাল পেরিয়ে, বাঁ হাতে, উঁচু পাড়ির উপরে দুশো বছরের পুরনো মস্ত বাড়ি ; নৌকো থেকেই চোখে পড়ে। অনন্ত রায় স্যারকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিলেন' তাই স্যারও আমাদের কাছে কিছু খুলে বলেন নি। কে জানে দুজনেই হয়তো বে-ঘোরে—' এই বলে ছোটমামা চুপ করলেন। গুপি বলল' 'তাই জন্য অত হাঁড়ি মুখ করার কি আছে বুঝলাম না ছোটমামা। উনি তো আর তোমার আত্মীয় নন। যদি বেঘোরে কিছু হয়েই থাকে, তাতেই বা কি এমন ?'

ছোটমামা মহা চোটে গেলেন। কি এমন মানে ? তুই কি বলতে চাস্ আমাকে গোবরার আণ্ডারে চাকরি করতে হবে, আমি

বললাম 'ভালো না লাগে তো ছেড়ে দিও।' ছোটমামা মাথা নাড়লেন 'তা হয় না। দু বছর এক নাড়াতে লেগে না থাকলে বিনু তালুকদারের তদন্ত বিভাগের চাকরিটা পাব না।'

আমি বললাম 'তাহলে খাওয়া যাক।'

পরে ক্যাবিনের খোলা ছাদে শুয়ে শুয়ে গুপিকে বললাম 'আরেকটু জানলে হত। ও বাড়িতে কে থাকে? ভূতেরা কি করে?' গুপি বলল 'হু, ভারি রহস্যজনক।' বলেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও নদীর ঝিরঝিরে বাতাসে খোলা আকাশের নিচে সপ্তর্ষি মণ্ডল খুঁজতে খুঁজতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

এটা কিছু আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নয়, কাজেই যাত্রাপথের বেশি বর্ণনা দিলাম না। কত আমবাগান, পেয়ারাবাগান, কলাবাগান পেরিয়ে গেলাম। বড় মাস্টার কত গল্প বললেন। ভালো করে শুনলাম না। ভূতের বাড়ির রহস্যটাই তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা। একবার বড় মাস্টার বললেন, 'নাঃ—তোদের ওখানে নামা হয় না। তা হলে আমার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে!' ছোটমামা বললেন মাঝিদের সঙ্গে সেটার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

বাঁয়ে নামখানা খালের মুখ পেরুলাম সন্ধ্যের আগে। আরো খানিকটা এগুতেই বড় মাঝি আঙুল দিয়ে দেখাল—ঐ হোথায় উঁচু পাড়ির উপরে বিশাল একটা ধ্বংসাবশেষ। দেখে আমরা চমকে উঠলাম! ওখানে কি করে মানুষ বাস করতে পারে বুঝলাম না। বাদুড়, প্যাঁচা, সাপ ছাড়া আর কোন কিছু বাস করতে পারে মনে হল না। গুপিকে বললামও তাই। গুপি তাতে বলল, 'এক যদি ভূত থাকে।' আমি বললাম, 'যদি থাকে আবার কি? আছে বল। তাদের উপদ্রবে অনন্ত রায় টিকতে না পেরে সমাদ্দার ইন-ভেস্টিগেশনের শরণাপন্ন হয়েছেন না?' বড় মাস্টার বললেন, 'কলকাতার এত ভালো ভালো ডিটেকটিভ থাকা সত্ত্বেও বর্ধমানের ডিটেকটিভের কাছে যাওয়া কেন, সেটা বুঝতে পারলাম

লঞ্চটা কই ?' গুপি বলল, 'লঞ্চ না থাকাটাকে ভালো লক্ষণ বলে ধরে নাও। ওঁরা নিশ্চয় ভূতের বাড়িতে নেই।' আমি বললাম 'কিম্বা—'

গুপি তেড়িয়া হয়ে উঠল! 'কিম্বা আবার কি? ভূত কিছু সমাদ্দারকে এখানে বেঁধে রেখে লঞ্চ নিয়ে হাওয়া হয় নি এটা তো মানিস?' আমি বললাম, 'কি জানি।' বলে হন হন করে উঠতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওপরের খোলা জমিতে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

অবিশ্যি অন্ধকার ঘুরঘুটি। কোথাও কিছু ঠাওর হয় না। খালি ডান হাতে একটু দূরে ভাঙ্গা বাড়ির সেই জানালার ফাঁক দিয়ে ওপরের আকাশে তারা মিটমিট করছে দেখা যাচ্ছিল। আর হু-হু করে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। কতক শীতে, কতক দুর্ভাবনায় আমাদের গা শিউরে উঠছিল।

ছোটমামা আমাদের দুজনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। গুপি একটু কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ধেৎ! সব পণ্ডশ্রম। এটা একটা বহুদিনের পরিত্যক্ত ভাঙ্গাচোরা বাড়ির খোলস। এর মধ্যে ভূতফুতের জায়গা নেই—ইক!' সঙ্গে সঙ্গে ওঁ—ওঁ—ওঁ করে চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে। এমনি একটা বিশ্রী আওয়াজ আমাদের কান ঝালাপালা করে দিল যে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠছে টের পেলাম।

ছোটমামা আমাকে জাপ্টে ধরে পড়েই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি একটা মনে পড়তেই, খচ-মচ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যারের সাইরেন!' বলেই পোড়ো বাড়ির দিকে টেনে দৌড় মারলেন। অমরাও পড়ি-মরি করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। আওয়াজটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থেকে আবার শুরু হল।

ছোটমামা নাকিসুরে চিৎকার করে উঠলেন, 'কোনো ভঁয় নেই, স্যাঁর, আঁমি আঁছি!' বলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

'কোঁথায় স্যাঁর! কোঁথায় আঁপনি ওঁ—ওঁ—ক্?' হঠাৎ চারদিকে চুপচাপ হয়ে গেল। গুপি আমাকে আঁকড়ে ধরে ঠক্-ঠক করে কাঁপতে লাগল। আমারো হাত কাঁপছিল। তবু কোনো মতে হ্যাভারস্যাক খুলে দুটো কালো জোব্বা বের করে একটা ওকে পরালাম, একটা নিজে পরলাম। জোব্বার পকেটে রামকানাইদার শেকড়ের দুটো টুকরো পুরে বললাম, 'চল, দেখি গিয়ে।' অন্ধকারে মিলে গিয়ে দুজনে এগুলাম।

বুঝলাম বড় মাস্টার ঠিকই বলেন, ভয় খাবার একটা সীমা আছে। সেটা পেরুতে পারলেই মনে মনে অসম্ভব সাহস আসে! আমাদের মনেও আর ভয় ডর রইল না। তাছাড়া পকেটে শেকড়, পরনে জোব্বা। গুপি ছুটে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি ওকে টেনে ধরে সাবধান করে দিলাম। 'সাবধানে এগুতে হবে।' তাতে অবিশ্যি কোনো লাভ হল না! কারণ—ভাঙ্গা হল ঘরে পা দেবামাত্র পায়ের তলায় মেজে হড়—হড় করে সরে গেল, আমরা একটা অন্ধকূপে পড়ে গেলাম। মাথার উপর মেজেটা হড়-হড় করে সরে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও বাতাসটা বেশ তাজা, তার মানে বাইরে যাবার পথ আছে। বেশি লাগেনি কারণ বেশি দূর পড়িনি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই ওপরে মাথা ঠুকে গেল। গুপির কনুই চেপে ধরে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলাম!

কথা বলছিলাম না। ছোটমামাকে কিসে নিল ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নাকে একটা সোঁদা গন্ধ আসছিল। কিসের গন্ধ কে জানে। তারি মধ্যে হাঁউ-মাউ করে সে কি বিকট চিৎকার! ধুপ ধাপ শব্দ। 'ওরে বাবারে মারে। আঁউ, আঁউ ভূ—উ—উ—ত!' তারপর সব চুপচাপ।

বেজায় সাহস হল আমাদের। গুপি চ্যাঁচাতে লাগল—'ও ছোটমামা, তুমি কোথায়?' ক্ষীণ একটা দাঁত কপাটির শব্দ ছাড়া

কানে কিছু এল না। গুপি স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ছোটমামা! ও কি হচ্ছে! 'কে—কে? সত্যি গুপি নাকি? মনে হল ক—কঙ্কাল!'

এতক্ষণে টর্চ জ্বালা হল। ছোটমামা দেয়াল ঠেস দিয়ে, হাত পা এলিয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম. 'কঙ্কাল আবার কিসের? এতো আমাদের পুজো কমিটির ভূষণ্ডির মাঠের ভূতদের ড্রেস্। অন্ধকারে গেলে ফসফরাস পেন্ট দিয়ে আঁকা হাড় গোড় জ্বলজ্বল করে আলোতে কিছু বোঝা যায় না।'

গুপিও যথেষ্ট অবাক। এতক্ষণ সেও কিছু টের পায় নি। নিজের অপ্রস্তুত ভাব ঢাকবার জন্য সে বলল. 'কারা পালাল ছোটমামা?' ছোটমামা বললেন, 'ভূত-টুত নয় আশা করি! কালো মুখোশ পরা কারা। আমাকে বাঁধতে চেষ্টা করছিল। কঙ্কাল দেখে হাওয়া!'

বলে ছোটমামা বিকট অট্টহাস্য করতে লাগলেন।

গুপি আমাকে বলল, 'বোধহয় হিস্টিরিয়া।'

হঠাৎ ছোটমামার হাসি থেমে গেল। টর্চের আলোতে দেখলাম মুখে গ্যাগ পরানো, আষ্টে-পৃষ্ঠে দড়ি বাঁধা, ছোটমামাদের বড় সাহেব, একটা খুদে মোড়ায় হাঁটু মুড়ে রয়েছেন। মুখটা লাল, চোখ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

গ্যাগ দড়ি খুলে দিতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ছোট-মামা ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে মুখে জল ছিটিয়ে দিতে উঠে বসলেন। বললেন, 'কেন এলে? এখান থেকে বেরুবার কোনো উপায় নেই।'

আমি বললাম, 'ওরা গেল কি করে?' বললেন, 'একটিমাত্র পথ। বাইরে থেকে তালা দিয়েছে. শব্দ শুনেছি। কিছু খেতে দিতে পার।'

বলতে ভুলে গেছি, এত সব কাণ্ডের মধ্যেও খাবারের থলিটি হাতছাড়া করিনি। এটা আমাদের পাণ্ডা বিনু তালুকদারের শিক্ষা। উনি বলেন, 'সর্বদা দুটি ব্যবস্থা তৈরি রাখবি. বেরুবার পথ আর

খিদে মেটাবার খাবার !' আপাততঃ দ্বিতীয়টা অবলম্বন করা গেল। ছোটমামার পকেটে মোমবাতি ছিল। সেটা জ্বেলে নিমকি, মোয়া, ডিমসিদ্ধ, রুটি-মাখন আর জল খাওয়া গেল।

ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে গেছিল। জায়গাটা ঘুরে দেখলাম। গুদোমঘর মনে হল। হাঁড়ি-হাঁড়া, ছাতা, ছাঁকনি, খড়ের গাদা, তক্তপোষ, দড়ির গাছা, মাটির কলসি আর সোঁদা গন্ধ। স্যার বললেন, 'আগে এখানে কেউ চোরাই চোলাই কারবার করত। অর্থাৎ বে-আইনি তাড়ি বানাত। গন্ধ পাচ্ছ না ?'

গন্ধ পাচ্ছিলাম, তার চেয়ে বেশি ঘুম পাচ্ছিল।

স্যার বললেন, 'আজ আর নয়, কাল সকালে সব শুনো।' যে যার খড়ের গাদা টেনে নিয়ে পড়ে ঘুম লাগালাম। সকালে স্যার বললেন, 'অনন্তর কি হল কে জানে। নিচে লঞ্চ দেখলে ?' 'না তো, লঞ্চ তো নেই-ই।'

নিজের থেকেই স্যার বললেন, অনন্তকে বুঝে উঠলাম না। হেনা-তেনা বলে লঞ্চে করে এখানে নিয়ে এল। গভীর রাতে পৌঁছলাম। বাড়িতে পা দিতেই অন্ধকারের মধ্য কতকগুলো লোক সেই-যে আমাকে ধরে বেঁধে রেখে দিল, সেই ইস্তক সারা দিন বাধা, সারা রাত ছাড়া অবস্থায় বন্দী। দিনে একবার জল আর দুধ পাউরুটি খাওয়া। অনন্তর পাত্তা নেই।'

ছোটমামা বললেন, 'স্যার, এ বাড়িতে কেউ থাকে না। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে থাকে নি। অনন্তর এদের সঙ্গে ষড় আছে।' স্যার অবাক হলেন, 'কিন্তু আমাকে কেন ? আমাকে সরিয়ে কার কি লাভ ?' ছোটমামা দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'লাভ শুধু গোবরার।' স্যার ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, সটাং উঠে বসলেন।

'গোবরার ? আচ্ছা। একটু একটু আলো দেখছি যেন। গোবরা তো অনন্তর ফ্রেণ্ড।' বলে সেই যে গুম হয়ে রইলেন, সারাদিন মুখ খুললেন না। আমরাও সারাদিন বেরুবার একটা

পথের সন্ধানে ঘরে বেড়ালাম। মাটির নিচে ভিতের তলায় খোঁদল কেটে এই জায়গাটা তৈরি। সেকালে হয়ত ঈস্ট ঈণ্ডিয়া কোম্পানির কেউ করেছিল। এখানে শত্রুর হাত থেকে মাল নিরপদে রাখত। বন্দিদেরো রাখাও অসম্ভব নয়। হল ঘরের চোরা ট্র্যাপডোর দিয়ে নিশ্চয় জিনিস নামানো হত। তলা থেকে খোলার কোনো উপায় দেখলাম না।

বিকেলের মধ্যে খাবার শেষ, জলও প্রায় শেষ। তখন একটু একটু ভাবনা হতে লাগল। শুয়ে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় হুড়মুড় দুমদাম খটখট। বড় মাস্টার তাঁর আটজন মাঝির ছয়জনকে নিয়ে ট্র্যাপডের খুলে এসে হাজির।

বললেন, মাল খালাস হচ্ছে, হক। ভাবলাম একবার দেখেই যাই। এ বাড়ি তো কারো বসত বাড়ি হতে পারে না। ত্রিশ বছর আগে এটা আমার দাদা গোরিলার হেড কোয়ার্টার ছিল। তখনি জানতাম বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি। ভূত-ফুতের কথা তো শুনি নি। তাছাড়া ঐ অনন্ত রায়কে আমি খুব চিনি। কাছেই থাকে। ব্যাটাকে সটাং ওর বাড়ি থেকে ধরে আনছিলাম। নেহাৎ পালিয়ে গেল। তবে লঞ্চটাকে এনেছি। আমাদের জাহাজের পাশেই নোঙর করা ছিল। আমার স্যারের বেয়াই-এর সম্পত্তি—ভাড়া খাটা লঞ্চ, মশাই। দেখে চিনতে পারেন নি? হু!'

তারপর উঠে পড়ে আমার আর গুপির পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ভেরি গুড্, বর্মাতে আমিও ঠিক এইভাবে মানুষ হয়েছিলাম।' অথচ আমরা সবাই জানতাম কোনো জন্মে উনি দেশের বাইরে টাইরে যান নি-টান নি। উনিও জানতেন যে আমরা জানি।

আর বলার বেশি কিছু বাকি নেই। সেই রাতেই আমরা ঐ লঞ্চে করে কলকাতার দিকে রওনা হলাম। বড় মাস্টার একটি স্টিমার চেপে তাঁর জাহাজের কাজে ফিরে গেলেন! ছোটমামা কাউকে কিছু বলতে মানা করে দিয়ে ওঁর বড় সাহেবের সঙ্গে বর্ধমান চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে গোবরা হাতে-নাতে গ্রেপ্তার। ছোটমামার কাছে শুনলাম সমাদ্দার সাহেবকে কেউ কখনো এত রাগতে দেখে নি। গোবরার হাতে হাত-কড়া পরিয়ে, একটা লিকলিকে বেত হাতে নিয়ে, তাকে নাকি জেরা করা হল। জেরা করে জানা গেল, স্যার যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। সমস্ত ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্যারকে কয়েকদিনের জন্য বর্ধমান থেকে সরানো, যাতে গোবরা সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের কর্তা হয়ে একজন বিশেষ মক্কেলকে ভাগাতে পারে। কারণ স্যারের কানে ব্যাপারটা উঠলে গোবরার ফ্রেণ্ড অনন্ত রায়ের আর রক্ষা ছিল না। বাড়িতে বলে টলে একাকার করতেন। গোবরা তাই বন্ধুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে, এই কাণ্ডটি করেছিল।

দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা এর বেশি কেউ আমাদের বলল না। ছোটমামা পর্যন্ত বললেন, 'আমার চাকরি যায়, তাই চাস? জানিস তো এক নাগাড়ে এক বছর লেগে থাকতে হবে! স্যারের বারণ আছে।'

থালি বড় মাস্টার অন্য গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বলে বসলেন, 'অনন্তের ব্যাপার থেকে তোদের এই শিক্ষা হোক যে ঘোড় দৌড়ের মাঠে কখনো যাবি না।' তারপর একটুক্ষণ থেমে কি ভেবে বললেন, 'অন্ততঃ আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবি না।'

সমস্ত ব্যাপারটার ইতিবৃত্ত সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে খাতায় লেখা আছে। আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা যেখানে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করতেন। ব্যাপারটা খুব ঘোরেল। অকুস্থলের নাম বলব না, শেষটা সবাই চিনে ফেলবে। শুধু এইটুকু বলে রাখি ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রথম বর্গের প্রথম অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। তারি উত্তর দিকে একটা পুরোনোরাস্তা। সেই রাস্তায় গায়ে গায়ে লাগা তুটি বাড়ি, সেকালে যেমন হত। মাঝখানের দেয়ালটা এ বাড়ির-ও, ও বাড়ির-ও। তবে ছ্যাঁদা করে-করে দেখবার উপায় নেই, কারণ তুদিকের বাসিন্দারাই আরেক প্রস্ত ইঁট লাগিয়ে দেয়ালটাকে তিন পুরু করে নিয়েছিল। একটা বাড়ির নম্বর ১২. একটার ১৩, একটার বাঁ পাশ দিয়ে একটা সরু গলি, সেখানে সিংগেল রিক্স ছাড়া কিছু ঢোকে না। গলিতে ১১ নম্বরের সদর দরজা সর্বদা হাট করে খোলা থাকে, যদিও একটা গোঁপওয়ালা গুণ্ডা লোক তার পাশে সারাদিন টুলে বসে থাকত। আবার তেমনি ১৩ নম্বরের ডান পাশে আরো সরু একটা গলি, সেখানে পাড়ার ছেলেরা সাইকেল চাপা' শেখে, আর কিছু ঢোকে না। সেখানে ১৩ নম্বরের দরজাও সর্বদা খোলা থাকত. কেউ বসেও থাকত না। তবে শোনা যেত একতলার বই বাঁধাই-ওয়ালা নাকি ওদের বিশ্বাসী চর।

১১ নম্বরের এক তলায় একটা ভদ্রগোছের ওষুধের দোকান, বড় রাস্তার উপর তার সদর দরজা। দোতলায় 'ধ্রুপদ'দের পার্টির আপিস। ধ্রুপদ' কারো বাপের দেওয়া নাম নয়, একটা রাজনীতিক দলের নাম। তারা বেজায় প্রাচীনপন্থী। সভ্যদের বয়স একটু বেশি, অবস্থা বেশ ভালো, কোনো কিছুর ভালো হয় তাঁরা চাইতেন না। তিন তলায় গোলক বাবার আস্তানা। সাধু-সন্তদের ব্যাপার, নিরীহ-নীরব। গোলক বাবাজির কানের পচাজের ব্যামো ছিল, হঠাৎ শব্দ সইতে পারতেন না। তবে তিনি কেবলমাত্র শীতকালে তিন মাসের জন্য শহরে আসতেন, শোনা যেত বাকি সময়টা হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ তিন মাসও তিনি তাঁর নিজের ঘরটিতে গোঁপ দাড়ি নিয়ে ধ্যানস্ত থাকতেন। সেখানে শিষ্যদেরও প্রবেশ নিষেধ। নাকি নানারকম ক্ষমতা ছিল তাঁর, তার উপর বেজায় রাগী। যখন তখন কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না। মাসে একবার জনসাধারণের সামনে দেখা দিতেন। ঘটনার সময় তিনি যে চোখ উল্টে ধ্যানে বসা ছিলেন সেটা পুলিসের কর্তা নিজে দেখেছিলেন। ১১ নম্বরের তিন তলায় শিষ্যরা চার বেলা গুরুদেবের খরচায় রাশি রাশি ভাত ডাল তরকারি, মাছ মাংস ডিম, দুধ দই ছানা, চা রুটি কচুরি, গিলত। বাজারের ব্যবসাদারদের মধ্যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের চররা এই সব খবর সংগ্রহ করেছিল। গুরুদেবের ঐ ষণ্ড চৌকিদার ছাড়া, আরো ষণ্ড একজন চাকর আর সবচেয়ে ষণ্ড একজন বামুনঠাকুর ছিল। নাকি যোগাভ্যাস করে ঐ রকম শরীর হয়েছিল। শিষ্যদেরও দু'বেলা ছাঁদে মুগুর ভাঁজতে, ডন বৈঠক করতে দেখা যেত। ওদের গুরুদেব দু'পায়ে তিনজন করে শিষ্য ঝুলিয়ে প্যারালেল বারে নিজে আধ ঘণ্টা অনায়াসে ঝুলে থাকতেন। অবিশ্যি এ-সব হয় তো অনেক বাড়িয়ে বলা তবে আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা বলেন 'যা রটে তার কতক বটে।'

এক দিনে এত খবর সংগ্রহ হয় নি। এক মাস একনাগারে

লেগে থেকে তবে মিঃ সমাদ্দার এত জানতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য খবর সরবরাহের প্রধান ছিলেন ওঁর দ্বিতীয় টিকটিকি অর্থাৎ ছোটমামা৷ একটা সুবিধা ছিল যে ওঁদের আপিসটা বর্ধমানে হওয়াতে অকুস্থলের কেউ ওঁদের কাউকে চিনত না। দ্বিতীয় টিকটিকিকে তো নয়-ই তাঁর কাজের নিয়ম এমন ছিল যে তাঁর নিজের আপিসে-ই খুব কম লোক তাঁর আসল নাম জানত। তাঁকে দেখে কে খুঁদে টিকটিকি বলে চিনবে? রোগা লিকপিকে চেহারা, বড় বড় কান, কেউ জোরে কথা বললেই গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ শব্দ বেরোয়, কিন্তু ভিতরে সিংহের মতো তেজ। নইলে গোলকধামের জটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যার তার কর্ম ছিল না।

১১ নম্বরের বাড়িটার-ই নাম ছিল 'গোলকধাম'। বলা বাহুল্য মালিক ছিলেন গোলকবাবাজির পরমভক্ত। কেউ কেউ বলত নাকি ভাড়া নিতেন না। মালিক নিজে অবিশ্যি কর্সিং-এ একটা ছোট কাঠের বাড়ি কিনে, সেখানেই থাকতেন। সমতলের বাতাসে তাঁর হাঁপানি বাড়ত। একতলার ওষুধের দোকানের মালিক নাকি ভাড়া আদায় করত, মেরামত ইত্যাদি করাত। তাঁর নাম শ্যামরতন ঘোষ। আশা করি কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে ১১ নম্বরের বাড়িটার অবস্থা ছিল অনেক ভালো। দিব্যি মেরামত করা তাজা রঙ লাগানো, অধিবাসীরাও একটু বেটার ক্লাসের। তবে সেজন্য ওর খ্যাতি ছিল না। সবাই ১১ নম্বরের নাম জানত ওখানে 'ধ্রুপদ' আপিস বলে। ধ্রুপদের তখন খুব হাঁক-ডাক। বিশেষ করে সেই বছরই সকলের চোখ ছিল ধ্রুপদের উপর। কারণ খুব জরুরী একটা আঞ্চলিক ইলেকশনে ওরাই ছিল পাবকদের একমাত্র বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী।

বলেছিলাম কি যে পাবকদের আপিস ছিল পাশের বাড়িতে, অর্থাৎ ১৩ নম্বরে? তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ঈস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের যদি এক খেলার মাঠে থাকতে পারে, তো এরাই বা

পাশাপাশি থাকবে না কেন ? সব বিষয়ে পরস্পরের উল্টো ছিল। পাবকদের অনেকে 'পরশু-পন্থী' বলত। কাল বাদে পরশু অন্য লোকে যা চিন্তা করবে, ওরা হয়তো গতকালই সে সব ভেবে রাখত।

ইচ্ছা করেই ১৩ নম্বর বাড়ি নিয়েছিল ওরা, সায়েবরা ১৩ নম্বরকে অলুক্ষণে বলে কি না, তাই। রোগা ড্রিংটিঙে একপাল সভ্য, আধময়লা জামা পরে দিনরাত খোঁটমোট করত। আসলে অবিশ্যি সবাই সব বিষয়ে একমত ছিল। তর্ক করাটা শুধু একটা অভ্যাস। খাওয়ার মধ্যে শুধু মুড়ি আর তেলেভাজা। অধিকাংশেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। আপিস ঘরের ভাড়া ছিল মাসে ত্রিশ টাকা। তেমনি ঘরও বটে। 'পরশু-পন্থী'দের দলের নেতা বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখা যেত, আপিসঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন, দলের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলত, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল, কালো সার্ট কালো প্যান্ট, বয়স তেত্রিশও হতে পারত আবার তেষট্টিও হতে পারত। নাকি বে-নামায় কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হেড-মাস্টারি করতেন। নইলে টাকাকড় কোত্থেকে আসবে। ওরা তাকে পাঁচুদা বলে ডাকত।

দ্বিতীয় টিকটিকি একদিন আমাদের বাড়িতে বসে, গুপির আর আমার সামনেই বাবাকে বললেন, 'বিশ্বাস করুন দাদা, এই খেমো চেহারার লোকগুলোর এমনি প্রতিপত্তি যে পাশের বাড়ির বড়লোক ধ্রুপদরা থরহরি কম্পমান!' সমস্ত এলাকাটাকে ওরা একেবারে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিল। ইলেক্‌শনে ওদের হারানো খুব একটা সহজ কাজ হবে না, এটা ধ্রুপদরাও খুব ভালোভাবেই জানত। তবে টাকায় কি না হয়? ধ্রুপদরা ঠিক করেছিল তেমন তেমন হলে কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ করবে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এত কথা কি করে জানলি রে,

চাঁহ ?' ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমি জানব না তো কে জানবে, বলুন ? নেতারা গায়েব হলে তো একরকম বলতে গেলে সমস্ত তদন্তটাই দ্বিতীয় টিকটিকির হাতে এসে পড়ে। একমাত্র সেই অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে, সব গোপন কথা টেনে বের করতে পারে।'

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। 'এ্যাঁ! নেতারা গায়েব হয়েছিল নাকি ? বলিস কি ? দুজনেই নাকি ?'

'নইলে আর বলছি কি দাদা ? রাজনীতির ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। ভোট গণনার সঙ্গে সঙ্গে দুই ক্যাণ্ডিডেটই ডিসয়েপিয়ার্ড ! স্রেফ কর্প্পূর। আর সে কি গণনা ! পৃথিবীতে এর জুড়ি দেখা হায় নি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। টাউন হল লোকে লোকারণ্য, পাহারা, পুলিস। দুই দলের লোক নীরবে নিজেদের ছিঁড়ছিল। খানিকটা খুব বেশি ক্ষণের আবেগের জন্য, তবে বেশির ভাগটা আগের ক'দিন ধরে সমানে চ্যাঁচানোর ফলে কারো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না।'

বাবা বললেন, 'কাগজে পড়েছিলাম বটে যে আশ্চর্যের বিষয়, দুই দলের ক্যাণ্ডিডেট একেবারে সমান ভোট পেয়েছিল ! নতুন করে আবার ভোটের কথাও হয়েছিল, কিন্তু ক্যাণ্ডিডেটদের নাকি আর পাত্তাই পাওয়া যায় নি। আশ্চর্য।'

ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, 'ভিতরের কথা জানতে পারলে আর আশ্চর্য হবার মতো কিছুই পাবেন না, দাদা। কিন্তু জানছে কে ? আমার বস, আমি আর দুতিনটি লোক, আর এতদিন পরে আপনি। সমস্ত ব্যাপারটা দেশের শান্তিরক্ষার জন্য একেবারে চেপে দেওয়া হয়েছিল যে। জানবে কে ?' আমি বললাম, 'গুপি, আর আমি মনে থাকে যেন এতে আমাদেরও পার্ট ছিল।' শুনে বাবা তো অবাক। 'তোদেরও পার্ট ছিল। কই আমি তো সে বিষয়ে কিছুই জানি না।' ছোটমামা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'খুব ছোট পার্ট, দাদা, পার্টটাইম পার্টও বলতে পারেন। তাই আর আপনাকে বা

জামাইবাবুকে বিরক্ত করি নি। ওদের পড়াশুনোরও ক্ষতি করি নি। সবটা সমাধান হয়ে গেছিল ওদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আর নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার মাঝখানের দশদিনের মধ্যে। ওরা তো ভালোভাবেই উপরের ক্লাসে উঠে গিয়েছে, আমি কোনো ক্ষতি করেছি, কেউ বলতে পারবে না। বরং ওদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছি।'

গুপি বলল, 'আমাদের সাহায্য না পেলে দশ-বারো দিনে ঐ রহস্য উদ্ঘাটন ছোটমামার সাধ্য ছিল না।'

ছোটমামা বললেন, 'বুঝলেন দাদা, আগে গিয়ে চাক্ষুসভাবে অকুস্থল পরীক্ষা করে এলাম। তাও ছদ্মবেশে বলাই বাহুল্য। সেই দাড়ি-গোঁপটা যে আমার কি কাজেই আসে কি বলব! গুপি বলল, 'সাবধান! শেষে ওটা না দুর্বৃত্তদের চেনা হয়ে যায়।' 'না, না, নেভার। ওর মাঝখান থেকে কিছু লোম কেটে নিয়ে দুটো রঙের বুরুশ বানিয়েছি, তাই গোঁপটা হয়েছে এখন নাদীর শা গোছের। কেউ চিনবে না।'

বাবা বললেন, 'বাই-ইলেকশনের দু'জন জমকালো নেতা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার তদন্ত করল সমাদ্দার কোম্পানি? কেন, পুলিসদের কি হয়েছিল?'

ছোটমামা বোধহয় একটু রেগে গেলেন! বললেন, 'যে সব কেসে পুলিসরা কিছু করতে পারে না, সে সব তদন্তের ভার তারা প্রাইভেট কোম্পানিকে দেয়। যাই হক. দেখলাম ১৩ নম্বরের একতলায় একটা বই-বাঁধাইয়ের দোকান আর একটা চায়ের দোকান। দোতলায় পাবকদের পার্টি আপিস, তিন তলায় মোটে দুটো ঘর। তাও প্রায়ই বন্ধ থাকে, কারণ বাড়ির মালিক চীনে বাজারের কোন এক এনামেলের বাসনের দোকানের ট্র্যাভেলিং সেল্‌স্‌ম্যান। মাঝে মধ্যে এসে তালা খুলে ঘরে ঢোকে, দু চার হপ্তা থাকে, নিচে চায়ের দোকানের মালিকের কাছে খায় দায়। অবস্থা খুব ভালো নয়, রোগা, ক্লিন সেভ করা, চোখে চশমা, ভীতু গোছের লোক। লুকিয়ে

পান্নু তার ফটো পর্যন্ত তুলেছিল। পরে ওটাই হয়েছিল 'ক্লু নং ওয়ান।' 'গোড়া থেকে বল।' এই বলে বাবা পা তুলে বসে রামকানাইকে আরো চা আনতে ইসারা করলেন। ছোটমামা বলতে লাগলেন, 'ভোট গণনার রাত থেকেই দুই ক্যাণ্ডিডেট নিখোঁজ। এই সাংঘাতিক সংবাদ ওদের পার্টির লোকরাই পুলিসকে দিয়েছিল। দু'দলেরি ধারণা অন্য পার্টি তাদের নেতাকে গুম্‌ করে রেখেছে। তাই নিয়ে থানায় সে কি জেরা করা! কিন্তু কোনো ফল হল না। মনে হল সত্যি সত্যি কেউ কিছু জানে না। নেতাদের ভাবনায় দুই দলের মধ্যে এমন ভাব হয়ে গেল যে স্পষ্টই বোঝা গেল আবার ভোট হলে এরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে আর কখনো লড়তে পারবে না। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারীদের এই মত।'

কিন্তু লোক দু'টো গেল কোথায়? সমস্ত বাড়ি সার্চ হল. প্রত্যেকটা লোককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। খালি গুরুদেব কোনো কথা বলেন না, যেমন চোখ তুলে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। স্থানীয় থানার কর্তা তাঁর ভক্ত। তিনি বললেন, দেখুন ওঁকে ঘাঁটানো যা, ভগবানকে ঘাঁটানোও তা।' শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের দশজনকে আর চাকরদের তিনজনকে জেরা করেও কিছু পাওয়া গেল না। তারা কেউ ইলেক্‌শনের নামও শোনে নি। একতলায় ওষুধের দোকানের মালিক বেশ কয়েকদিন থাকতেই অনুপস্থিত ছিলেন, নাকি শরীর খারাপ। তিনি কার্সিয়ং-এ ভগ্নীপতির কাঠের বাড়িতে শরীর সারাতে গেছিলেন, সব চুকেবুকে গেল ফিরে এসে বলেছিলেন, 'দেখেছ কি কাণ্ড!' এই তো গেল ১১ নম্বরের কথা।

১৩ নম্বরের অবস্থাও তাই। তিনতলায় বাড়িওয়ালার ঘরে-ঘরে তালা দেওয়া, তিনি দুমাস অ্যাবসেণ্ট, শীগগির ফেরার কথা।

একতলায় চায়ের দোকানের মালিক একান্নজন সাক্ষী এনে উপস্থিত করেছিল। তারা একবাক্যে বলল, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে কেউ না কেউ সমস্তক্ষণ মালিককে আর তার দুজন ছোকরা

অ্যাসিস্টেণ্টকে দোকানে শুয়ে, বসে বা কাজ করতে দেখেছে। বই বাঁধাই-ওয়ালার দিন পনেরো থেকে হাম, পাড়ার ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, ঘটনার দিন পর্যন্ত সে পথ্যি পায় নি। বিছানা ছেড়ে উঠবারও তার ক্ষমতা নেই, দুজন দুর্ধর্ষ নেতাকে গায়েব করা দূরের কথা। তাছাড়া পাঁচুদা তার দেবতা, তার বাবা, মা ও ভাইবোন। এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তাঁর যদি কোনো অনিষ্ট হয়ে থাকে তো সে ধ্রুরুপদ বাবুদের দেখে নেবে নইলে তার নাম বংশু মাইতিই নয়। এই অবধি বলে সে কপালে দুচোখ তুলে. গা-টান করে, কিট গেল! তদন্তকারীদের চায়ের দোকানের ছোকরাকে ডেকে দিয়ে পত্রপাঠ প্রস্থান।

এই রকম ডেড্-লক্ অবস্থায় সমাদ্দার ইন্‌ভেষ্টিগেশনসকে না ডেকে তারা করে কি? শহরেও যে আরো এবং সুদক্ষ ডিটেকটিভ কোম্পানি নেই তা নয়, তারা যে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে তারি বা ঠিক কি? হয়তো এ দলে নয়তো ও দলে পক্ষপাতিত্ব থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। বলেইছিতো সমাদ্দারের গোপন তদন্ত মানেই ছোটমামা আর ছোটমামা মানেই আমি আর গুপি। আমার নাম পানু, সে কথা এতক্ষণ বলা হয় নি। শেষ রাতের গাড়িতে ছোটমামা এসে গুপিকে তুলে, তারপর আমাদের বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে গুপি বলল, 'ফটো আছে?' 'ফটো? কার ফটো'? অকুস্থলে যাদের যাদের দেখা গেছিল, ঘটনার আগে ও ঠিক পরেই, তাদের মধ্যে যত জনের পাওয়া যায়।'

ছোটমামা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই দেখছি টিকটিকির বাড়া। অত ছবি কোথায় পাব?' 'তুলবে।' আমি ইয়ে—আমার ছবি ভালো হয় না, তাছাড়া ক্যামেরাটা পাচ্ছি না।' আমি বললাম, 'পুলিসের কাছে কিছু থাকতে পারে।' ছোটমামা ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। শেষ অবধি ছবি কতক ইলেক্‌শন পোস্টারের নেগেটিভ থেকে, কতক বাড়ি থেকে জোগাড় হল, কতক

আমি বাবার খুদে ফিক্সড্ ফোকাস্ পুরনো কোড্‌ডাক দিয়ে তুললাম, লুকিয়ে লুকিয়ে বই বাঁধাই ওয়ালার দোকানের চাকরী প্রার্থী সেজে গিয়ে। ঐ ছবিগুলোকে ছোটমামা আগে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুণ না কেন, শেষটায় ওর মধ্যেই চূড়ান্ত ক্লু পাওয়া গেছিল। যাক্‌গে, সে সব পরের কথা।

বারবার নানান সাজে গিয়ে গিয়ে ঐ রাস্তা, ১১ নং আর ১৩ নং বাড়ি, বাড়ি দুটোর দুপাশের গলি, বাড়িতে যারা থাকত, যারা পাবক আপিসে আসত যেত, চায়ের দোকানের খদ্দের, বই বাঁধাইয়ের মক্কেল ওষুধের দোকানের সাইন-বোর্ড, ওখানকার যত দোকানপাট, চুল কাটার সেলুন, অন্যান্য বাড়ির অধিবাসী, সব আমাদের একেবারে নখ দর্পণে এনে ফেললাম। লুকিয়ে কি করে ছবি তুলতে হয় তা এমনি রপ্ত হয়ে গেল যে পরে যুদ্ধের সময়কার স্পাইদের ছবি তোলার গল্প পড়ে আমার হাসি পেত।

অদ্ভুত সব ছবি, একেক জনার ছিরি দেখে কত হাসব। ধ্রুপদরা পার্টি আপিস তুলে দিল। তার বদলে ওখানে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলল। প্রতিষ্ঠা দিবসে ওদের নেতার মস্ত ছবি দেখলাম। গুপি কোন ফাঁকে টুক করে ছবির ছবি তুলে ফেলল। পাবকদেরও যে নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ দুই দলই ততদিনে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল। ধ্রুপদদের বন্ধুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদের ঘরে পাবক মেমোরিয়েল পুস্তকাগার খোলা হল, তাও ঐ এক-ই দিনে। পাঁচুদার খুব ভালো একটা ছবির আরো ভালো একটা ছবি তুললাম।

ছোটমামা প্রকাশ্যে এ-সব অনুষ্ঠানে যেতেন না। তাঁর হয়ে ভিড়ে মিশে আমরা দুজন সর্বদা যেতাম। দুটো বাড়ি, প্রত্যেকটা ইঁট, ভাঙ্গা খড়খড়ি, নড়বড়ে রেলিং, দেয়ালের ছবি, ছিটকিনির ডিজাইন, কড়ি বর্গার সংখ্যা আমাদের মুখস্ত হয়ে গেছিল।

এমন কি গোলকধামের গোলক বাবাজিকে একদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করে এসেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'সব ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' হয়েছিলও প্রায় সবই। একটা তো তখনি হয়েছিল, কারণ এ সুযোগে গুপি তাঁর একটা ফ্রন্ট ভিউ আর একটা প্রোফিল তুলেছিল।

দেখলাম শিষ্যরা অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শুনলাম গুরুদেব নাকি সব কটাকে ধরে তাঁর হিমালয় ভ্রমণের সাক্ষী করে নিয়ে যাচ্ছেন। শিষ্যদের প্রত্যেকের ছবি আমাদের কাছে এখনো আছে পাচক, চাকর আর চৌকিদার কিছুতেই গেল না। স্রেফ পালিয়ে দ্রুপদদের তিনজনের বাড়িতে ভালো মাইনের চাকরি নিয়ে নিল। কে পাচককে রাখবে তাই নিয়ে নাকি ঐ তিনজনের মধ্যে চিরকালের মতো কথা বন্ধ হয়ে গেছিল।

পরে তিন তলাটা কোন সরকারি আপিসের কার যেন ফ্যামিলী কোয়ার্টার হয়ে গেছিল। এই-সবই মাত্র একমাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। ছোটমামা বললেন, এমন পরিপাটি তদন্ত নাকি কম দেখা যায়। ১৩ নম্বরের মালিকও এই সময়ের মধ্যে সফর শেষ করে সাত দিনের জন্য দেখা দিলেন। গামি গলিতে দাঁড়িয়ে তাঁর চমৎকার ছবি নিলাম। আলাপও হল। তিনি বললেন, বয়স হয়েছে, আর কাজকর্ম ভালো লাগে না, এনামেলের বাসন কেউ কিনতেও চায় না, কাজেই সংসার ত্যাগ করে, আলমোরার কাছে কোনো দুর্গম পাহাড়ের উপরে তাঁর গুরুর আশ্রমে তিনি চলে যাচ্ছেন। আর ঐ দুটো অমনি চায়ের দোকানের মালিক তার পরিবারের জন্য ভাড়া নিয়ে নিল। এই সময় ১১ নম্বরের ওষুধের দোকানের মালিক ফিরে এলেন। দশ পারসেন্ট কমিশনে তিনি দুই বাড়ির যাবতীয় ভাড়া আদায় ও মেরামতির ভার নিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে চুকে বুকে গেল বলে যেমন খুসি পুলিস, তেমনি খুসি সমাদ্দার। দ্রুপদ ও পাবক সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা করে আদায় করা ফী টা পকেটে পুরতে পুরতে মিঃ সমাদ্দার

ছোটমামার পিঠ চাপড়ে, তৎক্ষণাৎ দুই মাস পরে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। সেই ছুটিতেই বাবার কাছে এই লোমহর্ষক বিষয়ে গল্প করা হল।

ছোটমামা থামলে বাবা একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সে কি চাঁদু, আসল কথাই তো জানা গেল না। সেই অদৃশ্য দুটি নেতার কি হল?'

ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ও, বলি নি বুঝি? তাঁরা তা নিজেদের হাতে পুলিসের কাছে বিনা ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন যে তারা গোলক বাবাজির আশীর্বাদে রাজনীতি ছেড়ে বাকী জীবনটা নির্জন বাস করবেন, তদন্ত করে আর যেন তাঁদের জ্বালানো না হয়। সভ্যরা বলল এ যে তাঁদের হাতের লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নেই, সই হুবহু চিঠিপত্রের সইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! ব্যস্, ফাইল ক্লোজড! ও রামকানাই, আজ দুপুরে তোমাদের বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে?'

বাবাকে তবু খুব খুসি মনে হল না দেখে আমি এক তাড়া ফটো বের করে বললাম, 'মজা হচ্ছে যে এই ছবিগুলোকে পাশাপাশি রাখলে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব প্রত্যেকটাতে ধরা পড়ছে। পাঁচুদা, ধ্রুপদ নেতা, গুরুদেব, ১৩নং-এর মালিক। এই দেখ প্রত্যেকের ডান কানের লতি ছেঁড়া, বাঁ কানের লতি জোড়া, বাঁদিকের নাকের ফুটোর উপরে আঁচিল আর ডান চোখের নিচে ঠিক একই মাপের একই ডিজাইনের জরুল।

বাবা আঁৎকে উঠলেন। এ্যাঁ, বল কি! তবে কি সবাই একই লোক নাকি। ছদ্মবেশে একেকটা পার্ট প্লে করছিল? কেউ তাদের কখনো একসঙ্গে দেখেনি নাকি?' ছোটমামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'দেখার কোনো কারণই ঘটেনি। যে যার নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন। চেহারা আলাদা রকমের। অবিশ্যি কিছু নকল চুল, দাড়ি, নীল চশমা, গালের মধ্যে আলুর টুকরো বা সুপুরি,

গায়ের চারদিকে পাৎলা রবারের বালিশ আর ছুটো একটা রঙের শিশি থাকলে চেহারার কোনো কিছু ঠিক থাকে না। কালোই বা কি ফরসাই বা কি, রোগাই বা কি মোটাই বা কি ? তাছাড়া—'

এই বলে উঠে পড়ে ছোটমামা চটিতে পা গলালেন। 'যাই, চুলটা কেটে আসি।'

'বস।' বলে এমনি ধমক দিলেন বাবা যে চিঁ-চিঁ করে ছোটমামা বললেন, 'আবার কেন ?'

'তাছাড়া কি ?'

ছোটমামা বললেন, 'ইয়ে, মানে, জানেনই তো যে পনেরো দিনের ছুটির প্রথম দশ দিন রানিক্ষেত ছাড়িয়ে কিছু পর্বতারোহণ করে কাটিয়েছিলাম। সেখানে একটা স্বাস্থ্যময় ছোট্ট শহরে একটা সুন্দর কাঠের বাড়ির নাম দেখলাম 'গোলক'। বেজায় কৌতূহল হল। ঢুকে পড়লাম। মালিক আদর করে বসালেন। দেখলাম

ডান কানের লতি ছেঁড়া, বাঁ কানের লতি জোড়া, নাকে সেই আঁচিল, চোখের নিচে জরুল। বললাম খুলে বল তো, কোন স্টেপস্ নেব না। সে বেজায় রেগে বলল, 'কি স্টেপস নিতে পার তুমি ? কোন বে-আইনী কাজ করি নি। জীবনটা এক ঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল বলে ছুটো রাজনীতিক দলের ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সেজে ছুই পক্ষেই

জয়ী হয়েছি। সেটা কিছু বে-আইনী নয়। আর পাবকরা ধ্রুপদদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো এই এই দেব। •আবার ধ্রুপদরা পাবকদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো হেনা তেনা দেব। কারো মনে কষ্ট দিতে পারিনে, কাজেই দু'জনার কথাতেই রাজী হয়ে, নিজের বাড়িতে নিজের গুরুদেব সেজে ধ্যানে বসে গেলাম। এর কোনটাকেই বে-আইনী বলতে পার না। তারপর সবাই মিলে এমনি খ্যাঁচ-ম্যাঁচ লাগিয়ে দিল যে নিজের আস্তানায় নিরিবিলিতে, নিজের খরচায় চলে এলাম। সেটাও কি বে-আইনী? ১১ নং আর ১৩ নং একটা আমার বাবা, একটা আমার জ্যাঠা আমাকে দিয়ে গেছিলেন, সে কি বে-আইনী? শিষ্যগুলোকে হিমালয় ভ্রমণে পাঠিয়েছি। পরের পয়সায় ক'জন সে সুযোগ পায়? নাকি সেটাকেও বে-আইনী বলবে? এখন সব কথা ফাঁস করলেই আবার, কানের কাছে চ্যাঁ-ভোঁ লাগাবে, আমাকে আবার অন্য আরো দুর্গম আস্তানায় চলে যেতে হবে। বাঁধবার লোকটাকে আমিই রেখেছি। খেয়ে যাবে নাকি?'

'প্রচণ্ড খেয়ে এলাম।'

বাবা বললেন, 'কাকেও কিছু বলেছ নাকি?' ছোটমামা জিব কেটে বললেন, 'ছি, ছি, পায়েস খাবার পর কথা দিয়ে এসেছি যে কাকেও কিছু বলব না।'

গুপি বলল, 'তাছাড়া বলবেটা কি? সে বেচারা তো কোনো অন্যায় কাজ করে নি।'

আমি বললাম, 'বরং ভালো করেছে। আমাদের কেমন তদন্ত শিক্ষা হয়েছে। কি ঠিকানাটা যেন বললেন?'

ছোটমামা ভ্রূকুটি করে বললেন, 'ভুলে গেছ।'

দ্বিতীয় টিকটিকির অন্তর্ধান

আমার নাম পানু। আমার চোদ্দ বছর বয়স। ক্লাস নাইনে উঠেছি। গুপি আমার বন্ধু। আগে আমরা ভাবতাম আমরা চাঁদে গিয়ে ব্যবসা করব। এখন ঠিক করেছি টিকটিকি হব। টিকটিকি মানে যে ডিটেকটিভ, খচমচ করে ছাদে-হাঁটা চার-পেয়ে জন্তু নয়, আশা করি সে কথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমাদের আদর্শ হলেন গুপির ছোটমামা। তিনি এখন বর্ধমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন। অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে তদন্ত চালান। প্রথম টিকটিকে মাইনে বেশি পায় বটে' কিন্তু তাকে বর্ধমানের সবাই চেনে। তাতে তার গোপনে কোনো কাজ করার অসুবিধা হয়। এমনকি বর্ধমানের ছেলেছোকরারা নাকি তাঁর নাম দিয়েছে ছুঁচো।

ছোটমামার কথা আলাদা। তাঁকে কেউ বড় একটা চেনে না। রোগা লিক্‌লিকে খেমো চেহারা, পাঁচ দিনে একবার দাড়ি কামান, ষাঁড় দেখলে তাঁর হাঁটু বেঁকে যায়, বেড়াল দেখলে তোতলামি এসে যায়, আরশুলা দেখলে ভির্মি খান! কে বলবে যে এর পিছনে একটা

ছুঁদে অনুসন্ধানকারী আছে। তাঁর কাছেই আমাদের দুজনের টিকটিকি বিজ্ঞানে হাতে খড়ি।

সে যাই হোক, বড়দিনের বন্ধে একদিন সন্ধ্যেবেলায় মন খারাপ করে বসে আছি। আমার পেয়ারের হুলোবেড়াল নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় গুপি আমাদের স্ট্র্যাণ্ড রোডের তিনতলায় ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত। চেয়ে দেখি তার মুখটা পাঙশা-পানা, চুল উস্কো-খুস্কো, চোখের নীচে কালি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ছোটমামা ডিস্যাপিয়ার্ড!' নেপোর কথা ভুলে গেলাম। থেকে থেকে ও এমনিতেই পালায়। তারপর পাশের বাড়িতে শোনা যায়—কে মাছ খেল! কে ক্ষীর খেল! ছোটমামার উপর বেজায় চটে গেলাম। পরশু আমাদের নিয়ে ডানকুনিতে মাছ ধরতে যাবার কথা, যাদের পুকুর তারা খুব খাওয়ায়, এই কি ডিস্যাপিয়ার করবার সময়? বললামও তাই। ধপ্ করে আমার ঘরের বড় আরাম কেদারায় বসে পড়ে গুপি বলল,—'ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় সে ডিস্যাপিয়ার করে নি, এটা ঠিক। কিন্তু কে শোনে!'

শুনে অবাক হলাম। 'তার মানেটা কি? বাড়ির লোকেরা কি তার খোঁজ করছে না?'

গুপি মাথা নাড়ল। 'খোঁজ তো করছেই না। বরং উল্টে যা-নয় তাই বলছে। কারণ তাদের ধারণা, পাছে বড়মাসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িটা দু-চারদিন আগলাতে হয়, সেইজন্য সে কেটে পড়েছে।'

তা পড়তেও পারে। বললাম সে কথা। উত্তেজনায় চোটে গুপি আরাম কেদারার হাতল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে নিল। বলল,—তুই-ও যদি একথা বলিস্, তাহলে ছোটমামাকে বাঁচাবার কোনো উপায় দেখি না। আসলে দুষ্কৃতকারীরা তাকে গুম করেছে। কিন্তু কাকে বলি সে কথা।'

উঠে পড়লাম। রামকানাইদাকে বললাম—'কি কি ভালো

খাবার আছে নিয়ে এসো।' রামকানাই মাছের চপ আর আলু-মটরের ঘুগনি এনে দিল। গুপি যখন কোনো কথা না বলে মাত্র চারটে চপ আর দুই প্লেট ঘুগনি খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল, বুঝলাম বেচারি সত্যি বড়ই চিন্তিত।

বললাম—'সব কথা খুলে বল। আমি আছি।' তার উত্তর গুপি যা বলল, তা শুনে আমি থ।' প্রথমে পকেট থেকে একটা কালো রঙের কিসের দলা বের করে বলল, 'এটা আমাদের একমাত্র ক্লু।'

'এটা আবার কি? আলকাতরার মত গন্ধ।'

'আলকাতরা হলে ভাবনা ছিল না। সম্ভবত পিচ্-ব্লেণ্ড, এতে খোলো খোলো ইউরেনিয়ামের অক্সাইড থাকে। হয়তো এরই জন্য ছোটমামাকে অকালে হারালাম।' এই বলেই গুপি বার বার নাক টানতে লাগল। ইউরেনিয়ম শুনেই আমি জিনিসটাকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম। গুপি সেটা পকেটে পুরে বলল,—'প্রাণের ভয়টা খুব বেশি দেখছি।'

তারপর কাষ্ঠ হেসে বলল—'নাঃ, তোর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই, তুই আমার একমাত্র সহায় এবং বন্ধু। আচ্ছা, ছোটমামার বন্ধু ডক্টর পাকড়াশীকে মনে আছে? সেই লোকটাই এই ব্যাপারের মূলে আছে বলে আমার সন্দেহ। অন্তত সে নিশ্চয়-ই কিছু জানে। তিনদিন ধরে দুজন মিলে দিনরাত গুজুর-গুজুর ফুস্থর ফুস্থর। তারপর দুদিন হয়ে গেল ছোটমামা নিখোঁজ। দিদিমা এমনি নিশ্চিন্ত যে দেখে এলাম, ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখছেন। ফুরিয়ে গেলে চাঁদু চটবে। চাঁদু বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ, তাঁর জন্যে ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখার কথা ভেবে ছাখ একবার!'

ছোটমামার ডাক নাম চাঁদু, আশা করি, সবাই সেটা বুঝে নিয়েছে। এই বলে গুপি আরো দু-তিনবার জোরে জোরে নাক টেনে বলল—'ওগুলোকে সাবাড় করেছি। ছোটমামাকে পাওয়া

যাচ্ছে না বলে তো আর ভালো জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। পানু, পিচ্-ব্লেণ্ডের কারবার বে-আইনী। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসলে ছুটিতে নেই, গোপন তদন্তে ব্যস্ত। ওদের হালচাল এতদিনে আমার অনেকটা জানা হয়ে গেছে। পাকড়াশী নতুন গাড়ি কিনেছে, তা জানিস? স্রেফ পিচ্-ব্লেণ্ডের টাকা ছাড়া আর কিছু দিয়ে নয়। বন্ধুদের কখনো বিশ্বাস করতে হয় না, এটা লিখে রাখ!'—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম, 'তা নাও হতে পারে। হয়তো পৈত্রিক পয়সাকড়ি আছে।'

গুপি বলল, 'কাঁচকলা আছে। নাকি গবেষণা করে! যারা গবেষণা করে, তাদের কখনো পয়সা থাকে? থাকলে তারা কখনো গবেষণা করত ভেবেছিস? তাছাড়া পাকড়াশীও নিখোঁজ। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছি। ওর দেরাজের মধ্যেই কাগজে মোড়া ঐ কালো জিনিস পেয়েছি। তাতেও আলকাতরার গন্ধ।'

এবার না উঠে পারলাম না। তাড়াতাড়ি করে যে-কটা চপ বাকী ছিল সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে, ঘুগনি পকেটে পুরে, পায়ে চটি গলিয়ে বললাম, 'আগে আরেকবার পাকড়াশীর বাড়ি চল। কাছেই তো, হেঁটে যাওয়া যাক।'

গুপি বলল, 'ওর মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওর বিশ্বাস, ছোট-মামাই ওঁর ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এক ফাঁকে দেরাজটা দেখে নিয়েছিলাম।'

আমরা কড়া নাড়তেই উপরের জানালা থেকে পাকড়াশীর জাঁদরেল মা উঁকি মেরে কড়া সুরে বললেন, 'বলে দে কচিপানা চর পাঠালে কিচ্ছু হবে না। বরং অবস্থা আরো মন্দ হয়ে উঠবে। আর ভাখ, চেতলার মাস্টার মশায়ের বাড়িতে একবার খবর দিয়ে আয়, প্যালা ফেরারি, এখন যে যা খুসি করতে পারে আমি বাধা দেব না।'

কোনো রকমে সেখান থেকে সরে পড়লাম। চেতলার মাস্টার

মশায়কে কে না জানে। অমন অমায়িক মেধাবী বৈজ্ঞানিক ভূ-ভারতে দুটি নেই। খট্ করে রহস্যটা আমার মনের মধ্যে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললাম, 'গুপি, ভুল গাছের নিচে আমরা খেউ খেউ করছি। পিচ্-ব্লেণ্ডের ব্যবসা করা পাকড়াশীর কর্ম নয়। যারা ভালো মানুষ সেজে থাকে, সবার আগে তাদেরই সন্দেহ করতে হয়। কাজেই মনে হচ্ছে, আসল বান্দা ঐ মাস্টার। জানিস তো ওঁর ছাত্ররা ওঁকে কেমন ঠাকুর পুজো করে। পাকড়াশী আর তোর ছোটমামাও তো ওঁর ছাত্র।'

গুপি বলল, 'পাকড়াশীও কিছু কম যায় না। ওঁর সঙ্গে গবেষণাও করে। নিশ্চয় পিচ্-ব্লেণ্ডের কোনো গোপন কাগজপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আগে হয়তো গাড়ি কিনবার পয়সা হাতিয়েছে। কে জানে মাস্টারকে হয়তো ব্ল্যাকমেল করে টাকাটা বাগিয়েছে। ছোটমামার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হতে কতক্ষণ? ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে নিশ্চয় কোথাও নিয়ে গিয়ে—' এই অবধি বলে গুপি এত ঘন ঘন নাক টানতে লাগল যে, আমার দস্তুরমতো ভয় হলো, নাকের ভিতর কিছুতে না জাম ধরে যায়। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তাহলে ছোটমামার চেয়ে পাকড়াশীর বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ বলতে হবে।'

চেতলায় পৌঁছুতে রাত হল। মাষ্টারের বাড়ি নিঝুম। খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলাম। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, দরজা জানালা এঁটে বন্ধ, বুক ধুক-পুক। তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ গুপির ছোটমামা বলেন যে, ভয়ে প্রাণ উড়ে না গেলে, কেউ সাহসী হতে পারে না। হাত পা পেটে সেঁদুবে, তবু দুরু-দুরু বক্ষে কাজ করে যেতে হবে। নইলে যে ভয়ই পেল না, সে আবার সাহসী কিসের? তাহলে তো চেয়ার টেবিলও বেজায় সাহসী, ভূত দেখলেও ভয় পায় না।'

সে যাই হোক, দরজায় কত টকটক করা হল, তবু দরজা খোলে

না, খালি মনে হতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে ঐ আস্তে আস্তে টকটকেও প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

হঠাৎ গুপি আমাকে খামচে ধরে বলল' 'ওরে প্রতিধ্বনি নয়, পানু, ঐ শোন, মর্স কোডে কে বা কারা যেন এস্-ও-এস্; এস্-ও-এস্ পাঠাচ্ছে। ও ছোটমামা গো! তাহলে তুমি আছ!' বলা বাহুল্য, ছোটমামাই আমাদের মর্স কোড শিখিয়েছিলেন। ঐ কথা বলেই গুপি এমনি বিকট সুরে হাউমাউ করে উঠল যে, খট্ করে দোতলার একটি জানলা খুলে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল 'তাহলে এতক্ষণে সত্যিই এলি' রাস্কেলরা! শুনে আমরা থ এ কি! এ যে রাস্তার বিজলি বাতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাস্টার মশাই, অথচ গলার আওয়াজ যে অন্যরকম শোনা যাচ্ছে! অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়লে এমনি করেই মানুষরা বদলে যায়।

মাস্টার মশাই নিচে এসে দরজা খুলেই গুপিকে বললেন, 'মিউ-মিউ-ম্যাও!' সে কি! লোকটা গবেষণা করতে করতে ক্ষেপে গেল নাকি। মাস্টার মশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিয়াও-মিয়াও-মিয়াও।' আমি হাঁ! গুপিকে বললেন, 'গর্-র্! গর্-র্! ফ্যাঁচ্' বলে খপ্ করে দুজনার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

দেখি দুটো চেয়ারে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছোটমামা আর পাকড়াশী বসে। ছোটমামার কোলে নেপো বসে বসে ওঁর উলের জামায় নখ ঘষে ঘষে তাতে শান দিচ্ছে। আমাকে দেখেই এক লাফে আমার ঘাড়ে বসে, গালে গাল ঘষে বলল, 'পিঁ-ই-উ।' তাই শুনে মাস্টারের চেহারা বদলে গেল। বললেন ভারি ইণ্টারেস্টিং তো!' বলে আমার একটু কাছে আসতেই নেপো বলল, 'ফ্যাঁচ্!'

মাস্টার সরে গিয়ে বললেন, 'যেটুকু বেড়ালীর ভাষা শুনে শুনে শিখেছি তাতে মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকে তফাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়!' তারপর মাস্টার মশাই হতাশভাবে বললেন, 'নাঃ, কিছুই হল না।

ওদের ছেড়ে দে।' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তক্ষুনি যদি ওদের দড়ি খুলে দিই, ওরা পালিয়ে যাবে। মাঝখান থেকে আমাদের কিছুই শোনা হবে না, তাই গুপি আর আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। এদের দুজনারই গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা। একটু হু-ম্-ম্-ম্ ছাড়া কোনো শব্দই বেরুল না। তবে মনে হল বেজায় রেগেছে।

মাস্টার মশাইকে বললাম, 'বলুন স্যার।' মাস্টার মশাই অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগলেন, 'জীব-জগতে যে বেড়ালের তুলনা হয় না, এ-কথা প্রাচীন মিশরীয়রাও জানত। তাই—' গুপি বলল, স্যার সংক্ষেপে বলুন। এই বেড়ালটার খিদে পেয়েছে।' মাস্টার চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেন, 'মোটকথা বেড়ালদের নিজেদের ভাষা আছে, প্রাচীন জ্ঞানে ঠাসা! ঐ ভাষা না শিখতে পারলে কিছু জানা হবে না। বিশ্বাস করবে না হয়তো আমি কিন্তু পাঁচ-শো বেড়াল নিয়ে পরীক্ষা করেও কিছু জানতে পারিনি। ঐ পাকড়াশী বলল, যথেষ্ট ফী দিলে ওর বেড়াল-বিশারদ বন্ধু আছে, তাকে পাওয়া যাবে। একটা ট্রেণিং দেওয়া বেড়ালও পাওয়া যাবে। টাকা-কাকা কোথায় পাব, লটারিতে জেতা আমার নতুন গাড়িটাই

ওকে দিয়ে দিলাম। তা এখন বেড়াল-বিশারদকে ঝুটো মনে হচ্ছে তাই তুটোকে বেঁধে রেখেছি। তখন আবার বলছে, আসল ভাষাজ্ঞরা নাকি তুটি ছেলেমানুষ, যে-কোনো সময় তারা এসে পড়বে। বল শীগ্‌গির, তোমরাই কি তারা ?'

বিপদে পড়লে যে উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করে সে কথা ঠিক। তাই চট্ করে গুপি বলল, 'না, স্যার। তারা বিদেশে চলে গেছে।' আমি বললাম, 'মরেও গিয়ে থাকতে পারে।' মাস্টার ফিক করে হেসে বললেন, 'কে জানে হয়তো জন্মায়-ই নি। রোগাটার বাঁধন খুলে দে। আমার নখে ব্যথা। পাকড়াশী আগে গাড়ি ফিরিয়ে দিক। তবে ওকে ছাড়া হবে।'

ছোটমামার যেই বাঁধন খোলা হল, সটাং গিয়ে মাস্টার মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে বললে—কোনো মতেই কি গাড়িটা রাখতে পারবেন না, স্যার ? আমার বড় সুবিধা হয়।'

'তা রাখতে পারব না কেন। আমার বদমেজাজী নিষ্কর্মা কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলেই ওটা ওকে যৌতুক দেব।'

ছোটমামা একগাল হেসে বললেন, 'এই কথা, স্যার ? আমি বলি না জানি কি। তাও নিশ্চয়ই খুসি হয়েই আপনার মেয়ে বিয়ে করবে। কি বলিস্, প্যালা ?'

প্যালার হাত, পা মুখ বাঁধা ছিল ; কিন্তু কান খোলা ছিল। একথা শোনবা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে সে ঘাড় তুলিয়ে সায় দিল।

প্যালার মা-ও খুব খুসি হলেন। আমরাও খুব ভোজ খেলাম। মাস্টার মশাই বেড়াল নিয়ে গবেষণা ছেড়ে দেবেন বলেছেন। বিয়ের পরদিন পকেট থেকে সেই অদ্ভুত কালো টুকরোটা বের করে গুপি মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার এটা কি পিচ-ব্লেণ্ডের ? অমনি ছোটমামা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বললেন, 'আরে, আরে ওটা যে আমার কাশির ওষুধ ! কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দে দে।' গুপি সেটাকে পকেটে পুরে বলল, তাহলে ওতে আলকাতরার গন্ধ কেন ?'

প্যালার মা বললেন, 'ওমা একটু আলকাতরা না দিলে কাশি সারবে কেন ? ঐ খেয়েই প্যালা এত ভালো থাকে। ও যে আমার নিজের হাতের তৈরি। খেয়ে দেখবে নাকি একটু ?'

———
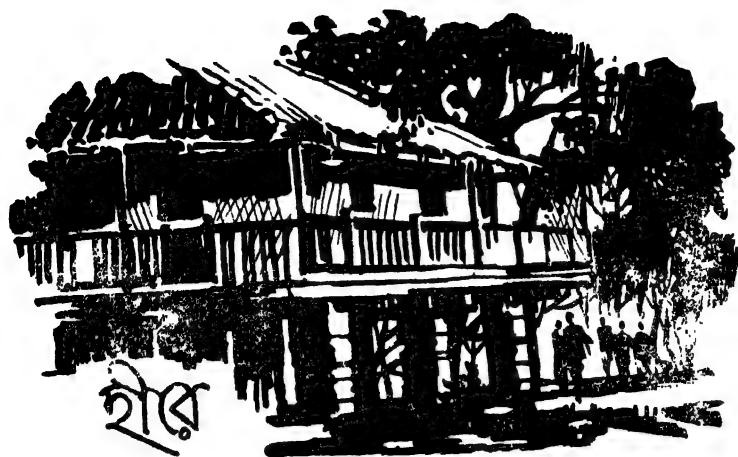
গিয়েছিলাম আমরা পাঁচজনে। গুপি, আমি, গুপির মামা, শ্যামরতনদা আর শ্যামরতনদার ভক্ত চ্যালা অসীমদা। জায়গাটার আসল নাম নানান্ কারণে বলা হল না, ধরে নেওয়া যাক মুরুমা নদীর অববাহিকা মুরুমার জঙ্গল। তবে জঙ্গল বলতে যা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। কোথাও ঘন বন আছে বটে তাও সাধারণ বন নয়, ঘোর ঘেঘো বন, তার মধ্যে বড় বড় ভালুকের পায়ের ছাপের অভাব নেই। যেখানে সেখানে সাদা মৌমাছির তিন হাত বড় বড় মৌচাক গাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে। ওখানকার মধুর ভারি খ্যাতি, এমন কি বনবাসীদের আয়ের যতটা না কাঠ, গাছের আঠা, মহুয়ার ফল থেকে তার চেয়েও বেশী এই মধু বিক্রি করে, এ-কথা আমি শ্যামরতনদার মুখ থেকেই শুনেছি। আশা করি কারো বুঝতে বাকী নেই যে উনিই ছিলেন আমাদের দলের পাণ্ডা! নইলে ওড়িষ্যার এই বন্য অঞ্চলের কতটুকুই বা আমাদের জানা ছিল।

কোথাও এই রকম বন, আবার কোথাও মুরুমা নদীর দুই তীরে উঁচু পাথরের পাড়ি, তাতে থাক থাক নানান্ রঙের বাহার। বন-বাসীদের কয়েকটা গ্রাম ছাড়া এদিকে কোনো লোকালয় নেই। স্রেফ গাছ পালা জন্তু জানোয়ারের রাজ্য। শ্যামরতনদা আর তার

চ্যালাটির কাছে এর চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছু হতে পারে না। জীপ ত ঐ পাথর আর বনের মধ্যে চলতে পারে না। শ্যামরতনদা বললেন, 'তেত্রিশ বছর এইসব জায়গায় খনিজ পদার্থ খোঁজার কাজ করেছি। এর প্রায় প্রতিটি বর্গমিটার আমার চেনা বলে ধারণা ছিল। কিন্তু আজ কাল মনে হয় এইসব ন্যাড়া পাথরের খাঁজে খপ্পরে বহু জায়গা আমার অ-দেখা রয়ে গেছে। তাই বড় বেশি দেরী হয়ে যাবার আগেই এই ট্রিপটার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু জীপ থেকে নেমে অবধি চাঁতুর মুখে কথা নেই কেন? এইসব বুনো জায়গায় যেই আসে, প্রথম প্রথম সেই তো দেখি অনর্গল কথা বলতে থাকে।'

অসীমদা বলল, 'সেই ব্যাপারটা বলুন না।' শ্যামরতনদা বললেন, 'ব্যাপারটা কিছুই নয়, বছর ত্রিশেক আগে একবার এই বনে সন্ধ্যেবেলায় পথ হারিয়েছিলাম। আমি আর আমার আরদালি নোগো। নতুন বনে এসেছি, বন-তথ্য কিছুই জানি না। এদিকে রাত হয়ে আসছে, পাখিরা চুপচাপ হয়ে গেছে, একটা গ্রামবাসীরও দেখা নেই যে বন বিভাগের বাংলোর পথ জেনে নিই। এমন সময় দূর থেকে কারা নিচু গলায় বিড় বিড় করে কথা বলতে বলতে আসছে শুনতে পেলাম। আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নোগো আমাকে প্রাণপণে জাপটে ধরে. একটা ঝোপের পিছনে টেনে নিয়ে ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে চুপ করতে ইসারা করল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম এই বড়ো একটা কালো ভালুক বিড়বিড় করে বকতে বকতে চার পায়ে বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে। দেখতে দেখতে সে আমাদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম!'

ছোটমামা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর বাংলোতে ফিরলেন কি করে? শ্যামরতনদা বললেন, 'সঙ্গে টর্চ ছিল। তারি আলোয় চোখ পড়ল একটা বড় গাছের গুঁড়ির খানিকটা ছাল

আর একটা, দেখতে দেখতে বাংলোতে পৌঁছে গেলাম। খ্যাপা সাহেব ঐভাবে পথের ইঙ্গিত দিয়ে রাখত।'

আমরা তো অবাক। খ্যাপা সাহেব আবার কে? অসীমদা এ-সব গল্প একশবার শুনেছে। সে বলল, 'সে এক খ্যাপা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আগে নাকি কটকের কলেজে ভূ-বিদ্যা শেখাত। তারপর ক্ষেপে গিয়ে বনবাসী হয়েছিল।'

শ্যামরতনদা বললেন, 'হয়েছিল আবার কি? আছে। হয়তো এখনো এই বনেরি কোথাও। গত ত্রিশ বছরে ওকে বহুবার দেখেছি। কোথাও ওর এক গোপন আস্তানা আছে, সেখানে বসে নাকি কৃত্রিম উপায়ে সত্যিকার হীরে তৈরি করার চেষ্টা করে। তবে অনেক দিন কোনো খবর পাইনি, মরে টরে গেছে কি না কে জানে। বয়স তো দেদার হয়েছে এতদিনে।'

এইসব বলতে বলতে আমরা জঙ্গলের ভিতর অনেকখানি পথ পার হয়েছি। সরু পায়ে চলা পথ, নাকি একেবারে বাংলো অবধি গিয়েছে। গোড়ায় হয়তো গাছ কেটে, পাথর ঢেলে, কেউ বানিয়েছিল। এখন আর কেউ ওর দেখাশুনা করে বলে মনে হল না। কোনো কোনো জায়গায় কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়।

অদ্ভুত বনটা। একটা সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধে ভরা। হয় তো মহুয়ার। গাছের তলাটা শুকনো ঝরঝরে, ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শ্যামরতনদা বললেন, 'ঐ এক মজা। বনের মধ্যে নোংরা কিছু বড় একটা চোখে পড়বে না। গোবর টোবর জন্তুরা যত্ন করে মাটি চাপা দেয়। বুনোদের গাঁও তকতকে। যত নোংরা দেখবে যেখানে খানিকটা সভ্যলোকের বাস।'

ঝর ঝর জলের শব্দ। ছোট একটা শাখানদী পাথর কেটে নামছে। এক জায়গায় মুরুমা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সব নদীর নাম-ই মুরুমা। এ অঞ্চলে মুরুমা দেবীর খুব পসার। তাঁর দয়ায়

নাকি স্থানীয় লোকদের কখনো কুমীরে খায় না। নইলে মুরুমা যেখানে মহানদীতে পড়ছে সেখানে কুমীর গিজগিজ করে। তারা অনেক সময় এই নদী ধরেও অনেকদূর চলে আসে। মহানদীতে দলবল সহ শিকারীরা এখনো কুমীর শিকার করতে আসে। তাদের লোকজনকে যদি বা কুমীরে ধরে, গাঁয়ের একটা ছোট ছেলেকে কখনো ধরেছে বলে নাকি শোনা যায় না।

অসীমদা হলেন ছোটমামার কলেজের সহপাঠী। শ্যামরতনদার এদিকে কি কাজ পড়েছিল, অসীমদার কয়েকদিন ছুটি ছিল, তিনিও সঙ্গে ঝুলে পড়েছিলেন। ছোটমামা ছুটিতে না ডিউটিতে ঠিক বুঝলাম না। তিনি সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশান্সে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন, একথা অসীমদাও জানেন না। এমন কি অপিসেরও কম লোক-ই জানে, কারণ ওঁর কাজ গোপনে তদন্ত করা। আমাদের উনিই সঙ্গে এনেছেন, নাকি দক্ষ সহযাত্রীর সঙ্গে বন দেখার এমন সুযোগ আর নাও হতে পারে। দক্ষ সহযাত্রীটি উনি না শ্যামরতনদা তাই নিয়ে কথা উঠতে পারে।

জীপ নদীর তীরে মুরুমা গ্রামে আমাদের নামিয়ে দিয়ে, ভুবনেশ্বরে ফিরে গেছে। আবার চারদিন পরে এসে, ঐখান থেকেই আমাদের তুলে নেবার কথা। আমাদের সঙ্গে মোপা বলে শ্যামরতনদার রাঁধবার লোক ছাড়া আর কেউ নেই। যে-যার নিজেই নিউম্যাটিক প্ল্যাস্টিকের বিছানা আর যৎসামান্য দরকারি জিনিস, নিজের পিঠে হ্যাভারস্যাকে পুরে নিয়ে চলেছি তারই ওজনে ছোটমামার হাঁটু বেঁকে যাচ্ছিল। ছোটবেলায় বেচারি অন্ধকার রাতে কালো বেড়াল দেখে নাকি এমনি ভয় পেয়েছিলেন যে সেই ইস্তক শরীরটা আর স্বাভাবিক হয়নি। মোপার ঘাড়ে হ্যাভারস্যাক চাপাবার তালে আছেন দেখে, গুপিতে আমাতে পালা করে নিজেদের বোঝার উপর সেটা বইছিলাম।

মাঝে মাঝে নদীর ধারে পথ। পাথরের পরত পরত রঙের বাহার

দেখিয়ে শ্যামরতনদা বলছিলেন যে ওড়িষ্যাকে বলে ভারতের সবচেয়ে গরীব রাজ্য, অথচ এর বনজ আর খনিজ জিনিস যেদিন উদ্ধার করা হবে, ওড়িষ্যাই সেদিন হয়ে উঠবে ভারতের সব চেয়ে ধনী রাজ্য। সেই দিনের অপেক্ষায় পারাদীপে বন্দর হচ্ছে, নতুন নতুন খাল ও বাঁধ হচ্ছে।

নদী ছেড়ে আবার বনে ঢুকলাম আমরা। সন্ধ্যার আগেই বন-বিভাগের বাংলোতে পৌঁছলাম। পুরনো আমলের বাড়ি। ছু সারি পাথরের থামের উপর, দোতলার সমান উঁচুতে তৈরি, মাঝারি একটি একতলা বাংলো। তার চারদিক ঘিরে কাঠের বারান্দা। বেশ লাগল। বাড়ির তলাটা বেশ একটা শেডের মতো জায়গা।

কিন্তু ওপরে ওঠা হবে কি করে, সিঁড়ি তো নেই! অসীমদা বললেন, আগে কবজা দেওয়া কাঠের মই ছিল। উপরে তুলে ফেলা যেত। সে সব কবে ভেঙ্গে গেছে, মোপার কাছে হুক লাগানো নাইলনের সিঁড়ি আছে।

বাস্তবিকই তাই। নাইলনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ছোট মামার যথেষ্ট আপত্তি থাকলেও, গুপির কাছে ধমক খেয়ে, শেষ পর্যন্ত একটা ধাপে পা রাখলেন। অমনি ওপর থেকে গুপি তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আর নিচে থেকে আমি তাঁর সরু পশ্চাৎভাগ ঠেলে কোনমতে দোতলায় পৌঁছলাম। শ্যামরতনদারা যেন কিছুতেই লক্ষ্য করলেন না!

সঙ্গে চাবি ছিল। দেখতে দেখতে ঘর খুলে, ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে, অদ্ভুত একটা স্টোভ জ্বেলে, বাংলোর আলমারী থেকে কিছু বাসন বের করে, আমরা বারান্দার উপর একটা গুঁড়ির বেঞ্চিতে বসে চা, রুটি, মাখন, টিনের মাংস ইত্যাদি পেট পুরে খেতে লাগলাম। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে, শ্যামরতনদা একটা শেড লাগানো মোমবাতি জ্বাললেন। অমনি বুঝলাম বারান্দাটা জাল দিয়ে মোড়া কেন!

কোথা থেকে হাজার হাজার অদ্ভুত পোকা উড়ে এসে জালের উপর আছড়ে পড়তে লাগল।

ছোটমামা একেবারে বোবা বনে গিছিলেন, এবার চায়ের মগে একটি চুমুক দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা স্যার, এই দিকেই কোথাও প্যাট মোর্স পার্চ বলে একটা জায়গা আছে না?' শ্যামরতনদা এমনি চমকে গেলেন যে হিমশিম খেয়ে একাকার। অসীমদারও এমনি চমকে গেলেন যে হিমশিম খেয়ে একাকার। অসীমদারও ভারী কৌতূহল। 'প্যাসমোর্স পার্চ? সে আবার কি?' শ্যামরতনদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সে কি চাঁদু, ও নাম তুমি কোথায় শুনলে?'

ছোটমামা ভারি অপ্রস্তুত। গুপি তাঁর কোঁক অন্ধকারে খোঁচা দিয়ে সাবধান করে দিতে গিয়ে, শ্যামরতনদাকেই খোঁচা মেরে বসল। ছোটমামা বললেন, 'কি জানি, কে যেন বলেছিল। সে বিষয়ে জানেন নাকি কিছু?' শ্যামরতনদা বললেন, 'না আমি কিছু জানি না।'

ঠিক সেই সময় একটা আস্তে কাশি শুনে আমরা সকলে চমকে উঠলাম। বারান্দার বাঁকে একটা টিংটিঙে রোগা কালো লোক দাঁড়িয়ে। সে একটু এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল, 'এক্সকিউজ মি। প্যাটমোর্স পার্চ আমার খুব চেনা। এক রকম বলতে গেলে আমি যখন এখানে থাকি না, তখন সেখানে থাকি।'

শ্যামরতনদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি কি করে উপরে উঠে এলে? রান্নাঘরের পেছনে সিঁড়ির দরজায় তো চাবি দেওয়া, ঢুকলে কি করে?'

লোকটা আরেকটু কাছে এসে গাছের গুঁড়ির বেঞ্চিতে এক মাথায় বসে পড়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যেবেলায় একটু না বসলেই নয়। হ্যাঁ কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন —কি করে এলাম, তাই না? যেমন করে রোজ আসি। থাম্বা

বেয়ে, চাবি খুলে।' বলে পকেট থেকে একটা লোহার চাবি বের করে দেখাল। বোঝাই গেল ঘরে তৈরি।

শ্যামরতনদা আরো বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওটা কি করে তৈরি করলে শুনি?' লোকটা হাসল, 'আমরা হীরে তৈরি করি, আর সামান্য একটা চাবি করতে পারব না? আর উপরে ওঠার কথাই যদি বলেন তো যারা নিউইয়র্কের বেয়াল্লিশ তলায় ওঠা নামা করে তাদের কাছে এ আর কি? কিনবেন নাকি দু চারটে হীরে?'

এই বলে পকেট থেকে এক মুঠো সাধারণ পাথর বের করে দিল। শ্যামরতনদা বললেন, 'বোকা পেয়েছ নাকি?' 'তাহলে হীরে তৈরির ফরমূলাটা কিনুন।'

এবার আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম, এই নিশ্চয় সেই খ্যাপা সাহেব। শ্যামরতনদা তাকে চিনলেন বলে মনে হল না। 'তুমি কে, তুমি তো প্রফেসার বোলটন নও। তাঁকে আমি চিনি।' লোকটার কোটরে বসা চোখ, থুতনিতে একটু ছাগল দাড়ি, বয়স চল্লিশ পঁয়-তাল্লিশের বেশি নয়। সে বলল, 'আমি তাঁর ছেলে। অনেক কষ্টে তাঁকে খুজে বের করেছি। কিনবেন ফরমূলাটা? সোর্স অফ লাইট? মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দাম।'

ছোটমামা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আমি কিনব দেখি আগে।' লোকটা পকেট থেকে এক গোছা পুরানো 'পুরু' কাগজ আর ছোট একটা কালো নোট বই বের করে দিল। ছোটমামা নোট বই না খুলে, তার ধারে কি যেন দেখলেন। কাগজটাও খুলে কোনো চিহ্ন দেখে নিয়ে, পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে তাকে দিলেন। লোকটা আলো থেকে সরে যেতেই, শ্যামরতনদা লাফিয়ে উঠলেন, 'ধর, ধর, খ্যাপা সাহেবের নিশ্চয় কোনো অনিষ্ট করেছে।'

আর ধর ধর! লোকটা একটা গিরগিটির মতো স্রেফ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। জালের দরজা হাঁ করে খোলা; বাতাসে একটু একটু

দুলছে, পাশের গাছের ডালপালাতে একটু নড়া-চড়া, তারপর সব চুপচাপ। অসীমদা দরজায় তালা দিল।

আলোর কাছে আবার সবাই ফিরে এলাম। শ্যামরতনদা কিছু না বলে, ছোটমামার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অসীমদা বললেন 'কি দিলে ওগুলো?' 'কেন, ফরমূলার দাম, পাঁচ হাজার টাকা।' গুপি আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। 'সত্যি পাঁচ হাজার টাকা? চালাকি নাকি? কোথায় পেলে?' 'কেন, বড়সাহেবের মক্কেলের কাছ থেকে! ফরমূলা সে-ই কিনবে।'

শ্যামরতনদা বললেন, 'এর বেশি বোধ হয় খুলে বলা বারণ কিন্তু তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর যে ঐ ফরমূলা দিয়ে হীরে তৈরি করা যাবে?' ছোটমামা বললেন, 'তা জানি না। আমি শুধু বড় সাহেবের হুকুম পালছি। তা ছাড়া—'

'কি তাছাড়া?'

'তাছাড়া, হীরে তৈরি করা মক্কেলের ইচ্ছা নয়। হীরে তৈরি বন্ধ করাই তার একমাত্র অভিপ্রায়। যত হীরে তৈরি হবে, হীরের দাম ততই কমবে। মক্কেলের জহরীর মস্ত ব্যবসা। খ্যাপা সাহেব বেশ কিছুদিন আগে কলকাতায় মারা গেছে। মক্কেলের সঙ্গে সে যোগা-যোগ করেছিল। তারই নির্দেশমতো আমার এখানে আসা। নইলে আমাদের নিজেদের আম বাগানেও যেতে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে। আমি ভালোবাসি ফুটপাথ।' এই বলে ছোটমামা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলেই মুচ্ছো গেলেন।

তখন জল রে, বাতাস রে, বিছানা রে। পরদিন সকালে শ্যামরতনদা তাঁর পুরানো দিনের চেনা বনের গ্রামে গিয়ে খ্যাপা সাহেবের আস্তানা সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনে এলেন। তারপর খুঁজে খুঁজে আমরা সেই রহস্যময় প্যাটমোর্স পার্চে গেলাম। একটা ছোট পাথুরে পাহাড়ের মাথায় ঐ পাথর দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি। কাছে না গেলে দেখাই যায় না, পরিবেশের সঙ্গে এমনি বেমালুম মিলিয়ে

আছে। সেখানে দেখলাম খালি গবেষণাগার, ভাঙ্গা আসবাব, নেবার মতো সবই ছেলে সরিয়েছে। তবে একটা জিনিস দেখে ভালো লাগল। একটা পাথরের গায়ে খোদাই করা 'এফ-ই বোলটন, ১৮৯০ —১৯৬৯।' তার পাশে একটা বুগানভিলিয়া গাছ পোঁতা হয়েছে, তাতে ফুল ফুটেছে।

আমরা ওখানে আরো চারদিন ছিলাম। শ্যামরতনদার একটা ছোট খনি দেখার কাজ ছিল।

ছোটমামা একদিনও নিচে নামলেন না। তবে টিনের মাছ মাংস গাঁ থেকে মোপাকে দিয়ে আনানো আলু, শশা, শুকনো পেঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে নানারকম উপাদেয় জিনিস দুবেলা আমাদের রেঁধে খাইয়েছিলেন। তার ফলে আমাদের বাড়িতে এসে রামকানাইদাকে জ্বালাতেন বলে মনে মনে আমার যে রাগ ছিল, সেটা একবারে কেটে গেল।

আমরা সকাল বিকেল বনটাকে একরকম চষে ফেললাম। হরিণ; খরগোস, কাঠবেড়ালি, বড় বড় শিরওয়ালা অজস্র গুবরে পোকা আর কম করে একশো রকম পাখি। বুনো জন্তুর কোনো চিহ্ন দেখলাম না। খালি একবার দেখলাম একই গাছের নীচে এক রাশি ইয়ে পড়ে আছে, সে কোনো ছোট জানোয়ারের হতে পারে না।

বোলটনের ছেলের ফেলে যাওয়া নুড়ি পাথরগুলো অসীমদা পকেটে করে নিয়ে এসেছিল। এমন একটা রোমাঞ্চ-ময় অভিজ্ঞতার একটা চিহ্ন তো থাকা উচিত। কলকাতায় ফেরার দিন কুড়ি পরে ছোট মামা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকেই খাটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন, 'ওগুলো সত্যি হীরে।'

সে আবার কি? সত্যি হীরে বোলটনের ছেলে পেল কোথায়? ছোটমামা বললেন 'বোলটন তার ফরমুলা মতো বানিয়েছিল নিশ্চয়।' গুপি আর আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'ফরমুলাটা? সেটা

কোথায়' 'আমাদের চোখের সামনে মক্কেল সেটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে।'

'কিন্তু কেন ?'

'বললাম না সেদিন, হীরে ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা খেলে। বেশি হীরে হলে তার দাম পড়ে যাবে না ? কাঁচের সমান দাম হয়ে যাবে। জহরীদের সর্বনাশ হবে না ? রামকানাইদা কি রেঁধেছে আজ ?'

নোকো

আগেই বলে রাখি সুখ শান্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। তাই বলি বেড়ে কাটল ঈস্টারের ছুটিটা। গ্র্যাণ্ড কর্ডে নোকো বলে একটা ছোট স্টেশন ; ঠিক স্টেশনও নয়, বরং একটা গুমটি বলা চলে। দরকার হলে সেখানে গাড়ি থামতে পারে। অমনি হুড়মুড় করে নেমে পড়তে হয় ; এক মিনিটের মধ্যেই আবার চলতে শুরু করে। তাই বলে অবিশ্যি সত্যি করে নোকো বলে কোনো গুমটিও নেই। তার অন্য নাম ; বদলে দিলাম। গুড ফ্রাইডের দিন ভোরে সেখানে নামা। গুপি আর আমি। আগের দিন ছোট মামার তার পেয়েছিলাম, 'কম শার্প।' দেখি গুমটিতে ছোটমামা নিজে দাঁড়িয়ে। নাকি সত্যিকার ছুটিতে এসেছেন। গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আমাদের কেন আনিয়েছ বলে ফেল চটপট।' ছোটমামা আকাশ থেকে পড়লেন। 'কেন আনিয়েছি আবার কি? ভাল জায়গায় একটু ছুটি কাটাবি, এটুকু তো আমার কর্তব্য।' তারপর গুপির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'পুকুরে বড় বড় মাছ কিলবিল করছে, বাড়িতে রোজ ভোরে একশো দশটা মুরগিতে ঘুম ভাঙায়। দুধের ক্ষীর, মর্তমান কলা। আর উন-গুরু তো দেবতা বিশেষ, কি তাঁর চেহারা, কি তাঁর কথাবার্তা!'

আমি বললাম, 'উন-গুরু কি?' ছোটমামা অবাক হলেন, 'আরে তাও জানিস্‌না? আমার স্যারের গিন্নির গুরু। অর্থাৎ উন-গুরু, পুরো গুরু নন্‌। চল্‌ না নিজের চোখে দেখবি।'

বাস্তবিকই দেখবার মতো। মাথায় ছয়ফুট উঁচু, চওড়াতেও প্রায় তাই, টকটকে গায়ের রং, গম-গম করে গলার স্বর, চোখে গাড়ির উইণ্ড স্ক্রীনের মতো কালো চশমা। আমাদের দেখে আনন্দ রাখার যেন জায়গা পান না। এখানে বস, ওখানে বস, ওখানে পা রাখ, এটা খাও, ওটা খাও, সাত সতেরো, যেন ওঁর বাপের ঠাকুরদা এসেছি। আমরা কলা, খোয়া ক্ষীরের লুচি, ছানার মুড়কি, চিনা বাদামের তক্তি ইত্যাদি দিয়ে জলখাবার খেয়ে উঠলাম স্নান করতে। কত কি বললেন উন-গুরু, আগে নাকি নদীর পুলিসে চাকরি করতেন। লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা, ঐ করেই জীবন কেটেছে। এখন অবসর নিয়ে ক্ষেত-খামার আর ভগবানের নাম করেন। অঢেল শান্তি উপভোগ করেন। হেসে বললেন, 'গাছপালার মজা কি জানিস্‌, একবার পুঁতে দিলেই শেকড় গজায়। উঃফ্‌, সারাজীবন জলে-ঝড়ে বাঘা পালোয়ানের পেছন পেছন ঘুরে হাঁটুতে গেঁটো বাত ধরে গিয়েছিল রে, তবু ব্যাটাকে ধরতে পারি নি। আমার সব মৎলব, পাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়ে যেত, এমনি চালাক। সে যাক গে।'

বাড়ির পেছনে আম-বাগান, বাঁশঝাড়, কলাগাছ, তার পরেই টলটলে নীল জলে ভরা পুকুর। শিরশির করে বাতাস বইছিল, তিরতির করে ছোট ছোট ঢেউ উঠছিল। তারি মাঝে মাঝে দেখলাম এই বড় রুই কাৎলা ঘাই দিচ্ছে। পুকুরের বাঁধানো ঘাট বেয়ে যেই না জলে নামলাম, পা ঘেঁষে সাঁতরে গেল মাছের পাল। ছোটমামা বললেন নাকি মাঝে মাঝে কামড়ায় টামড়ায় পর্যন্ত। তাই উনি জলেটলে নামেন না।

এই বলে লিকপিকে শরীর নিয়ে দুটো ডন-বৈঠক কষে নিলেন। দুপুরের খাওয়াটাকে তো আর অপমান করা যায় না। বললাম, 'কে রাঁধে? গুরুমা নাকি?' ছোটোমামা হেসেই সারা, 'আরে দূর দূর, ধার্মিক মানুষ, ব্যাচিলার, তাছাড়া মেয়েরা অমন ভাল রাঁধে নাকি? পৃথিবীর সব বড় সেফরা পুরুষমানুষ, তাও জানিস, না? বহুদিন আছে এখানে, উন-গুরুর নিজের হাতে শেখানো। দেখিস খেয়ে। নাম পসলা।'

বাস্তবিক তাই। বুঝলাম ছুটিটা কাটবে ভালো। গুপিকে বললামও তাই। গুপি নাক সিঁটকে বলল, 'কোথাও নিশ্চয় প্যাঁচ আছে রে ছোটমামা এমনি এমনি ডেকে এনেছে বিশ্বাস হয় না।' যা বলেছিস ঠিক তাই। সবে ভাবছি ছিপ নিয়ে একটু বেরুব, এমন সময় ডাক এল। উন-গুরু বললেন, একটা চোখ বাঘা নিয়েছিল, একটাকে নিয়েছে বয়সে। আবছা দেখি, খবরের কাগজ পড়তে পারিনে। পড়ে শোনা দিকি বাপ, পালা করে দুজনে।' একটু বিরক্ত হয়ে মোড়ায় বসে পড়ে বললাম, 'কোন জায়গাটা পড়ব? এইখানটা? সুন্দরবনে বিখ্যাত বিজন বাউলের মৃত্যু?' 'আহা সব পড়বি, সব পড়বি, প্রথম পাতার প্রথম লাইন থেকে শেষ পাতার শেষ লাইন অবধি।—কি যেন বললি, ইস? বিজন-বাউলের মৃত্যু? বলিস কি রে! তা হলে তো—' এই বলে উনগুরুদেব এতক্ষণ চুপ করে রইলেন যে শেষটা না বলে পারলাম

না, 'কি হল ? বলুন না বিজনবাউলের কথা।' পানু বলল, 'আর বাঘা পালোয়ানের কথা।' চমকে উঠলেন বুড়ো, 'ঐ ঐ, একই। বাউলের গল্পে আর বাঘার গল্পে কোনো তফাৎ নেই। এক দিক দিয়ে বলতে পারিস সেটা আমারো গল্প। যা মাছ ধরগে যা, কাগজ পড়তে হবে না।' এদিকে আমরা তো কিছুতেই যেতে চাই না, 'না, না বলতেই হবে। সমস্ত কাগজটা পড়ে শোনাচ্ছি। রোজ শোনাব।' গুরুদেব অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'বলব কি করে ? এই ভর দুপুরে সে সব কথা বলা যায় কখনো ? দেখছিস, না, নাম করতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে !'

চেয়ে দেখি বাস্তবিকই তাই। 'তাহলে কখন বলবেন ?' গাওয়া ঘি দিয়ে রান্না প্যালারামের সেই রুই মাছের মইলুর সবচেয়ে বড় দেখে পাঁচ টুকরো খেয়ে হয়তো মেজাজটা তাঁর ভালোই ছিল। বললেন, 'আজ রাতে খাবার আগে। এখন পালা দিকি নি। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে দেখছি।' ফ্যাসাদটা আমরা না আর কিছু সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

ও-রকম বাড়ি আমি জন্মে দেখি নি। লম্বা একটানা, নিচু টালির চাল, তার উপরে খড় বিছানো, খাসা দেখতে। চারদিক ঘিরে চওড়া বারান্দা, তাতে আরাম কেদারা পাতা। ছাদ থেকে জালের ঝুড়িতে পাতা বাহারের গাছ ঝুলছে। উঁচু টিলার ওপর বাড়ি, চারদিকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। টিলার গায়ে তরকারি আর ফল-ফুলের গাছ ; নীচে আমবাগান, পুকুর ; গোয়াল ; মুরগির ঘর। আছেন বেশ। সারাদিন আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম আর ছোটোমামা টেনে ঘুম লাগালেন। সাড়ে চারটের সময় প্যালা একটা শিঙ্গা বাজিয়ে আমাদের ডাক দিল। কি বলব, ঐ নির্জন জায়গাতে শিঙ্গার শব্দ শুনে গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। গুরুদেবের জমির চৌহদ্দি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে মাইলের পর মাইল ঘন বন। শাল, পলাশ, মহুয়া, সীতাহার, দেবদারু। বনের বুক চিরে

একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে। সেখান থেকে শিঙার প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।
উনগুরুর বাড়িতে বিজলী নেই, হ্যাজাক জ্বলে। বারান্দার চারদিকে শক্ত জালে মোড়া, সেইখানে গরমের সময়ে সবাই শোয়। খাট্টাসে কামড়াবে, কি হুণ্ডারে টেনে নিয়ে যাবে, তার জো নেই। তাছাড়া জাল না থাকলে হ্যাজাক জ্বালবামাত্র কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ (ডানাওয়ালা ছোট বড়) পোকা উড়ে এসে ঝাঁক বেঁধে থাকত।

সন্ধ্যেটা দেখলাম অদ্ভুত। যেই না সূর্য ডোবা অমনি সব নিঃঝুম। টিলার নিচে কাজের লোকদের থাকবার ঘর থেকে বাসন পত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, মিটমিট করে আলো জ্বলছিল। তার বাইরে বনটা অন্ধকারে মোড়া। বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছিল, পোকা এসে টুক টাক্ জালের গায়ে আছড়ে পড়ছিল। প্যালার মুরগি রাঁধার গন্ধ চারিদিকে ভুর ভুর করছিল। প্যাস্টো কুকুরটার নাক ডাকছিল আমরা উনগুরুর দুপাশে দুজন মোড়ায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ছোট মামা কিছু দূরে ঈজি চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। অন্ধকারের দিকে তাকালে ওর নিশ্বাসের কষ্ট হয়। ছোটবেলায় একবার ওর নাকের মধ্যে একটা গিরগিটির বাচ্চা ঢুকতে চেষ্টা করে ছিল কি না।

গুরুদেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হাঁরে কি চাস্ তোরা বল দিকি নি, যদি দুটো করে টাকা দিই—' আমরা বললাম, 'বাঘা বাউলের বিষয়।' উনগুরুর সোজা হয়ে উঠে বসে নিজের বুকে কীল মেরে বললেন, 'এই যে দেখছিস যে চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, বাঘার কাছে এও কিছু নয়।' গুপি বলল, 'আর বাউলে ?' উনগুরু হা—হা করে হেসে উঠলেন। 'পাঁচ ফুট উঁচু রোগা পটকা, হাতে মাদুলীর গোছা, গাঁদালের ঝোল ছাড়া অন্য কিছু হজম করতে পারত না। অথচ ওরই ভয়ে বাঘা ঠকঠক করে কাঁপত। সুন্দরবনের বিজন বাউলে, তার ভয়ে বাঘে

গরুতে এক ঘাটে জল খেত। অথচ একটা মশা মারতেও তার গুণীণের বারণ ছিল সেও মরে গেল! আশ্চর্য।'

রান্নাঘর থেকে ঠিক এই সময় প্যালা বেরিয়ে কিছু বোধহয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। সে-ও সড়াৎ করে গল্প শোনার লোভে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। একটু ভাবনা যে হল না তাও নয় কি জানি শেষটা মুরগি ফুরগি যদি পুড়ে—যাকগে সেই অন্ধকারের মধ্যে কালো চশমার ভেতর দিয়ে উনগুরু আমাদের মুখগুলো একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'উঃফ, সে এক সময় গেছিল। একদিকে বাঘা আর এক দিকে বাউলে। কিন্তু বাউলের সঙ্গে বাঘার কোনো ঝগড়া ছিল না। সুন্দরবনে যারা এক সংগে খেটে খায় তাদের মধ্যে অ-বনিবনা হয় না।

আমার হল অদ্ভুত এক অবস্থা। নদীর পুলিসের চাকরি, বাঘাকে ধরার হুকুম। এতটুকুন্ন আমাদের আস্তানায় পৌঁছলেই ছোঁক ছোঁক করে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু বাঘার পাত্তা পায় না কেউ। অথচ ঐ সুন্দরবনেই তার খোদ আস্তানা। তার দলের লোকেরা নাকি বাঘ সেজে, গায়ে মুখে বাঘের এসেন্স মেখে নির্ভয়ে বাঘের মধ্যে ঘুরে বেড়াত! বাঘরাও তাদের আলাদা করে চিনতে পারত না। কম চেষ্টা করিনি আমরা, অথচ এত তথ্য জেনেও কেউ বাঘাকে ধরতে পারে নি। চারদিকে সব গাঁকে ঠাণ্ডা করে রেখেছিল। যারা তাকে হপ্তায় হপ্তায় মাথা পিছু একটাকা করে দিত, তাদের সে কিছু বলত না। না দিলে লুটপাট করে সব কেড়ে নিত, ঘর জ্বালিয়ে দিত, পাকা ধান কেটে নিয়ে যেত। সে সময়ে ঐসব পথে নৌকো করে যেতে হলে সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা নিতে হত অথচ কেউ তাকে একবার চোখে দেখে নি যে অতর্কিতে ধরে ফেলবে। অনেকে বলত সে নাকি ভালোমানুষ সেজে গাঁয়েই বাস করত।'

গুপি বলল, 'আপনিও ধরতে পারলেন না? ছোটমামা বলে

আপনিও বাঘ-গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। আপনার দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে কেউ নাকি দাঁড়াতে পারত না।'

উনগুরু কাষ্ঠ হাসলেন। 'একবার আমার নির্দেশে আমাদের দল বন্দুক নিয়ে বিজন বাউলের বারণ না মেনে গাছের উপর লুকিয়ে ছিল। গাছ তলায় বাঘের থাবার দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ঐ নির্জন জায়গায়ই ওদের আড্ডা। গভীর রাতে কম করে পঁচিশটা বাঘ এসে জুটল। কেউ শুল কেউ বসল। আমাদের লোকেরা এরি জন্য অপেক্ষা করেছিল। যেই না ইসারা করা, অমনি সবাই ঝুপঝাপ করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুমদাম ফটফট বন্দুকের শব্দ। আর যায় কোথা। বুক কাঁপা হালুমহুলুম হ ম ম ম ম হা মমম! বুক কেন মাটিও কাঁপতে লাগল। কারণ ওগুলো সত্যি বাঘ ছিল! কিন্তু এমনি চমকে গেছল যে বড় একটা কিছু করে উঠতে পারে নি। বরং কে কোন দিকে পালাবে তাই ঠিক করতে পারছিল না।' আমি বললাম, 'চোখটা বুঝি তখনি বাঘে খুবলে নিয়েছিল?'

গুরুদেব হাসলেন, 'আরে ছ্যা ছ্যা বাঘের অত কাছে যাব, আমি তেমন মক্কেল-ই নই। চমকে গাছ থেকে পড়লাম একটা কাঁটা-ঝোপের ওপর। তাইতেই চোখটা গেল। হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, বাঘাকে চিনত শুধু এক বিজন বাউলে।'

'তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল না কেন?'

'হল না মানে? কিন্তু বাউলেরা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ওদিকে আমার সঙ্গে বেজায় দহরম মহরম ছিল তার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম কি না।'

'কি রকম, কি রকম?'

'মানে মাছচুরির মামলায় পড়েছিল। আমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কেউ খুঁজে পায়নি। খাসা রাঁধত ব্যাটা।' হাঁ করে চেয়ে রইলাম আমরা, ছোটমামা সুদ্ধ উঠে বসে পড়লেন। উনগুরু বললেন,

'আশ্চর্য সব ক্ষমতা ছিল বিজন বাউলের। বাঘ বশ করত। শুধু বাঘার বাঘ নয়, সত্যি বাঘরাও তার কথায় উঠত বসত। আর বাঘার দলের গুরু, পরামর্শদাতা, কোবরেজ, একধারে, ওই ছিল সব কিছু। তাদের সে কখনো ধরিয়ে দিতে পারে? তবে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য কৃতজ্ঞতাও কম ছিল না। দুটো মাদুলী দিয়েছিল আমাকে। একটা বাঘতাড়া কবচ। যার হাতে বাঁধা থাকবে, বাঘে-তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। অন্যটা বাঘডাকা কবচ।' শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাতের অমন ভালো খাওয়াটা তেমন জমল না। আমাদের মাথায় গল্পটাই ঘুরছিল। গুপি জানতে চাইল, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত বাঘা ধরাই পড়ল না?' 'কে ধরবে ওকে? ধরলেও তো বাঘা বলে চিনতে পারবে না'—প্যালা মাংস পরিবেশন করছিল। সে হঠাৎ বলল, 'কেন চিনবে না? তার নাইয়ের দু পাশে দুটো বাঘের মুখ উল্কি করা ছিল, ভগ্নীপোতের কাছে ছোটবেলায় শুনে-ছিলাম।' গুরুদেব বললেন, 'প্যালা, তুই থাম। তোদের গাঁয়ের লোকেরা যত রাজ্যের বাজে কথা বলে। নইলে সে ধরা পড়ল না কেন? আমিও পেনসন নিলাম আর বাঘার উপদ্রবও বন্ধ হল। যেন সে তার-ই জন্য অপেক্ষা করে ছিল। বছর খানেক খোঁজাখুঁজির পর বাঘার ফাইল বন্ধ হল। সবাই বলল ব্যাটা নিশ্চয় মরে গেছে—আচ্ছা একটা বুনো বুনো গন্ধ পাচ্ছ না তোমরা?'

তাই শুনে যে যার খাওয়া চুকিয়ে উঠে পড়ে ঘরে দোর দিল। সারাদিন যা ধকল গিয়েছিল। শোয়া আর ঘুম। কিন্তু ঘুম আর হল না।. শেষ রাতে সে কি চ্যাঁচামেচি। ছোটমামা উঠে দেখেন বারান্দার দোর হাট করে খোলা। প্যালা নিরুদ্দেশ।

সবাই বললাম, 'মাইনে কেটে দিন ব্যাটাকে তাড়িয়ে।'

উনগুরু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'ওরে, ও যে বড় ভালো রাঁধে, ওকে হাতছাড়া করলে চলবে না। এই নে ধর আমার মাদুলীটা। চলে

যা সুন্দরবনে, ওকে ফিরিয়ে আন। কোন বাঘ তোদের কাছে আসবে না। আমার নিজের পরখ করা।'

গুপি বলল, 'কিন্তু—কিন্তু—' গুরুদেব তেড়ে উঠলেন, 'কিন্তু আবার কিসের? দুপুরে কে রাঁধবে শুনি? ও গেছে বাঘার ধনরত্নের খোঁজে। গাঁয়ের লোকের ধারণা বাঘা সব বনের মধ্যে পুঁতে রেখে বাঘ পাহারা বসিয়েছে। বাউলে মরেছে, সেই সব জানত। হয়তো ছেলেকে বলে গেছে! ছেলে হলো প্যালার ভগ্নীপোত। প্যালা নিশ্চয় গেছে ভাগ বসাতে। যা, যা, দেরি করিস কেন? চিংড়ি গুলো যে সাতটার সময় দিয়ে যাবে।'

ছোটমামা লাফিয়ে উঠে বুক চাপড়ে বললেন, 'চল, গুপি পানু, ব্যাটাকে ধরে আনি। দিন মাদুলী স্যার'

বেশি দূর যেতে হয়নি। টিলার নিচেই বন। বনে সবে মাত্র পা দিয়েছি, অমনি সে কি ক্যাঁও-ম্যাঁও চিৎকার। দেখি পড়ি-মরি করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে প্যালা। তার পেছন পেছন আসছে দলে দলে ভাম, বোঁজ, উদ্ বেড়াল, বন-বেড়াল খটাস মায় কাঠবেড়াল পর্যন্ত। প্যালার বুক হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। ছোটমামা এক পা এগুতেই অবাক কাণ্ড। জন্তুগুলো পিছু ফিরে নিমেষের মধ্যে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যালার কথা বলার শক্তি ছিল না। হাঁটবার-ও না। তাকে চ্যাং দোলা করে গুপি আর আমি টিলা বেয়ে উপরে উঠে, গুরুদেবের সামনে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

গুরুদেব অবাক হয়ে ওর হাতে বাঁধা মাদুলীটার দিকে চেয়ে বললেন 'ও কি রে, বাঘডাকা মাদুলী বেঁধেছিস যে বড়? তোকে বাঘে ধরে নি এই রক্ষে।'

ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'এ তল্লাটে বাঘ নেই বোধ হয়। তবে আরেকটু হলেই ভামে আর কাঠবেড়ালীতে ধরেছিল।' গুরুদেব

বললেন, 'ভেজাল-নস্যির ফল বোধ হয়।' প্যালা হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, 'আমি ভেবেছি ঐটেই বুঝি রক্ষাকবচ। কাল স্নানে যখন পড়ে গেছিল, দুটিকে বদলে রেখেছিলাম। কিন্তু কি করে কি হল বুঝতে পারছি না। চিংড়ি মাছ ফিরে গেছে ?।

উনগুরু বললেন, 'এবার বুঝলাম রোজ কেন ছায়া ছায়া দেখি, বুনো গন্ধ পাই। আমিও সেদিন মাদুলি দুটো পালিস করে, ভুল মাদুলি বেঁধেছিলাম। চিংড়ি এসে গেছে।' এই বলে গুরুদেব থুক করে হাসতে লাগলেন। কালো চশমাটা কি করে জানি খসে পড়ে গেল। দেখলাম দুটো চোখ-ই ভালো।

ছোটমামা বললেন, 'স্যার অনুমতি করেন তো একবার সুন্দরবনে যাই। কপিল মুনির আশ্রমটাও দেখে আসি, বাঘার ধনরত্নেরও খোঁজ করি।'

উনগুরু বললেন, 'ওখানে কিছু রাখে নি বাঘা। জমিজমাতে ইনভেস্ট করেছে।' এই বলে অন্যমনস্ক ভাবে পেট চুলকোতে লাগলেন স্পষ্ট দেখলাম নাইয়ের দু পাশে দুটো বাঘের মুখ উল্কি করা। আমার চোখে চোখ পড়াতে গুরুদেব একটু মুচকি হেসে বললেন, 'দুটো ফ্রি স্কুল চালাই, নিজে পড়তে শিখি নি। খবরের কাগজ পড়াতে হয় একে ওকে দিয়ে। তারা বিরক্ত হয়।' আমরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'না, না, কেউ বিরক্ত হয় না। মানে রাতে যদি গল্প বলা হয়। চিংড়ির কি মালাইকারি হবে ?'

বললাম না বেড়ে কেটেছে ছুটিটা।

সেবার পুজোয় কোথাও যাওয়া হবে না, এইরকম ঠিক ছিল। মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায়, বলা নেই কওয়া নেই পানুদের বাড়িতে আমার ছোটমামা উদয় হলেন। ছোটমামা তখনো বর্ধমানের সমাদ্দার ইনভেস্টিশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন; অদৃশ্য কর্মী অবিশ্যি, নাম ছিল না, তবে মাইনে একটু বেড়েছিল, তাই মাঝে মাঝে সহৃদয় সহযোগী বলে পানুকে আমাকে এটা ওটা খাওয়াতেন। বিশেষতঃ যখন ঠেকায় পড়তেন।

বড় মাস্টারমশাই তিমি শিকারের লোম-হর্ষণ এক গল্প বলছিলেন। ছোটমামা পানুর হাতে এক ঠোঙা গরম পেঁয়াজী গুঁজে দিয়ে ধপ করে ওর খাটে বসে পড়ে, নিজের মাথার চুল এক মুঠো ছিঁড়ে ফেললেন। তাই দেখে বড় মাস্টার গল্প বন্ধ করে ওর দিকে ফিরে বললেন, 'সামন্তর কাছে চাকরি পাবার মাদুলী, কি শনি ঘুচোবার মাদুলী পাবে হয়তো। ছুটিতে নাকি?'

ছোটমামা কাষ্ঠ হাসলেন। বড় মাস্টার বললেন, 'আর যদি গোপন তদন্ত হয়তো আমার নতুন মটর-সাইকেলে যাওয়া যায়। নতুন মানে খুবই পুরানো, নইলে চারজনকে ধরবে কেন?' আমরা দুজনে কান খাড়া করে উঠে বসলাম।

ছোটমামা বড় মাস্টারের জুতোয় আগায় কপাল ঠেকিয়ে, আমাকে বললেন, 'আহা-হা! তাই বলে সবগুলো খেয়ে ফেলিস্ না।' ব্যাপার যথেষ্ট ঘোরাল। সমাদ্দারের মাথায় জলপটি দেওয়া হচ্ছে, থেকে থেকে হেঁচকি উঠছে।' পানু মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে বোধ হয় আর বেশি দেরি নেই। সুবিধা পেলেই একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলে পার। বিনু তালুকদার সেটুকু আশা করবে।' এখানে বলে রাখা উচিত যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে এক নাগাড়ে দু বছর কাজ করে সার্টিফিকেট পেলে তবে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বিনু তাল্কদার ছোটমামাকে চান্স দেবে।

বড় মাস্টার বললেন, 'হেঁচকি কেন?' ছোটমামা একটু শিউরে উঠে বললেন 'ভূত দেখেছেন, হেঁচকি উঠবে না? আমাকে তদন্তে যেতে হবে। বড় মাস্টার ওঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আমাকে না আমাদের। আমাদের চারজনকে যেতে হবে। গুপি, পানু, দুদিনের খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করিস্! শুকনো জিনিস, লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, মাংসের বড়া, কড়া পাকের সন্দেশ, জিবে গজা—আচ্ছা ব্যাপারটা কি তাতো বললে না চাঁদু—যথেষ্ট কোকাকোলা নিস্‌রে।'

একটু সুস্থ হয়ে, ছোট মামা যা বললেন তার সারমর্ম হল এই।

অপিসে কাজকর্ম এ সময়ে কমই থাকে। এ বছর আরো খারাপ, তিনদিন কোনো মক্কেল আসেনি। সেন আর চৌধুরী ছুটিতে। ঘাঁটি আগলাচ্ছেন সমাদ্দার সাহেব আর ছোটমামা। কেউ না থাকলে দ্বিতীয় টিকটিকির নিজেকে প্রকাশ করতে দোষ নেই। হঠাৎ যদি মক্কেল এসেও পড়ে, ওঁকে স্বচ্ছন্দে আরেকজন মক্কেল বলে চালানো যায়। তার চেয়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়, যদি সন্দেহ জনক আইনভঙ্গকারী বলা হয়। ঐ মিনমিনে ভালো মানুষের মতো চেহারার সঙ্গেই চকচকে চোখ যে কোনো সত্যিকার গুপ্ত গোয়েন্দার থাকতে পারে, এমন কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না।

সে যাই হোক, দুদিন ধরে দোতলার জানলা দিয়ে দেখা গেল

একটা ষণ্ডা কালো লোক, মাথায় অস্বাভাবিক ঝাঁকড়া চুল, পরচুলাও হতে পারে, চোখে কালো চশমা, বারে বারে বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে আর আড় চোখে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশনের জানলার দিকে তাকাচ্ছে। তারপর একদিন টিফিন খেয়ে ফেরার সময় সমাদ্দার তাকে হাতেনাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। ব্যাটা চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করছিল।

ছোটমামা টেবিল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে, ফুচকার ঠোঙা লুকিয়ে ফেললেন। লোকটা বলল, 'ইয়ে কিছু মনে করবেন না, স্যার, সামনে আসবার ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না। পাড়া গাঁ থেকে আসছি কি না, নাম নেপেন হোড়, গ্রাম পদমপুর, জেলা বর্ধমান। একটু সঙ্গে না গেলে, গ্রামে ঘুঘু চরবে, এখনি দলে দলে লোক পালাতে শুরু করছে।'

স্যার বললেন, 'কেন পালাচ্ছে?'

'ইয়ে, দেড়শো বছরের বড় ইঁদারাটাতে আগুন লেগে গেছে কিনা, সে কিছুতেই নেবানো যাচ্ছে না, পুকুর থেকে জল তুলে ঢেলে ঢেলে কাদা বেরিয়ে পড়ল, স্যার, তবু আগুন সমানে জ্বলছে। লোকে বলছে অপ-দেবতা ভর করেছে। গাঁ উজোড় হয়ে গেল স্যার, এক রকম বলতে গেলে আমাদেরি গ্রাম, আমার পূর্বপুরুষরাই ওখানকার জমিদার ছিলেন কিনা, প্রাণ থাকতে'—এই অবধি বলে হাঁউমাউ করে কেঁদে লোকটা স্যারের পা জড়িয়ে ধরল।

স্যার বললেন, 'কিসে করে নিয়ে যাবেন?' 'কেন স্যার, ঠাকুরদার পুরনো বন্ধুত্ব মটরের কারখানা থেকে একটা গাড়ি ধার করে আনব স্যার। আমি চালাবো।'

স্যার বললেন, 'যান, নিয়ে আসুন। আমি তৈরী হচ্ছি।'

লোকটা চলে গেলে ছোটমামা বললেন, 'সত্যি যাবেন, স্যার?' সমাদ্দার সাহেব হাসলেন, 'হাতের লক্ষ্মী কখনো পায়ে ঠেলো না হে। ঐ ইঁদারার নীচে নিশ্চয় পেট্রলের খনি আছে। তাই থেকে তেল

চুঁয়ে জলে মিশেছে। তাতে কেউ বিড়ি ফেলেছে, ব্যস অগ্নিকাণ্ড! যে নতুন তেলের খনির সন্ধান দিতে পারবে, সরকার তাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে থাকেন। চটপট প্রস্তুত হও, দুজনে যাই, হাজার হোক অচেনা জায়গা। পকেটে একটা শিশি নিতে ভুলো না।

তারপর ছোটমামা বাকি পেঁয়াজিগুলো সব খেয়ে ফেলে বললেন, 'রামকানাই আজকাল কিছু বানায় টানায় না?' রামকানাই এক থালা আলুর বড়া নামিয়ে রেখে বলল, 'বানাতেই হয়।'

ছোটমামা বলতে লাগলেন। 'যেমন লোক, তেমনি গাড়ি। রং চটা, লড়ঝড়ে, এখানে ওখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। বলল, 'ওখানেই জলযোগটা হবে, কি বলেন স্যার? স্থানীয় বাক-তুলসী চালের চিঁড়ে দিয়ে, কপি মটরশুঁটির পোলাও আর মাছের বড়া আর এক বোগনে মোষের দুধের পায়স। তার জন্যেই কত লোকে পদমপুরে গিয়ে পড়ে থাকত।' এই বলে এমনি জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল যে নিজের দাড়ি গোঁফ উড়তে লাগল। বলেছিলাম কি, লোকটার একমুখ দাড়ি-গোঁপ, তা সে সত্যি হোক কি নকল হক?'

'জলখাবার দেবে যখন তখন আর আমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে? স্যার বললেন, সঙ্গেই থাকছ যখন, ঘড়ি জামিন রাখতে হবে না। পরে বিল করব।'

'গাড়িও তেমনি, গুবরে পোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলল। এক সময়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে বাঁ হাতের সড়ক ধরল। স্যারের সঙ্গে নেপেন দেখলাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। বলল, 'এ-সব খুব পুরনো পথ, স্যার, শেরসার আমোলের। কেমন সব আম কাঁঠালের বাগান দেখেছেন। আড়াইশো বছরের, তিনশো বছরের পুরনো। সের শা এর ফল খেয়েছে। কেউ অত বড় পুকুর কাটে আজকাল? জল প্রায় নেই, কিন্তু নীরেট পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট লক্ষ্য করলেন? মাছ কিলবিল করছে। শেরশার মাছের বংশধর। এই সব পথ

দিয়েই নবাব প্রতিবছর একবার হাতি চেপে দিল্লী যেতেন বাদশাহকে নজরানা দেবার জন্য। সঙ্গে থাকত সাত আটশো লোক, পাইক, সেপাই, বরকন্দাজ, ফরাশ, হুঁকো-বরদার, খিদমদ্‌গার, রসুইকার, বাজনদার উজির-নাজির লোক-লস্কর। রাতে যখন তাঁবু পড়ত মনে হত নতুন একটা শহর পত্তন হল। ততক্ষণে আরেক দল অনুচর আরো কুড়ি মাইল এগিয়ে, পরের রাতের তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে লেগেছে। সব জায়গা জমি ঠিক করা থাকত, প্রতি বছর একই জায়গায় তাঁবু হত।

এদিকে গাড়িটা খুব ভালো চলছিল না! ভেতর থেকে কেমন একটা ছক্‌ছক্ শব্দ হচ্ছিল। বেলাও পড়ে আসছিল, সূর্য ডুবতে খুব বেশি দেরী ছিল না। স্যার একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওহে আর কত দূর? দিন যে শেষ হল।' নেপেন হেসে বলল, 'তাতে কি স্যার? হাতে কাজকর্ম নেই, সে খবর কি আর নিই নি? রাত কাটাবার খাসা বন্দোবস্ত আছে। আর খুব বেশি দূরও নয়। এ জায়গাটার নাম বড় খারাপ বুঝলেন। দেখছেন না পথে একটা লোক নেই। সন্ধ্যের পর কেউ আসে না এদিকে। ঐ যাঃ, গাড়ি যে থেমেই গেল।'

শুনে আমার তো হাত পা ঠাণ্ডা! নেপেন বনেট খুলে দেশলাই জ্বেলে কি ঠুকঠাক করতে লাগল। তারপর বনেট বন্ধ করে, চট্ করে একবার হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে, দেশলাই নিবিয়ে বলল, 'তাই তো, কি করা যায়?' বললাম, 'পেট্রোল আছে তো?' নেপেন কোত্থেকে একটা লম্বা কাঠি বের করে পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিল। 'এই রে! যা বলেছেন ঠিক তাই! পেট্রল তো নেই! এখন কি করা!' কি করার জন্য আর অপেক্ষা করতে হল না, হঠাৎ আম বাগানের পেছনটা মশালের আলোয় আলো হয়ে গেল। রে-রে-র করে একদল দস্যু আমাদের তিনজনকে পাছ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল—কি, হাসছিস্ যে বড়?"

পানু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না-মানে ইয়ে—তারপর কি হল?' ছোটমামা বললেন, 'বোধ হয় মুচ্ছো গেলাম। জ্ঞান হল সেরশার তাঁবুতে।'

'এঁ্যা! বল কি!' বড় মাষ্টার সুদ্ধ লাফিয়ে উঠলেন। ছোট মামা বললেন, 'যেমন যেমন ঘটেছিল বলে যাচ্ছি। হাতির ডাক, ঘোড়ার খুরের শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনানি, নাচের বাজনা, সব কানে আসছিল। নেপেন ঠিকই বলেছিল, সের শাহের দিল্লী যাত্রা ছিল এক এলাহি ব্যাপার।

চোখ চেয়ে দেখি স্যার আর আমি বাঁধা অবস্থায় সেরশার পায়ের কাছে গালচের ওপর শুয়ে আছি। আর সেরশা অনুচরদের ধমকাচ্ছেন, 'এত রোগা দিয়ে কি করে চলবে? আর পেলি না নাকি? এখন কি করে কি হয় বল দিকি? প্রধান অনুচর বলল,

'খাইয়ে দাইয়ে একটু চাঙ্গা করে দিলে হয় না?'

সের শা হতাশার সুরে বলল, 'তা ছাড়া তো উপায় দেখি না। দেখ. চেষ্টা করে, তবে সময় খুব কম, জানই তো ভোরের সঙ্গে হাওয়া হতে হবে।'

এই অবধি শুনে বোধ হয় আবার মুচ্ছো গেছিলাম। বাকিটা কেমন আবছা মনে পড়ে, টানা হ্যাঁচড়া, মারামারি, হাতি ঘোড়া, শেকল কয়েদ। জ্ঞান হল গভীর রাতে, স্যার এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে, অন্য হাতে আমাকে ঝাঁকাচ্ছেন। দেখি চারদিকে আলো নেবানো, যার যেখানে গালচের উপর পড়ে ঘুমোচ্ছে। স্যার নিঃশব্দে আমাকে টেনে তাঁবুর বাইরে আনলেন। তারপর টেনে দৌড়।

ছুটতে ছুটতে যখন আর দম পাচ্ছি না, তখন দেখি আবার। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছি। সামনেই ট্রাক ড্রাইভারদের লঙ্গর খানায় মিটমিট আলো জ্বলছে। টলতে টলতে কোনো মতে সেখানে গিয়ে উঠলাম। স্যারের পকেটের মনিব্যাগ কেউ ছোঁয় নি—অশরীরীরা

মনিব্যাগ দিয়ে করবেই বা কি—দুজনে বড় বড় মগে করে গরম চা আর মোটা মোটা হাতের রুটির সঙ্গে ডিমের অমলেট খেয়ে, বর্ধমান গামী ট্রাকে করে ফিরে এলাম।'

একটু চুপ করে থেকে ছোটমামা বললেন, 'সেই ইস্তক স্যার খাটে শুয়ে হেঁচকি তুলছেন। আমাকে রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে সামন্তর কাছে ভূতের মাদুলী আছে বললি না ?'

বড় মাস্টার বললেন, 'সারা জীবন এই রকম একটা কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে আছি। আর সব তো করেছি, সমুদ্রের ওপরে, তলায় ডাঙ্গায় বা শূন্যে কি না দেখেছি। সব করেছি বাদে, অশরীরী অনুসন্ধান। ওঠ হে তৈরি হও। কাল সকালেই যাওয়া। চাঁদু, জায়গাটা চিনিয়ে দিতে হবে।'

শুনে ছোট মামা বেশ ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। তবু স্যারকে তো আর হেঁচকি তুলে অক্কা পেতে দেওয়া যায় না। গেলাম চারজনে পরদিন সকালে। বাড়িতে বলা হল পিকনিকে যাচ্ছি। পরদিন ফিরব। যথেষ্ট খাবার দাবার নেওয়া হল। দেড় ডজন কোকাকোলা। বড় মাস্টার এক ঠোঙা চানাচুর আনলেন। ছোট মামা এক প্যাকেট লজেঞ্জস।

ট্রাক ড্রাইভারদের লঙ্গরখানা ছোটমামা চিনতে পারলেনা, সেখান থেকে ডান দিকে সরু পথ বেরিয়ে গেছে! লঙ্গর খানার লোকেরা কুয়োতে আগুন ধরার কথা শোনে নি, তবে বড় বড় অতি প্রাচীন আম কাঁঠালের বাগানের কথা জানে। 'কোনবাগান খুঁজছেন ?'

বড় মাস্টার বললেন, 'কোনো একটা ল্যাণ্ডমার্ক মনে করতে পার না চাঁদু ?' হঠাৎ ছোটমামা খুশি হয়ে বললেন, 'দুটো প্রকাণ্ড পুকুরের মাঝখানে ভাঙ্গা মন্দির।' তারা বলল, 'ও হো! ঐ ডান হাতের পথ দিয়ে মাইল চারেক এগিয়ে যান, পেয়ে যাবেন।'

গোরু খোঁজা করলাম জায়গাটাকে। দুপুর হয়ে গেল, খাবার

জন্য একটা ভালো জায়গাও পাওয়া গেল। তুটো পুকুরের মাঝখানে ভাঙ্গা মন্দির। ছোটমামা চ্যাঁচাতে লাগলেন!

'এই তো' এই তো সেই জায়গা, এইখানে গাড়ি বন্ধ হয়েছিল। আর ঐ—ঐ যে আমবাগান, চল চল।' ছোট মামার দিনের বেলায় বেজায় সাহস।

বড় মাস্টার বললেন, 'না খেয়ে কোথাও যাব না। দিব্যি লুচিটুচি খাওয়া গেল।

তারপর কোকাকোলা দিয়ে কুলকুচি করে, বড় মাস্টার পথের মাটি পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। হয় তো বর্মার শিক্ষা, যদিও সে সব সত্যি নয়। হঠাৎ ছোটমামা আবার চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ইউরেকা। মাটিতে অনেকটা তেলের দাগ।' বড় মাস্টার বললেন, 'ব্যাটা ইচ্ছে করে কোনো উপায়ে তেল বের করে দিয়েছিল। কোন দিক দিয়ে নিয়ে গেছল? ছোটমামা আম বাগানে ঢুকলেন। আম বাগান পেরিয়েই খোলা মাঠ। সেখানে সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে ট্রাকে বোঝাই করা হয়েছে। সারি সারি জন্তু জানোয়ার, ভ্যান-ভরা লোকজন। দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস পনের দিন খেলা দেখিয়ে বর্ধমান যাচ্ছে।

আমরা চারদিক ঘুরেফিরে বুঝলাম পদমপুর বলে কোন গ্রাম নেই ও অঞ্চলে। বর্ধমানে ছোটমামার ছোট ফ্ল্যাটে কাটালাম। বড় মাস্টারের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পর-ই সমাদ্দার সাহেবের হেঁচকি সেরে গেল। রাতে ক্যালকাটা ক্যান্টিনে গিয়ে পোলাও কালিয়া খাওয়া হল। পরদিন ফেরা। ছোটমামা বিনু তালুকদারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

আসলে তখনো ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝি নি। কালিপুজোর কয়েকদিন পরে ছোটমামা এসে বললেন, 'ফিল্ম্ দেখবি নাকি? বিনু তালুকদার পাস দিয়েছে। অ্যামেচার কোম্পানি, প্রাইভেট শো, নাকি খুব ইন্টারেস্টিং। কি একটা প্রতিযোগিতা হয়েছে এক

মাসের মধ্যে কত কম খরচে কত ভালো ছবি তোলা যায়। এরা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।'

সে আর বলতে। বাবা মা পর্যন্ত দেখতে গেলেন। সানা ফিল্ম তার নাম 'কাল,' প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, বিনি পয়সায় দিয়েছেন। মোঘল শিবিরে কি করে যেন সময় কালের গণ্ডগোল হওয়াতে, কেমন করে ভুলক্রমে দুজন আধুনিক গোয়েন্দা বন্দী হয়েছিল ও স্রেফ বুদ্ধি বলে শেষ অবধি পালিয়েছিল, এই নিয়ে। নাকি সামান্য খরচে সার্কাসের তাঁবুতে তোলা, তাদের খেলা আরম্ভ হবার আগের দিন। অভিনেতারা জেনে, কিম্বা না জেনে, মিনি মাগনা অভিনয় করেছেন। মোট খরচ সাতশো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। ডায়ালগ অ্যামেচাররা পরে জুড়েছেন।

দেখলাম গাঁট্টা গোঁট্টা ঝাঁকড়া চুল ইয়া দাড়ি গোঁফ সেরশা মশনদে বসে আছেন, ঝাড়লণ্ঠন, সেজবাতি, তলোয়ার ঝোলানো লোক লস্কর। এমন সময় কতকগুলো বিকট চেহারার পাষণ্ড, প্যাটার্নের লোক সমাদ্দারকে আর ছোটমামাকে বেঁধেছেদে চ্যাংদোলা করে, তার সামনে এনে ফেলল। ছোটমামা মহা উত্তেজিত, 'তাই খটকা লাগছিল। সেরশার হাতে এইচ এম টির সোনার ঘড়ি কেন? ঐ ব্যাটাই নেপেন?' আমরা তো হাঁ! দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন ছোট মামা। 'এবার সব জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল। ঐ নেপেন হতভাগার কাজ। নিজে সেজেছে সেরশা, এখন সস্তায় টিকটিকি চাই, তা পরে আন দুটো জলজ্যান্ত বিনি পয়সার টিকটিকি! বাঃ, বেড়ে ব্যবস্থা তো! ধরি না একবার লক্ষীছাড়াকে—'

হলও সে সুযোগ। সবার শেষে বিজয়ী চিত্রকে সুবর্ণ পদক ও নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হল। সে কি হাত তালি। হঠাৎ দেখি ঝড়ের মতো মুখ করে ছোটমামা স্টেজের দিকে চলেছেন। দুই হাতে ঘুষি পাকানো! আমার তো চক্ষু স্থির। এক্ষুনি ছোট-মামাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে! পানুকে ইসারা করে সবে এগুতে যাব,

এমন সময় ছোটমামারওপর নেপেনের চোখ পড়ল। অমনি পুরস্কার হাতে ছুটে এসে ছোটমামার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আর ছোটমামা 'আহা, ছি, ওকি, ওকি।' বলে তাকে টেনে তুলে কোলাকুলি করলেন। নরমে গরমে টিকটিকি হয়।

খুব খাওয়াল নেপেন আমাদের চারজনকে। মন্দ না লোকটা।

ভজুর কথা সব সময় বিশ্বাস করা না গেলেও, ও যখন চোখ দুটোকে তীরের ফলার মতো ছুঁচলো করে এনে বলল, 'সোনা বানায়' গুপির তখন গা শিউরে উঠল। তবু গুপি জোর গলায় আপত্তি করেছিল, 'কি যা তা বলিস্, ভজু। সোনা তো দুষ্টু লোকরা নৌকা করে বিদেশ থেকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে নিয়ে আসে। অনেক দূর থেকে নীল আলো দেখিয়ে আঘাটায় নোঙর ফেলে। তখন ওদের স্যাঙাৎ শাকরেদরা ডুব সাঁতার দিয়ে গিয়ে সেই সোনা তুলে আনে। প্রাণ হাতে করে যেতে হয় কচ্ছপের চৌবাচ্চায় রাখতে হয়', ভজু বাধা দিয়ে বলল, 'কচ্ছপের চৌবাচ্চায় রাখে না আরো কিছু। পাশের বাড়ির বুড়ো সোনা বানায়, এই আমি তোমাকে বলে দিলাম গুপিদাদা। ইচ্ছা না হয়, বিশ্বাস কর না।' বলে ভজু র‍্যাশন আনতে চলে গেল।

কিছু সোনা পেলে গুপির বড় সুবিধা হত। তাছাড়া বানানো যাবে না-ই বা কেন? অমরেশদা বিজ্ঞানের ক্লাসে তো সকলের সামনেই দেখিয়ে দিলেন দু'ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে জল তৈরি করা যায়। ঐরকম দু তিনটে কিছু

মিশিয়ে সোনাই বা হবে না কেন? মাটির তলায় তো আপনা থেকেই হয়, কেউ কিছু আকাশ থেকে ফেলে দেয় না।

পাশের বাড়িটা সত্যি একটু অদ্ভুত। অষ্ট প্রহর আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধ করা থাকে। গেটে তালা দেওয়া থাকে। থামে একটা কাঠের ফলকে শুধু লেখা 'র-দত্ত'। ও আবার কি রকম নাম হল? সন্ধ্যেবেলা কথাটা আরেকবার পাড়ল গুপি। ভজু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল 'আশ্চর্য কিছুই নয়। ওনার পেছনে পুলিস আছে, তাই নাম পালটেছে। বড় মুদী বলছিল মরা মানুষ জ্যান্ত করে টাকা করে, ঐ বাড়িটা বেনিয়েছে। বাইরে থেকে বন্ধ দেখা যাচ্ছে, ভিতর দিকটা কিন্তু খোলা, মধ্যিখানে বাগিচা আছে। সেইখেনেই মরা মানুষ জ্যান্ত করার গাছ আছে। আর ঘরের মধ্যে থাকে সাজানো থরে থরে বাক্স ভরতি সোনা আছে।'

গুপি বলল, 'তুই এত কথা জানলি কি করে? বড় মুদী বলেছে?'

ভজু কাষ্ঠ হাসল 'চিল কোঠার ছাদ থেকে দেখা যায়।'

বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল গুপির। রং-মিস্ত্রীদের ফেলে যাওয়া বাঁশটা বেয়ে চলে কোঠার ছাদে ওঠা কিছু শক্ত নয়। ন্যাড়া ছাদ পড়ে যাবার ভয় আছে। ঐ বাঁশটাকে ফেলেই হয়তো র-দত্তর বাড়ির চিলকোঠার ছাদে ওঠা যায়। ভেবেও মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে খাবার সময় ঠামু বুড়ো জজ হিদায়েৎ আলির ঠাকুরদাদার ধনরত্ন পাওয়ার গল্প আবার বললেন। ওঁরা নাকি খেতে পেতেন না, এত গরীব। পিতৃপুরুষদের ভাঙা দালানে থাকতেন। উঠোনের মাটি কোপাতে গিয়ে কোদালে কি ঠং করে বাজল। একটা তামার ফলক। তাতে কি সব অঙ্ক কষা। হিদায়েৎ-আলির ঠাকুরদাদার এগারো বছর বয়স তখন। বেজায় অঙ্কের মাথা। ঐ অঙ্ক কষে বললেন ভাঙা দালানের ছাদের ছু নম্বর কাঠের বরগার মধ্যেখানটা দেখতে হবে। অমনি নড়বড়ে মই লাগিয়ে বরগার মধ্যিখানে কোপ

দেওয়া হল। খানিকটা জায়গা ভেঙে বেরিয়ে এল আর সঙ্গে সঙ্গে মণি মুক্তো ঝরে পড়তে লাগল। তারপর থেকে ওঁরা বড়লোক হয়ে গেলেন। ওঁদের বাড়িতে কত কুকুর বেড়াল ছাড়া অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, ঘরে ঢোকে, খাটে ওঠে, কেউ কিছু বলে না। বড় পিসির ছেলে দেখে এসেছে।

কিন্তু ধন রত্নই বা পাচ্ছে কোথায় গুপি? আলাদা একটা ছোট বাড়ি যে কিনবে তাই বা পারছে কি করে? এ বাড়িতে কুকুর বেড়াল আনতে দেবে না কেউ। ঐ ঠামুই দেবে না। নাকি বেজায় নোংরা, গা-চাটে, গা-চাটলে অসুখ করে এই সব বলে ওরা। অথচ অনিলবাবুদের তেত্রিশটা বেড়ালের প্রত্যেকটা কতবার গুপিকে চেটেছে, কই, তাতে কি গুপির অসুখ করেছে? নাকি ঠামুরই রোজ বাতের ব্যথা, অম্বল, হাঁপধরা!

ভাবলেও গুপির রাগ ধরে। এদিকে কাসুন্দে আর কিছুতেই মোড়ার তলায় থাকতে চাইছে না। খালি নখ দিয়ে, হাঁচড়-পাঁচড় করছে, মুখ বাঁধা বলে আওয়াজ করতে পারছে না, চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা ছুটছে।

কি ভালো কাসুন্দে! ওকে কখনো তাড়িয়ে দেওয়া যায়? বড় পার্কের বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়া! অবাক হয়ে গেছিল গুপি প্রথম পুরস্কার পেয়ে। বাড়িতে ওর ছবি আঁকা দেখে সবাই হাসে, মনে মনে রাগ করে, বকাবকি করে, বলে ছবি এঁকে কে কবে বড়লোক হয় শুনি? কিন্তু হয় বড়লোক, কার বিষয়ে একটা ফিল্ম দেখেছিল গুপি, সে লোকটা খুব বড়লোক হয়ে গেছিল।

শান্তিনিকেতনের কাছে পদমবাবুদের পুরনো কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে, কুয়োর দেয়ালের ইঁট খসে গেছিল, তার পিছন থেকে এক ঘড়া মোহর বেরিয়েছিলে। ডাকাতদের ভয়ে ওঁদের পূর্বপুরুষরা লুকিয়ে রেখেছিল। তা সে রকম ঘড়া গুপি কোথায় পাচ্ছে। একে তো এই তো এই বাড়িটা দাদু বানিয়েছিল, তায় কুয়ো নেই, টিপকল আছে।

চিল কোঠায় মোড়ার গলায় মুখ-বাঁধা কাসুন্দে গলার মধ্যে থেকে এমনি রেগে গ-র-র-র গ-র--র-র শব্দ করছিল যে এই তিনতলার উপর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। মুখ-বাঁধাটা গিলে ফেললেই তো হয়ে গেল!

ভজু এই সময়ে অনঙ্গবাবুদের গুদামে নাইট-স্কুলে যায়। ছাদে কেউ ছিল না শুধু বাঁশটা ছিল। কাসুন্দের গরগরানিতে ছাদ কাঁপছিল। গুপি বাঁশ বেয়ে ছোট ছাদে উঠে র-দত্তর বাড়ির ভিতরটা দেখতে পেল। মধ্যিখানে বাগান, চার দিকে বারান্দা, ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে ভিতরে থাকে থাকে থরে থরে বাক্স সাজানো। ঐ তবে সোনার বাক্স।

আরো কিছু দেখতে পেল গুপি। দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঘরের বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা বুড়ো র-দত্ত. সামনে বন্দুক উঁচিয়ে একটা মুখে কালো মুখোশ-পরা লোক। আর দুটো লোক তাক থেকে বাক্স খুলে সব থলিতে ভরছে। তাদেরো কালো মুখোশ, চোখের কাছে গোল ছ্যাঁদা। একজনের বাঁ হাত বাঁকা। গুপি তাকে চিনতে পারল। এইরে সব সোনা নিয়ে পালাবে ওরা।

র-দত্ত কি যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন, বন্দুকধারী তাঁর মুখে ময়লা রুমাল ঠুসে দিল। হঠাৎ আঁক আঁক আঁক করতে করতে থলি ফেলে লোকগুলো দৌড় দিল। চেয়ারে বাঁধা র-দত্ত বসে রইলেন। সামনের থলি থেকে একটা কালো ফণা উঁচু হয়ে উঠল। গুপি অমনি বাঁশটা তুলে, একটা মাথা ওদের ছাদে ফেলে হাঁচড় পাঁচড় করে-ঝুলে' ওদের ছাদে পৌঁছে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে, র-দত্তের সামনের দরজাটা দুম করে বন্ধ করে দিল।

ততক্ষণে ভজুও বাঁশ বেয়ে এসে হাজির। র-দত্তকে ছাড়া হল, চ্যাঁচামেচি হল, ভজুই বেশি চ্যাঁচাল। র-দত্ত ওদের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তোমাদের মতো সাহসী ছেলে থাকতে দেশের ভবিষ্যৎ

উজ্জ্বল। তবে ওগুলোর বিষ বের করে দেওয়া হয়েছে, কামড়ালেও কিছু হত না।'

গুপি তো অবাক! র-দত্ত হেসে বললেন, 'পাড়ার লোকে বলে আমি নাকি সোনা বানাই। তাই মাস্তানরা এসেছিলেন। আসলে ওষুধ বানাই, সাপের বিষের ওষুধে মানুষের প্রাণ বাঁচে! তাই বা সোনার চাইতে কম কি?' গুপি হতাশভাবে ভজুর দিকে চাইল! ভজু বলল, 'কাসুন্দে মোড়া উলটে ভেগেছে, নখ দিয়ে মুখ বাঁধা খুলে, রান্নাঘরের সব মাছ খেয়ে গেছে। আমি আগেই জানতাম!'

গুপির কান্না পাচ্ছিল র দত্ত ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'ঐ অনিলের মায়ের কারসাজি বুঝি? বেড়াল বিদায় করতে না পেরে, সব প্রাইজ দিয়েছেন শুনেছি। তা কাসুন্দে কোনটা?'

'সবার বড়টা, কি বড় বড় নখ, কি সুন্দর ফ্যাঁশ শব্দ করে!'

'ধাড়ি বেড়াল কি বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকে? গেছে ফিরে ওদের বাড়িতে। তুমি বেড়াল কুকুর ভালোবাস বুঝি?'

ভজু তখন সব কথা বলল। গুপি অত কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি। সটাং অনিলজ্যাঠাদের বাড়ি গিয়ে দেখে এল প্রাইজের তেত্রিশটা বেড়ালের মধ্যে কুড়িটাই ফিরে এসেছে। অনিল জ্যাঠার কি রাগ! বললেন বেড়ালগুলোকে নাকি বিদেশে রপ্তানি করবেন, ঘরে দু পয়সা আসবে, বিদেশের লোকেরাও দুদিন ভালো মন্দ কিছু খাবে। শুনে গুপির গায়ের লোম খাড়া।

ওদের মধ্যে কাসুন্দেও ছিল। কুচকুচে কালো গা, সরু বাঁকা সবুজ চোখ। গুপিকে দেখে আঠারো কুড়িটা বড় বড় নখ বের করে বলল, 'গিঁয়াও-ফ্যাঁশ্-শ্!' মনের দুঃখে গুপি বাড়ি চলে এল।

বাড়িতে হৈ-চৈ। র-দত্তর বাড়িতে লোকজন পুলিস ইত্যাদি গিজগিজ করছে। বাঁকা হাত চেনা লোকটা ধরা পড়েছিল, পালাতে গিয়ে খোলা ম্যান্-হোলে ঠ্যাং ঢুকে কেটেকুটে একাকার!

তার পর নাকি ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ ওর হাতঘড়ি চুরি করেছে বলে মহা কঁ্যাও-ম্যাও করছিল। গুপি ঘরে গিয়ে শুল।

আরো অনেক পরে, সবাই চলে গেলে বাবা গুপিকে ডাকলেন, 'ঐ ত্থাখ, দত্ত সাহেব তোর জন্য কি এনেছেন। ওটার ভালো করে যত্ন করতে হবে কিন্তু, বেয়ার অ্যানিমেল।'

বসবার ঘরে দত্ত সাহেবের কোলে একটা বাঘ ছানা না বন বেড়াল না কি যেন, সোনালী চোখ খুলে গুপির দিকে পিট পিট করতে লাগল। ছাই রঙের গা, তাতে চিতাবাঘের মতো দাগ কাটা। র-দত্ত বললেন, 'ইয়ে এর নাম শিবু, নিরামিষ খায়, চ্যাঁচামেচি করে না, যেখানে সেখানে যায় না, কামড়ায় না, ওর চাইতে আর বড়ও হবে না, খালি মাঝে মাঝে গাছেটাছে চড়তে দিও। এই নাও ধর; কাল এসো একবার সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরি দেখে যেও। ওগুলোকে আবার বাক্সে বন্ধ করা হয়েছে। আবার বিষ গজাবে। আচ্ছা চলি।'

মখমলের মতো নরম শিবুর গা, চোখের মধ্যে কে যেন আলো জ্বেলে রেখেছে, কর্কশ একটা জিব দিয়ে গুপির গাল চেটে কানে কানে বলল, 'হিঁহলুম্‌ম্‌!' কেউ কিছু বলল না। সবাই হাসল।

———

চোরের ম্যাওভাত

গুপির ছোটমামা যদি বর্ধমানের সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দু বছর টিকে থেকে কাজ শেখেন, তাহলে দিল্লীর গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের বিনু তালুকদার ওঁকে চাকরি দেবেন। এই আশাতেই ছোটমামা সমাদ্দারের আপিস কামড়ে পড়ে আছেন। নইলে নাকি বিদেশের নানান জায়গা থেকে ওঁকে সাধাসাধি করে। আর কি সব জায়গা! ব্রেজিল, কিনিয়া, সলেমন দ্বীপপুঞ্জ। কোথাও প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের সোনার খনির ব্যাপার, কোথাও সিংহের বাচ্চার চোরা কারবার, কোথাও গোটা সমুদ্রগামী জাহাজ নিখোঁজ!

দুঃখের বিষয় তালুকদারের ঐ এক কথা; সমাদ্দারের আপিসে দু বছর দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় টিকটিকি মানেই গুপ্ত গোয়েন্দা। তাও আবার এমনি গুপ্ত যে আপিসের অন্য লোকেরাও প্রায় কেউই ওঁর অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত জানে না। জানলেই শত্রুপক্ষের কানে পৌঁছুতে কতক্ষণ? এমনিতে সাড়ে পাঁচ ফুট মাথায়, ৩২ ইঞ্চি ছাতির ছোটমামা অচেনা লোকের ধমক খেলে যাঁর দাঁত কপাটি লেগে যায়, তাকে দুঁদে ডিটেকটিভ বলে কে সন্দেহ করবে? অথচ একটার পর একটা গোপন তদন্তের কাজ সাফল্যের সঙ্গে ছোটমামা অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে গেলেন। ওঁর সঙ্গে অবিশ্যি গুপিকে, আমাকে থাকতে হয়, কারণ ছোটবেলায়

একবার অন্ধকার রাতে বাদুড়ের ভেংচি খেয়ে অবধি ছোটমামার স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে। এক-বলকা দুধ, হাফ বয়ল ডিম আর কড-লিবার অয়েল খেয়েও সে আর সারে নি। তাছাড়া যখন তখন ছোটমামার হাতে পায়ে খিল আর একটুকু রাতের হাওয়া লাগলেই হাঁপানিতে ধরে। ওঁর সঙ্গে না থেকেই বা করি কি? জানলে সমাদ্দার হয়তো রেগে চতুর্ভুজ হবেন, ব্যস্ হয়ে গেল চাকরি! এমন কি আমাদের বাড়ির লোকরাও শুধু এইটুকুই জানে যে আমরা ছোটমামার সঙ্গে ছুটি ছাটাতে ঘুরি আর মাঝেমাঝে রোমাঞ্চময় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি। আসল ব্যাপার জানেন আমার বাড়ির বড় মাস্টার মশাই আর হয়তো বাবা সন্দেহ করেন।

কিন্তু বিনু তালুকদার বাবাকে গোয়েন্দা বিভাগে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলে লোভ দেখিয়ে রেখেছিলেন, কাজেই তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করেন না। আর বড় মাস্টার নিজের অভিজ্ঞতার গাঁজাখুরি গল্প ছড়িয়ে মশগুল থাকেন। তবু আমাদের খুবই সাহায্যও করেন, এটা মানতেই হবে। চোরের স্যাঙাতের রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা এই থেকেই আমাদের সম্ভব হয়েছিল।

পুজোর ছুটিতে একদিন সকালে ছোটমামা হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। এসেই ব্যাগ থেকে রঙচঙে কাগজ মোড়া, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা মোড়ক আমার হাতে গুজে দিলেন। ঠিক যেন জন্মদিনে উপকার দিচ্ছেন। আমি তো আহ্লাদে আটখানা।

ছোটমামা বললেন, 'রামকানাই হয়তো আজ কচ্ছপের মাংস কিনতে বাজারে যাবে। সেই সঙ্গে গুপিকে একবার খবর দিলেই সে এসে হাজির হবে। আমার পায়ের গুলিতে খিল ধরেছে।" এই বলে জুতো খুলে আমার খাটে পা গুটিয়ে বসলেন।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলে এলাম, 'ছোটমামার বোধহয় কচ্ছপের মাংসের দো-পেঁয়াজী খাবার ইচ্ছা। রামকামাইদাকে দিয়ে

গুপিকে ডাকতে বলেছেন।' মা বললেন, 'কচ্ছপের মাংস আমি আনাচ্ছি। আবার গুপিকে ডাকা কেন?' বললাম, 'অন্য কাজে।'

ফিরে এসে মোড়কটা খুলতে যাব, ছোটমামা হুঁ-হাঁ করে উঠলেন। 'পরের জিনিস যখন ইচ্ছে ঘাঁটিস, এ তো তোর বড্ড বদভ্যেস দেখতে পাচ্ছি।' বলে আমার সুজনি টেনে গায়ে গিয়ে আমার নরম্ বালিশটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘাড়ের তলায় গুঁজে শুয়ে পড়লেন।

ভারি রাগ হল বললাম, 'পরের জিনিস কি করে বুঝব? ভাবলাম আমার পুজোর প্রেজেন্ট।' ছোটমামা হাসলেন, 'ওরে তাই মনে করানোই আমার উদ্দেশ্য। সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্স কখনো কাঁচা কাজ করে না হে। ওর মধ্যে বড় সাংঘাতিক জটিল তথ্য রয়েছে। দুই মাসের গোপন তদন্তের ফল। জানাজানি হলে আর আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় এখানে পৌঁছুতে হত না।' এই বলে পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। আমি বিরক্ত হয়ে 'মাটির নিচে সাতদিনে, পড়তে লাগলাম।

গুপি এসেই মোড়কটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে, একতাড়া কাগজ নিয়ে পড়তে বসল। একপাতা পড়েই তার চক্ষু ছানাবড়া।

'ই-ই-স! দেখেছিস বেটাচ্ছেলে হঠকারিতা! ছেলেধরার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। শেষটা কোনদিন ওকেই না ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যায়!' আমি বললাম, 'দুৎ, তা কেন? আমাদের দুজনকে ধরে নিয়ে যাবে বল, সর-জমিনে তদন্ত করতে হলেই তো ওঁর কান কট-কট করবে!' এই বলে দুজনে মিলে ফিক্-করে খানিকটা হেসে নিলাম। তাই শুনে বোধ হয় ছোটমামার কাঁচা ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকবে, রেগেমেগে উঠে বসে বললেন, 'ফের গোলমাল কচ্ছিস! একশোবার বলেছি না'—গুপি বলল, 'পানু, চল, বেণীবাবুদের পুকুরে এই বড় বড় রুই নাকি ঘাই দিচ্ছে।'

ছোটমামা অমনি গলে জল। 'আরে না, না। আমি কি

তাই বলেছি? শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, মাথায় যন্ত্রণা, দুই মাসের অমানুষিক খাটুনির পর—' আমি বললাম, 'এই না বললে পায়ের গুলিতে খিল ধরেছে?" ধরেছে রে ধরেছে, তাও ধরেছে, তার উপর রাত্রের হাওয়া লেগে হাঁপানি! এখন তোরা একটু হাত না লাগালে কোথায় দাঁড়াব তাই বল!

গুপি আর আমি এর ওর মুখের দিকে তাকালাম। ছোটমামা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আট মাসে আশীটা একমাত্র ছেলে নিখোঁজ আর তোদের কিনা হাসি পাচ্ছে!' গুপির চোখ চকচক করে উঠল। 'আশীটা একমাত্র ছেলে? তাদের বাবারা নিশ্চয় বড়লোক? অশিক্ষিত হাতে লেখা বেনামা চিঠিও পৌঁছেছে নিশ্চয়, খবরের কাগজে মুড়িয়া পুরনো পাঁচ টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা, অমাবস্যার রাতে, কোনো নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে রাখিয়া দিবেন। নচেৎ—'

ছোটমামা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ঠিক তাই, ঠিক তাই। তুই জানলি কি করে? ও সব তো আমার ফাইলে লেখা নেই! আমাকে মুখস্থ করে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলে, ছাইটুকু ড্রেনের জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে!'

গুপি বলল, 'তা আমাদের কি করতে হবে? তুমি শুধু আমাদের মুখ দেখবার জন্য ছুটি নাও নি নিশ্চয়?'

ছোটমামা কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। 'ছুটি কাকে বলে ভুলে গেছি। তা ছাড়া ছুটি উপভোগ করবার জন্য নিশ্চয়, মিঃ সমাদ্দার আমাকে খরচ-খরচা বাবদ দৈনিক দশ টাকা হিসাবে দশ দিনের একশো টাকা আর তেল খরচা বাবদ আরেক শো আগাম দেন নি, এটা তো জানিস?'

গুপি বড় মোড়াটা টেনে বলল, 'কিসের তেল?' ছোটমামা কোনো উত্তর দিলেন না। গুপি বলল, 'তা আমাদের কি করতে হবে? কিডন্যাপ হতে হবে নাকি?' শুনে বেজায় হাসলাম।

ছোটমামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ঠিক তাই। একজন বড় লোকের ছেলে সেজে কিড্ন্যাপ হবি। আরেকজন লুকিয়ে তাকে ফলো করে গোপন ষড়যন্ত্র ভিতর থেকে ফাঁসিয়ে দিবি। কি এমন শক্ত কাজ, তোরাই বল ?'

আমি বললাম, 'শক্ত না তো তুমি নিজে আশীজনের একজনকে ফলো করে গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস কর নি কেন ?' ছোটমামা কিছু না বলে জুতোতে পা গলিয়ে রঙচঙে মোড়কটাকে আবার লাল ফিতে দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গুপি ফিতে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে নিচে ফেলে দিল। ছোটমামা উঠে দাঁড়ালেন। আমি অমনি তাঁর কোমর জড়িয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। উনিও টপ করে খাটের উপর পড়ে গেলেন। গুপি বলল, 'এই দুই মাস তদন্তের ফলাফল বল। গোড়া থেকে শুরু কর।'

ছোটমামা বললেন, 'স্যার বলেছেন, এমন জটিল কেস তিনি কখনো ঘাঁটেন নি। সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল আশীটা ছেলে চুরি গেল, অথচ কেউ থানায় খবর দেন নি।' গুপি বলল' 'স্রেফ ভয়ে।' ছোটমামা বললেন, 'তদন্তে বেরিয়েছে সব কটা বাপ টাকার কুমীর, ওদিকে কিপ্পনের জাসু। একটা পয়সা খরচ করতে চায় না।' আমি বললাম, 'তা বল না, এদিকে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্স কিছু বিনি পয়সায় তদন্ত করছে না।'

ছোটমামা হাসলেন 'বাগরা করেছে না আরো কিছু! গিন্নিরা নাকি কেঁদে পড়েছেন, টিকটিকি লাগালে নাকি তাঁদের বাছাদের আর দেখতে হবে না। বরং টাকা দিয়ে দেয়া হক। দিয়েও দিয়েছে বেশির ভাগ লোক। কিন্তু এখনো ছেলে ফিরে পায়নি। ভয়ে সব মাম্!'

গুপি বলল, তাহলে কে সমাদ্দারকে লাগাল ?'

'আশী নম্বরের পিসেমশাই। ব্যাটা নাকি তাঁর বিয়ের সময়ে পাওয়া ট্যাকঘড়ি নিজেই নিখোঁজ! হাউমাউ করে আমাদের

আপিসে এসে ভদ্রলোক হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন। ফলে আমার ঘাড়ে তদন্ত পড়ল। স্যার বলেছেন—গোপন তদন্ত তুমি ছাড়া আবার কে করবে? কেউ জানবে না। আমাদের খাতায় পর্যন্ত তোমার নাম নেই। তদন্ত করতে গিয়ে ধর যদি নেহাৎ নিখোঁজ-ই হয়ে যাও, আমাদের সঙ্গে কেউ তোমাকে জড়াবে না।'

বললাম, 'কেন স্যার, আপনাদের ইনকম ট্যাক্সের খাতায় আমার মাইনেটা তো দেখাতে হয়। বললেন, ওহো, তাও জাননা বুঝি, প্রতি মাসে তোমার সাড়ে তিনশো টাকার পাশে লেখা হয় ইনসিডেণ্টেল এক্সপেন্সেস্। কাজেই ইনসিডেণ্টেল যদি এক্সপেণ্ডেড হয়েও যাও, কেউ টের পাবে না।' এই বলে দু হাতে মুখ ঢেকে ছোটমামা শিউরে উঠতে লাগলেন।

গুপি তাঁর কোঁকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'কি প্ল্যান করেছ বল?'

'আশী নম্বর কিপ্টের বাড়িতে চিঠি আসতেই ছ্যাট্ পিসেমশাই আমাদের খবর দিয়েছেন। কাল অমাবস্যা, রাত দশটায়, গঙ্গার ধারের বাগান-ওয়ালা রাস্তাটা জনশূন্য হয়ে গেলে পর, ঝাঁকরা বট গাছের কোটরে খবরের কাগজে মুড়ে—। বাকিটা তো জানিস্ই। তোরা একজন ঐ সময় বড়লোকের ছোট ছেলে সেজে ওদিকে ঘোরা ফেরা করবি। টাকা নিতে এসে যেই দেখবে হীরে বসানো বোতাম, সোনার হাতঘড়ি, গলায় সোনার চেন, তাকে কি আর ওরা ছেড়ে দেবে এমনি এমনি? ব্যস্, তখন আর কি? একজনকে ধরলেই অন্যজন পেছনে পেছনে গিয়ে গোপন ঘাঁটি বের করে ফেলবে। এটা কি খুব শক্ত ব্যাপার বলতে চাস?' সে যাই হোক, এর-ই ফলে অন্ধকার রাতে গুপি আর আমি আলাদা ভাবে গঙ্গার ধারে গেলাম। কিন্তু কোথায় কে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন আর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না, তখন বসবার জায়গার সন্ধান করতে লাগলাম। ছিলও প্রচুর জায়গা, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেগুলো বড় বেশি ঘুপসিপানা দেখতে। চারদিকে

ঝোপঝাপ, লতার শুঁড় ঝুলছে, লাল ফুলওয়ালা কাঁটা-ঝোপ আর সব চেয়ে খারাপ হল যে এই বড় ঝুরি-ওয়ালা একটা বট-গাছ দিয়ে ওপরকার রাস্তা থেকে বেঞ্চিগুলো আড়াল করা। ঐখানে কেউ বসে থাকলে রাস্তা থেকে একটুকু মালুম দেবে না।

এর দুটো অসুবিধা। আমাকেও যেমন কেউ দেখতে পাব না, আমিও তেমনি কাকেও দেখতে পাব না। হটাৎ যদি কেউ পা টিপে টিপে এসে—দুৎ, এ-সব কি যা-তা ভাবছি। আমি তো ইচ্ছে করেই আর শুধু ইচ্ছা করে কেন, দস্তুরমতো ব্যবস্থা করেই, এই ভর সন্ধ্যায় একলা এসে এখানে অপেক্ষা করে আছি কখন দুষ্কৃতকারীরা এসে আমাকে ধরবে, এই আশায়। এই আশায়। বসলাম গিয়ে গাছতলায়, একটা ঢেউ খেলানো সবুজ বেঞ্চিতে। এখানে বসলে সবাই আমাকে দেখতে পাবে, আমিও সবাইকে দেখতে পাব। উঃফ।

গুপি কোথায় কে জানে। তার কাজ আমার উপর চোখ রাখা। আমাকে ওরা ধরলে, উদ্ধার করার জন্য নয়। শুধু পাছু নেওয়া। কোথায় নিয়ে যায় দেখা। হাঁটিয়ে নিলে, ও-ও হাঁটবে। নৌকায় নিলে, ও-ও নৌকো নেবে। গাড়ি চড়ালে, উপরে বড় রাস্তায় ছোটমামার ফ্রেণ্ড তরফদারের গাড়ি অপেক্ষা করছে, তাতে করে পেছন পেছন যাবে। স্বয়ং তরফদার ড্রাইভার সেজে হয়তো এতক্ষণ গাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা ছোটমামার প্ল্যান করা। কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। অদ্ভুত মাথা ওঁর। তবে নদীর হাওয়া লাগলে হাঁপানিতে ধরে, সেটা তো আর ওঁর দোষ নয়। আমাদের বাড়ির সবাই জানে আমি গুপিদের বাড়িতে আছি। গুপিদের বাড়ির সবাই জানে সে আমাদের বাড়িতে। ছোটমামাই সবার মনে এই ধারণা জাগিয়েছেন। আপাততঃ তিনি আমার ঘরে আছেন। অতিরিক্ত চিন্তার ফলে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠেছিল বলে রামকানাইদা তাঁর ক্ষীর দিয়ে ফল দিয়ে বরফ দিয়ে কি একটা বানাচ্ছে।

তদন্তের সময় গুপিকে আমাকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বারণ করেছেন ছোটমামা। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে কে জানে। তাই আমরা আলাদা আলাদা এসেছি। মানে, আমি এসেছি এবং আশা করছি গুপিও এসেছে, তরফদারের গাড়িও এসে অপেক্ষা করছে। নইলে জায়গাটা বড্ড ফাঁকা মতো। অবিশ্যি অগুন্তি নৌকো আছে, কাজেই অগুন্তি মানুষও নিশ্চয়ই আছে। তবে তাদের গলার অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া আমার কানে কিছু পৌঁছচ্ছে না। আর পথ দিয়ে থেকে থেকে যে দুটি একটি লোক যাওয়া-আসা করছে, তারা কেউ কারো দিকে সোজা তাকাচ্ছে না দেখে আমার একটু একটু গা শির-শির করছিল।

হয়তো সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকব। হঠাৎ টের পেলাম সঁ্যাৎ করে কালো সার্ট কালো আঁটো পেন্টেলুন পরা দুজন লোক আমার দুপাশে ঘেঁষে বসেছে। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, যদিও এরই জন্য আমার এখানে এসে বসে থাকা। তারা কোনো কথা না বলে প্রথমেই আমার প্যান্টের পকেট, সার্টের পকেট হাতড়ে দেখল। একটা রুমাল পর্যন্ত না পেয়ে, কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা টর্চ জ্বেলে আমার মুখে আলো ফেলে আঁৎকে উঠে বলল, 'ওরে ট্যাবা, এতো সে ছেলে নয়।' অন্যজন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সে নয় তো কে এত রাতে গাছ তলায় বসে থাকতে সাহস পাবে?'

'না রে, তার বয়স ঢের কম। এর তো দুদিন বাদে দাড়ি গজাবে।' 'তবে কি হবে, পল্টু?'

আমি বললাম, 'আরে না, না, আমিই সে। আমারই এখানে অপেক্ষা করার কথা। তোমরাও যেমন! দেখতে বড় হলেই বুঝি বড় হয়ে যায়? এত দেরি করলে কেন? এতক্ষণ ধরে বসে আছি যে এই মাকড়সাটা একটা গোটা জাল বুনে আমার গায়ের সঙ্গে জুড়ে ফেলেছে। চল, ওঠ।'

তারা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে কি, তবে কি—কি বললে? মাকড়সা! এ্যাঁ! ও কি আর সত্যি মাকড়সা!' এই বলে এক লাফে সাত হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তখনো ইচ্ছা করলেই পালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তা হবার নয়! ঠিক সেই সেই সময় এ দুটোর চেয়ে বয়সে বড় অনেকটা দাড়িওলা লোক এসে হাজির। 'কি হয়েছেটা কি! কাজের সময় না একটিও কথা বলা বারণ।' ওরা হাতে চাঁদ পেল। 'ও টমেটোদা, এ তো সে ছেলে নয়।'

টমেটোদা একটু ঘাবড়ে গিয়ে টর্চ জ্বেলে মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'না তোদের ছেলে নয়, কিন্তু আমার লোক। ভালো মানুষের মতো চেহারা দেখে চিনতে পারিনি। গাছের উপর মিছিমিছি এতটা সময় নষ্ট করেছি।' আরেকবার আমার মুখের উপর টর্চ ফেলে, খুসি হয়ে বলল, 'নাঃ, এই ভালো। ভালো মানুষের চেহারাই দরকার। কেউ সন্দেহ করবে না। সর্দার কি কম চালাক! কেমন আঁচে আঁচে লোক বেছেছে দেখোছস!—কি বলেছিলাম হ্যাঁ, তোরা এখন বাড়ি যা। তোদের ছেলে আজ আর আসবে না। হয়তো কোথাও কিছু জানাজানি হয়েছে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, কাজেই পত্রপাঠ বিদায় নিবি। সাতদিন বাড়িতে গুম হয়ে থাকবি সূর্যের আলোতে মুখ দেখাবি না। এই নে ধর।'—বোধ হয় কিছু টাকা দিল।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাত নামল। টমেটোদা আর আমি আর রাস্তার উপর দিয়ে বওয়া একটা ঝোড়ো হাওয়া। টমেটোদা একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে ইদিক উদিক তাকাতে লাগল। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল 'বড় মেশিনের একটা ছোট চাকা হবার এই তো মুশকিল! এর পরে কি হবে না হবে কিছুই জানা নেই। আমি তো একটা কগ ইন দ্য মেশিন! মাঝখান থেকে একটি লোক ঠিক সময়ে হাজির

না হলেই সব পণ্ড! অত গয়না পরেছিস কেন রে? ছুষ্টু লোকের কি অভাব আছে এই শহরে?' এই বলে আমার ঘড়ি, বোতাম আংটি, গলার হার সব খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে বেঁধে ছোট পুঁটলি বানিয়ে নিজের পকেটে পুরে নিল। সঙ্গে সঙ্গে পুঁউ-উ করে যেন বাঁশি বাজাল।

'ঐ যে এসে গেছে বাঁচা গেল!' ঐই বলে টমেটোদা হাতের টর্চটা তিনবার জ্বালাল নেবাল। অমনি একটা শণ্ডা মার্কা মাঝি নদির পাড়ি বেয়ে উঠে এসে, টমেটোদাকে বলল, 'চোরের স্যাঙাৎ এই নাকি?' টমেটোদা বলল, 'এই চোরের স্যাঙাৎ.' ওটা নাকি ওদের পাস-ওয়ার্ড। লোকটা তখন বটগাছের কোটর থেকে নোংরা খবরের কাগজের মতো একটা প্যাকেট বের করে টমেটোদার হাতে গুঁজে বলল, 'নেন রওনা দেন দিকি।' সঙ্গে সঙ্গে টমেটোদা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলাম একেই টমেটোদা বলছিল কগ ইন দ্য মেশিন। যাই হোক আশা করা যায় গুপি এবং তরফদার হাজির আছে।

লোকটা বলল 'আমাকে ঝড়ু বলেই ডাকবেন কর্তা। এই কাজে নেমে অবধি এ নামেই চলি। নইলে আমার নিজের একটা নামও আছে, হাজার খানেক টাকা ঢালতে পারলেই পাহাড়ে আমার মামুর মটর সারাবার ব্যবসার হাফ-শেয়ার আমার হবে। তখন টুপ করে একদিন কেটে পড়ব, কেউ টের পাবে না। নইলে সর্দার কি আর আমাকে এমনিতে ছাড়বে, ঘাঁটির কথা সব আমার জানা যে।'

এই বলে জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঝাড়ু বলল; 'আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যই এ কথা বললাম। সর্দারের কাছে ফাঁস করেছেন তো কচুকাটা করে মাঝ নদে ভাসিয়ে দিয়ে, হাত পা ধুয়ে বলব—ও বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। নেন লেবু খান।' এই বলে আমার হাতে একটা অসম্ভব রকম বড় কমলা লেবু ঠুঁসে দিল। লোকটাকে খুব খারাপ মনে হল না।

একশোটা এক রকম দেখতে নৌকোর মাঝখানে কে জানে কি করে নিজেরটাকে চিনে নিয়ে, তাতে ঝড়ু আমাকে টেনে তুলে, দড়ি খুলে, বেঁটে একটা দাঁড় তুলে নিয়ে বলল, 'বুঝলেন কর্তা, লুকিয়ে থাকার এমন জায়গা আর কি হতে পারে ?'

দেখতে দেখতে আমরা ঘাটের আলো ছাড়িয়ে, খিদিরপুরের ডক পেরিয়ে, রাজগঞ্জের উঁচু পাড়ি পিছনে ফেলে রেখে, অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম ! আমার ততক্ষণে মহা ভাবনা, গুপির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন ? বারেবারে পিছন দিকে তাকাতে লাগলাম। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে যেখান দিয়ে নদীর জল কেটে আমরা এসেছি সেখানে লম্বা একটা জলজ্বলে দাগ কেটে এসেছি।

মাঝি হঠাৎ বলল, 'কি দেখছেন, কর্তা ! কোনো ভয় নেই, কেউ পাছু নেয় নি। যে ব্যাটা পাছু নেবার তালে ছিল, তার কি হাল করেছি জানলে, হাসতে হাসতে আপনার পেটে খিল ধরে যেত। তার জন্যেই তো আমার পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেছিল।'

শুনে আমার হাত পা হিম। তার মানে গুপিকে ওরা ধরেছে। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। হাসির ভান করে বললাম, হে-হে, তাই নাকি ?' 'তা নয় তো কি ? নৌকে থেকেই দেখলাম ব্যাটা ঐ রেলের লাইনের ধারে ঝোপের আড়াল থেকে আপনার ওপর নজর রাখছে। আর যাবে কোথায় ? পেছন থেকে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখের ভিতর গামছা খানা পুরে, পাছমোড়া করে বেঁধে ফেলে তিন নম্বরের গাড়িতে তুলে দিতে আমার পাঁচ মিনিটও সময় লাগল না। তারপর দম ফিরে এলে, গঙ্গার পবিত্র জলে হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে, তবে আপনাদের কাছে গেলাম। আমার ঐ একটা দোষ, কর্তা ধর্মকর্মটি ছাড়তে পারি নে। শুয়ে পড়েন, শুয়ে পড়েন।'

বলে ঠেলে আমাকে শুইয়ে দিল। এটুকু বুঝলাম যে মাছ ধরার খোলা নৌকো, শুয়ে না পড়লে অন্য নৌকো থেকে সব দেখা

যায়, তাই একটু সাবধান হওয়া। আরো বুঝলাম যে নৌকোর তলাটা খটখটে শুকনো। বেশ আরাম লাগছিল। কানের কাছে নদীর জলের ছল-ছল শব্দ হচ্ছিল। ঘুম আসছিল। কিন্তু গুপি? মাঝিকে বললাম, 'সেই ব্যাটাকে তিন নম্বর কোথায় গুম করলো?' মাঝি বলল, 'কোথায় আবার গুম করবে? খালে ঢুকেই তেঁতুল তলা, তার নিচে ফেলে রাখবে। তার বেশি গাড়ি যাবার পথ নেই। আমরা ওকে ওখান থেকে তুলে ঘাটিতে নিয়ে যাব। রান্না ঘরের কাজ করবার জন্য একটা বাড়তি লোক পেয়ে মাস্টার আহ্লাদে আটখানা হবে।'

বেজায় কৌতুহল হচ্ছিল, তবু চুপ করে রইলাম, পাছে আমার ওপর সন্দেহ হয়। যাক, তাহলে গুপি আমার সঙ্গেই থাকবে। ভেবেও এত আরাম লাগল যে বেমালুম ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। হয়তো তিন চার ঘণ্টা। খালের ভিতর কখন নৌকো ঢুকেছিল টের পাই নি। কিন্তু ঘচাং করে ডাঙাটায় যেই লাগল, তারই ধাকায় ঘুম ভেঙে গেল।

আকাশে সরু এককালি চাঁদ। তার ফিকে আলোতে ঝড়ু নৌকো বেঁধে ডাঙায় নামল। গাছ তলায় কালো একটা ছায়ামূর্তি বোধ হয় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। বাঁধন খুলে ঝড়ু তাকে নৌকোয় তুলল। চাঁদের আলোয় দেখলাম গুপিই বটে। তার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা। ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করতে বললাম। নইলে আমাকে দেখে সে এমনি আঁৎকে উঠছিল সে আরেকটু হলেই সব পণ্ড হয়ে গেছিল আর কি। আমি চোখ পাকিয়ে তাকে ধমক দিলাম 'ওকি হচ্ছে। চুপ করে শুয়ে থাক!' বলে যেন বাঁধন পরীক্ষা করছি এই রকম ভাব দেখিয়ে ওর হাতের বাঁধন একটু ঢিলে করে দিলাম।

ঝড়ু বলল, 'ও দড়ি-বাঁধা বাবু, কোনো ভয় নেই। মাস্টার আপনাকে লুফে নেবে। অমনি অমনি আপনাকেও কাজ দিয়ে

দেবে। দুজনায় বেশ চালিয়ে নিতে পারবেন, আমরাও শান্তি পাব। বাবা! ঠাকরুণদের সামলানো কি একটা মানুষের কম্ম! ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো টাকা, সব দেবে দেখবেন বললাম না লোকটাকে খুব খারাপ বলে মনে হলো না। তবে রান্নাঘরের ব্যাপার ঠিক বোঝা গেল না। যদি যা মনে হল, সত্যি করে তাই হয়, তবেই তো সর্বনাশ!

এর মধ্যে নৌকো আরো অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ছোট একটা ঘাটে এসে লাগল। পাশেই বটগাছের ডালে একটা শেড লাগানো। বড় তেলের বাতি জ্বলছিল। নামার আগে ঝড়ুতে আর আমাতে মিলে গুপির বাঁধন খুলে দিলাম। ল্যাগব্যাগ করে ব্যাটা পড়েই যায় আর কি। কম সময় তো বাঁধা অবস্থায় থাকেনি। হাতে পায়ে সত্যিই খিল ধরে গেছিল। ঝড়ু ওকে আচ্ছা করে দলাই করে দিল। বলল, 'সুস্থ না হয়ে এগুবেন না, কর্তারা। রাত যতই হক, যা ঠাকরুণরা অমনি ছেঁকে ধরবেন, পালাবার পথ পাবেন না।' ঘাটের পর ইঁট বাঁধানো পথ চলে গেছে মস্ত একটা পুরনো বাড়ির দরজা পর্যন্ত।

হয়তো রাতের চুপচাপে গলার স্বর কি পায়ের আওয়াজ শোনা গিয়ে থাকবে। দুম করে পেছনের দরজা খুলে হুড়মুড় করে জনা

দশ-পনেরো গিন্নি ছুটে বেরিয়ে এলেন প্রত্যেকের বগলে একটা করে ব্যাগ, নয়তো পোঁটলা। সবার মুখে এক কথা, কই! কই! নৌকো কোথায়?

ঝড়ু কোনো কথা না বলে, নিঃশব্দে হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘাটের দিকে দেখিয়ে দিল। গিন্নিদের স্রোত সেই দিকেই বয়ে চললো। ঘরের ভিতর থেকে আলো আসছিল। চেয়ে দেখি খোলা দরজার সামনে রোগা একজন ভদ্রলোক ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন, ঝড়ুকে দেখে চিঁ চিঁ করে বললেন 'বাঘের মুখে আমাকে ঠেলে দিয়ে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি হতভাগা।'

ঝড়ু হেসে বলল, 'কেন, কি হয়েছিল?' 'ওরা—ওরা আমাকে দুপুর থেকে ঘেরাও করে রেখেছিল। খেতেও দেয় নি। বলছিল নাকি ওদের বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত করে না দিলে আমাকে ছাড়া হবে না। উঃ, বড় বাঁচান বাঁচালিরে! কিন্তু—কিন্তু নৌকো না পেয়ে যদি আবার ফিরে আসে?'

পথের বাঁক থেকে টমেটোদা ডেকে বলল, 'ভয় নেই, ভয় নেই, ফিরে তারা আসবে না। আমাদের নৌকোতে চেপে তারা সোজা যাচ্ছে বড় গঙ্গায়। ওকি হল? এই গুপ-পানু ধর ওকে!' রোগা ভদ্রলোক আমাদের কোলে মুচ্ছো গেলেন আর ঝড়ু পড়ি-মরি করে দৌড় লাগাল, কিন্তু টমেটোদার সঙ্গে পারবে কেন। নিমেষের মধ্যে তাকে ধরে ফেলে হাতে হাত-কড়া লাগাতে টমেটোদার দু-মিনিটও লাগল না। তারপর টমেটোদা দাড়িটা খুলে ফেলল।

এতক্ষণ পরে চিনলাম সে বিনু তালুকদার ছাড়া কেউ নয়। অবিশ্যি সে বিষয়ে কিছু বলার আর সময় পেলাম না। একটা কাঠফাটা গলায় চিৎকারে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে উঠল। সেই শব্দ শুনে রোগা ভদ্রলোকের মুচ্ছো ভেঙে গেল। অমনি সটাং হাঁটু গেড়ে বিনু তালুকদারের পা জড়িয়ে কেঁদে বললেন, 'দোঁহাই স্যার, আমি সব বলছি, কিন্তু ওদের ছাড়বেন না। টাকার

লোভে পড়ে গত আটমাস যে কি নরকে কাটিয়েছি, শুনলে আপনাদের মতো পুলিসের লোকদেরও চোখে জল আসবে।'

বিনু তালুকদার তাঁকে টেনে তুলতেই, হাউমাউ করে আরো বকে যেতে লাগলেন, 'ইচ্ছে হয় আমাকে জেলে দিতে পারেন। জেলে কেন, ফাঁসিও দিতে পারেন। শুধু ঐ আশীটা বিচ্ছুর কাছে আর নয়!'

বিনু তালুকদার বললেন, 'ওদের মধ্যে রতনমণি চৌধুরী বলে কেউ আছে?' 'আছে, আছে, সবচেয়ে পাজি যেটা, তারই নাম রতনমণি।' 'তার কাছে একটা পুরনো সোনার ট্যাঁকঘড়ি আছে?' 'আছে, আছে। মানে ছিল। এখন সেটা আমার লোহার সিন্ধুকে আছে। ওটা ছুঁড়ে আমাকে প্রায় কানা করে দিয়েছিল, মশাই।'

'নিয়ে আসুন সেটাকে।'

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রোগা ভদ্রলোক দোতলায় একটা ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলে ট্যাঁক-ঘড়ি নিয়ে এলেন। পাশেই বড় একটা ঘরে দেখলাম বাইরে থেকে তালা দেওয়া। ভিতরে বিকট চ্যাঁচামেচি। ঘড়ি দিয়েই, দুদ্দাড় করে রোগা ভদ্রলোক আবার নিচে নেমে এলেন।

বিনু তালুকদার তখন আমাকে বললেন, 'ঐ লোকটার হাতকড়া খুলে দাও।' খুসি হয়েই দিলাম। ঝড়ু বলল, 'থ্যাঙ্কিউ।' তারপর বিনু তালুকদারকে বলল, 'স্যার, কিছু জলপানি পেলে ছেলেধরার কেসে সাক্ষী বনে যাই।'

বিনু তালুকদার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'ছেলেধরার কেস? সে রকম কোনো কেসের কথা তো শুনিনি। তাছাড়া আমি ছুটিতে আছি। আমার এক ডিটেকটিভ বন্ধুর হয়ে এই চোরের কাছ থেকে ট্যাঁকঘড়িটা উদ্ধার করে দিলাম। আপনারা সবাই যার যেখানে খুসি যেতে পারেন।'

শুনে তারা যেমনি অবাক তেমনি খুসি। শুধু রোগা ভদ্রলোক

বললেন, 'আপনার নৌকোতে যদি আমাকে নিয়ে যান তো সব কথা বলি। চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে।'

ঝড়ু বলল, 'তা কি করে হয়? অপনার চার্জে আশীটা ছোট ছেলে আছে না? স্যার আমাকে নিয়ে চলুন, আমি আরো ভালো করে ওঁর বিষয় সুদ্ধু বলব। চপুন স্যার, ওঁর স্কুল উনি সামলান। টাকাগুলো কার পকেটে গেছে সে-কথা মনে রাখবেন।'

রোগা ভদ্রলোক কাঁউ-কাঁউ করে আবার মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় করছেন দেখে বিনু তালুকদার বললেন, 'কিসের অত ভয়, মশাই? আমার সঙ্গে ঐ আশীজনের বাবারা এসে গাঙের মুখে চারটে বজরায় অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি তাঁদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ এইখানে বসে বসে টাকার লোভের ঠেলা বুঝুন। চল্, গুপি পানু। চল হে ঝড়ু, টমেটোর আতিথ্যও নেহাৎ খারাপ লাগবে না।'

বিনু তালুকদারের এক বন্ধু লঞ্চে করে ফিরলাম। পথে বাবাদের গিয়ে ছেলে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হল। এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া শোনা গেল। যেমন আঁচ করেছিলাম, আসলে ঠিক তার উল্টো। ঐ গিন্নিরা সমকালীন মহিলা সংঘের সভ্য। ওঁদের স্বামীরা যেমনি পয়সাওয়ালা, তেমনি কৃপণ। গিন্নিদের গায়ে একটা বাড়তি গয়না ওঠে না, লোমশ জামা গায়ে দিয়ে পাহাড়ে বেড়ানো দূরের কথা। সয়ে সয়ে যখন অসহ্য হয়ে উঠল, ওঁরা তখন স্বামীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য একটা ছেলেধরা লিমিটেড কোম্পানি খুললেন। তাতে দুটো লাভ হবে ভেবেছিলেন, টাকাও পাওয়া যাবে আর কয়েকদিনের জন্য লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলোর দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচা যাবে। কাজের বেলায় অন্যরকম হল। ঝড়ু বলল, 'বুঝলেন কিনা স্যার, লোভ বড় খারাপ জিনিস। টাকা প্রায় সবই পেয়ে গেলেন। সর্দারের ৩০% দিতে দেখলাম বেজায় আপত্তি। এই জন্যেই আমাকে রাখা। টাকা তুলে আমাদের কাট্ সংগ্রহ করে তবে ওনাদের দেওয়া হয়। এদিকে

ছেলেগুলোও মহাপাজি, পড়াশুনা করে না, রোজ এ-দাও, ও-দাও বায়না। সরদার থাকেন কলকাতায় তাঁকে তিন নম্বর বলে ডাকা হয়। খাল-তলায় ঐ মাস্টারে আর আমাতে পেরে উঠব কেন? তাই আশীজন গিন্নির মধ্যে ষোল জন করে দশ দিনের ডিউটি দেবার ব্যবস্থা করা হল।

কি আর বলব, স্যার! ওনাদের ছেলেগুলোকে যদি বা পিটিয়ে শায়েস্তা করা যায়, ওনাদের কে ঠেকাবে বলুন? রোজ বড় মাছ চাই, গয়না কেনার দোকান চাই, গয়না দেখাবার লোক চাই, নিজেদের মধ্যে অষ্ট প্রহর খ্যাঁচাখেঁচি। উঃফ্! নাকে-কানে খৎ দিচ্ছি, এ কম্ম আর নয়। তা ছাড়া আমার হাজার টাকা উঠে গেছে, আমি চললাম পাহাড়ে, মামুর গাড়ি মেরামতের দোকানে।'

বিনু তালুকদার বললেন, 'খাল-তলায় বাড়িটা কার?' 'ওমা, সে তো সরদারের। ওঁর বুদ্ধিতেই হয়েছে। তিন নম্বর ছেলে তো ওঁরই ভাগনে। তাইওনার নাম তিন নম্বর। কিন্তু ওঁর আসল নামটা তো তরফদার!' বিনু তালুকদার একটু মুচকি হাসলেন। আমরা তো থ!

তক্কাঘাটে ঝড়ু নেমে গেলে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার আপনি তো ছুটিতে, আপনি এর মধ্যে এলেন কি করে? ছোটমামা—'বিনু তালুকদার বললেন 'ঠিক তাই, ছোটমামাই। পানুর ঘরে ছোটমামা, অথচ পানু অদৃশ্য। পানুর বাবা ছোটমামার কাছ থেকে সব শুনে, পানুর কাকাকে ফোন করলেন। কাকার বাড়িতে আমিও ছিলাম—।' গুপি বলল, 'সে কি! তবে টমেটোদা কোত্থেকে এল? বিনু তালুকদার হাসলেন, 'নাঃ, তোরা বড় বেশি চালাক। আসলে চাঁদু আনফিসিয়েলি আমাকে বলেছিল। চাঁদুরা শুঁকে শুঁকে অনেকখানি বের করেছিল; কিন্তু তাদের বন্ধু তরফদারের কারসাজি আর ছেলেগুলোকে যে কোথায় চালান দেওয়া হয় টের পাচ্ছিল না। টমেটোদা সেজে তরফদারকে চিনতে

আমার দেরি লাগেনি, কিন্তু ঝড়ুর হাতে ছেলে নেবার ভার, আমার কাজ শুধু নতুন লোক বহাল করা। আমি তোদের একজনকে রান্নাঘরের চাকর করে দিলাম। চাঁছুর তা সইবে কেন? সে আবার বাঘের উপর টাগ্ হয়ে পানুকে খোকা সাজাল। ভাগ্যিস্ গিয়ে পড়লাম নইলে ঐ ট্যাবা-পণ্টুই সব মাটি করে দিত। যাক্, সব ভালো যার শেষ ভালো। চাঁছুর এক বছর শেষ হল, আরেকটা বছর কোনোমতে কাটাক। ও হ্যাঁ, ট্যাঁক ঘড়িটা ওকে দিয়ে দিস্। আর তোর গয়নাগুলো।'

চোদ্দ ডিঙা

গুপি-পানুও বেশির ভাগ ছেলের মতো ১৬ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে গুপিদের পিতাঠাকুরদের আদি বাসস্থানে বেড়াতে গেল। কলকাতার জগন্নাথ ঘাট থেকে গঙ্গ-সাগর যাবার তিন ভাগ পথ পার হয়ে, তবে সেই জায়গা। জল পথে হয়তো মোটে ৬৫ মাইল দূরে, কিন্তু একেবারে অন্য দেশ, অন্য জগৎ। চারদিক রোমাঞ্চময়, অদ্ভুত, বাসিন্দাদের মেজাজ আলাদা; গাছপালার ঝোড়ো চেহারা: বাড়ির ছাদের গড়নে-ও একটু বৈশিষ্ট্য। নদীর ধারে উঁচু পাথুরে পাড়ি; সেখান থেকে অন্য রকম জল-জন্তুর চিহ্ন দেখা যায়; কখনো তিন-কোনা পাখনা; কখনো জলের ওপর রূপোলী টান, তার আগায় দুটো ফুটো-ওয়ালা কালো হাঁড়ি। যারা চেনে, তারা বলে বদর বদর!

এখানে কোনো কালেও ব্রিটিশদের পুরোপুরি দখল ছিল না। উপনিবেশকারী পর্তুগীজদের এরা নাকি বংশধর। তারা এসেছিল ব্রিটিশসের ঢের আগে। জলদস্যুর জাত। চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘেন্নার চোখে দেখত আজ পর্যন্ত তাদের বংশধররা চুরি-চামারি ফুট-তরাজকে পুরুষদের উপযুক্ত পেশা বলে মনে করে। তবে আজকাল সব সময় পেরে ওঠে না। বেজায় গরীব। নোনা

মাটিতে ভালো ফসল হয় না ; কিন্তু এক জাতের সাদা মিষ্টি তরমুজ আর ত্রিবান্দ্রামের বেঁটে নারকোল লাগিয়ে একটু যত্ন করলেই, খুব ফলে। এই সব করে কোনো মতে ওদের সংসার চলে! পর্তুগীজ হক, কি যাই হক, স্ত্রীপুত্র বিধবা পিসিমা ওদের ঘরেও ছিল।

গুপির ছোটমামা সে সময়ে শিমলায় নিরাপদে হোটেলের তদারকি করছিলেন ; তাইতে এদের দু-বাড়ির গুরুজনরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন, ছেলে দুটো তাহলে নিরিবিলিতে পরীক্ষা দিয়ে পাস্ করবে। বুদ্ধি তো কারো কম নয়, ঐ চাঁদু হতভাগাই—সে থাক না। গুপি-পানু নৌকোয় সারা পথ যাবে ; গুপির মেজদাদু নৌকো পাঠিয়েছেন। মাঝির চেহারা জলদস্যুর মতো ; এই বিরাট দশাসাই শরীর ; পোড়া ঝামার মতো মুখের চামড়া ; রঙ ও প্রায় তাই। ডাক-নাম পদ্দে, ভালো নাম নাকি পেদ্রো। তা হতেও পারে।

খুব ভোরে, তখনো আকাশে কয়েকটা তারা মিটমিট করছে, ভাঁটার সঙ্গে ওরা জগন্নাথ ঘাট থেকে ছেড়ে যাবে, এমন সময় বর্ধমানের সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্সের বুড়ো মিঃ সমাদ্দার ছুটতে ছুটতে এসে বয়সের তুলনায় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সর্পে এক লাফে নৌকোয় উঠলেন। সেদিকটা একটু কাৎ হল, কিন্তু জল উঠল না। এ মেজদাদুদের পৈত্রিক নৌকো।

বলা বাহুল্য সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্সেই তিন বছর চাকরি করে গোয়েন্দাগিরিতে গুপির ছোটমামা হাত পাকিয়েছিলেন আর এদেরো যে-টুকু অভিজ্ঞতা তার প্রায় সবটাই সেই সূত্রে পাওয়াতে সমাদ্দারকে ওরা একটু সুনজরে দেখত। হাঁসফাঁস করতে করতে খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে। সমাদ্দার বললেন, "তোমরা একটু হাত না লাগালে এবার আমার ২৫ বছরের পুরনো ব্যবসাটা উঠে যাবে।" কি ব্যাপার? না, ব্যাপকভাবে সোনা পাচার হচ্ছে, কাউকে ধরা যাচ্ছে না।

পান্নু বলল, "তা আমরা কি করব স্যার ? পরীক্ষা দিতেই বুদ্ধি খতম। ছোটমামাকে লিখুন।" "সে উত্তর দেয় না। শেষের চিঠি ফেরত এসেছে। তার ওপর চাঁতুর নিজের হাতে লেখা 'নট্ নোন্'। আর বুদ্ধির কথা কে বলেছে ? তার জন্যে আমি আছি। একটু চোখ-কান খোলা রাখবে, এই আর কি। এদিকে কোম্পানি লাটে ওঠার জোগাড়। অথচ এ কাজটা হাসিল করতে পারলেই সরকারি স্বীকৃতি, মোটা বার্ষিক অনুদান ইত্যাদি। চাঁতু বলছিল তোমরা থাকতে—" এই বলে সমাদ্দার চুপ। গুপি পান্নুর দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল, "বেশ, তাই হবে। কিছু দেখলে জানতে পারবেন।"

ডক্কাঘাটের পরেই সমাদ্দার নেমে গেলেন। নৌকো চড়লেই আর বিশেষ করে একসঙ্গে অনেকগুলো জাহাজ দেখলেই, তাঁর গা গুলোয়। মুখটা এরি মধ্যে বেশ সব্‌জেটে দেখাচ্ছিল। তখনো সবে ভোর। গুপি জলের দিকে চেয়ে বলল, "কি চালাক দেখলে।" "কে ? "মিঃ সমাদ্দার।" "নাকি তোর ছোটমামা ?"

দুপুরে নৌকোর পাটাতনে ঝকঝকে বাসনে পদো ঝাল ঝাল চিংড়ির ঝোল আর মোটা লাল চালের ভাত রাঁধল। পান্নু, বৈঠা নিল। ওর মা আমের আচার আর কড়া পাকের সন্দেশ দিয়ে ছিলেন। খাওয়াটা মন্দ হয়নি। সন্ধ্যায় একটা গাঁয়ের ঘাটে নৌকো বেঁধে পদো বলল, "সব খাও তো ?" গুপি বলল, "সব, সব, এক ঝিঙে আর উচ্ছে বাদ।" পদো নাক সিঁটকে বলল, "ছো, ছো, ওগুলো আবার মানুষের খাদ্য নাকি !" নৌকোর ছাউনির মুখে বড় একটা লণ্ঠন ঝুলছিল। জলের ধারে চাটাই দিয়ে তৈরি একটা দোকান, তার ছাদ থেকেও একটা বড় লণ্ঠন ঝুলছিল। সেখান থেকে পদো তিনজনের মতো মোটা মোটা আটার রুটি আর কষা কচ্ছপের মাংস কিনে এনে, মাংসটা দু-ভাগ করল।

পান্নু বলল, "তুমি খাবে না ?"

পদো শিউরে উঠে বলল, "ও বাবা না! তাজা মাংস আমার সয় না, পেট-রোগা মানুষ। আমার জন্য শুকনো হাঙরের মাংসের ঝাল আম-তেল এনেছি। চাখবে নাকি?"

পানু ঢোক গিলে বলল. "বিট্‌কেল গন্ধ যে!" পদো চটে গেল, "তাই না আরো কিছু! খেতে জানলে তাজা জিনিস ছুঁতে না! আমরা পাখি মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখি। আপনা থেকে খসে পড়লে তবে রাঁধি। এটাই আমাদের ইউরোপী নিয়ম। আমরা মারিয়া মায়ের সন্তান!" এই বলে গলায় ঝোলানো একটা জঘন্য নোংরা খুদে থলি বের করে কপালে ঠেকাল।

গুপি-পানু অবাক। ইউরোপী নিয়ম? মারিয়া-মায়ের সন্তান? এদিক ওপর হাতে এক গোছা মাদুলী বাঁধা। আসবার ঠিক আগেও গুপির দাদুর কাছে কালিঘাটের শুকনো প্রসাদ চাইছিল। সে-কথা বলতেই পদো বিরক্ত হয়ে বলল, "বেশ বললে! মারিয়া-মা-তে আর কালী-মা-তে তফাৎটা কি শুনি? দেখো গিয়ে আমাদের গাঁয়ের ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দিরে। যে-সে জিনিস নয় বাপু, সম্ভবতঃ রানী ইজাভেলার টাকায় তৈরি। তখন তোমাদের পেয়ারের ইংরেজরা এ-দেশে আসা দূরে থাকুক, নাও চড়তেই ঘাবড়াত। আমরা তাদের কোনো কালেও রাজা বলে জানিনি। আমরা হলাম গিয়ে খাঁটি পর্তুগিজ।—একটু পান-সুপুরি পেলে হত।"

পানু বলল, "খাঁটি পর্তুগিজ তো এত কালো কেন?" পদো দূরে নদীর বাঁকের আবছায়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের কথা শুনে হাসি আসে। আমাদের তিনটে গাঁ-শুদ্ধু সবাই খাঁটি পর্তুগিজ। নিজেদের মধ্যে ছাড়া আমরা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিই না। আমরা সকলে কুচকুচে কালো। তাতে হয়েছেটা কি?

এর কোনো উত্তর হয় না; তা-ছাড়া রাত-ও হয়েছিল

চারদিকে অন্য শব্দ নেই, শুধু নদীর একটানা ছলাৎ-ছলাৎ! ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তারি মধ্যে গুপি একবার জিজ্ঞেস করল, "ও পদোদা, বাঘ-টাঘ সাঁতরে নৌকোয় উঠবে না তো?" পদোর কি হাসি। "কোত্থেকে আসবে শুনি? সবে তো বাঘের চাষ শুরু হল। নাও ঘুমোও। ভোরের আগেই পৌঁছব।"

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, পুরনো ঘাটে নৌকো বাঁধা, জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে আর পাকা আমের মতো টকটকে রঙের একজন বুড়ো খুব হাঁকডাক করছেন। তিনিই গুপির মেজদাদু। ঘাটের কাছে বাড়ি, উঁচু পাড়ি বেয়ে যেতে হয়।

অদ্ভুত জায়গা। দিন-রাত হু-হু করে নোনা হাওয়া বয়। মেজদাদু, বললেন, "হাওয়া খেয়ে গাছগুলোর আকার দেখেছিস্? আবার যদি হাওয়া পড়ল তো চারদিক এমনি থম্-থম্ করবে যে মনে হবে যে প্রলয় এল! এখানকার ঝড় দেখবার জিনিস। সমুদ্রের জল উজান ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। নদী ফুলে ফেঁপে ঐ যে পাড়ির ওপর বড়-ঠানদিদির ঘর দেখছিস? ওরি নিচে অবধি ওঠে। ওখানে পুরনো একটা নৌকো বাঁধার আংটা আছে পাথরের গায়ে গাঁথা। বড়-ঠানদিদির ঘরটাও পাথরের তৈরি। ছাদের কোণায় লণ্ঠন ঝোলাবার জায়গা আছে। জেলেদের আর—আর জলদস্যুদের ঝড়ের আর নবাবের সেপাইদের বিষয়ে জানান দেবার জন্য। গোটা দুই পুরনো লণ্ঠন-ও আছে! ঠানদিদির পূর্ব-পুরুষরা বাতিদার ছিল। তারপর দিন কাল পাল্টে গেল। তারা খেতে পায় না। যে-যার কাজের খোঁজে চলে গেল। বছর দশেক হল, ওদের শেষ বংশধর ঐ থুথুরে বুড়ি এসে পূর্ব-পুরুষদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ঐ এক রকম বলতে গেলে বড়-গাঙের মধ্যিখানে বুড়ি একলা থাকে। সেকালের হাড়, দাদু, তার তুলনা খুঁজে পাবে না।"

বাস্তবিকই তাই। বুড়ির হাতের কব্জি কি জোরালো, পায়ের

আঙুলের গাঁট কি শক্ত! পাথরের গায়ে এমনি এঁটে ধরে যে মনে হয় দেড়শো কিলোমিটারের ঝোড়ো হাওয়াতেও ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। চুলগুলো ছোট করে কাটা, মাথায় ঘোমটা, তার নিচে কুচকুচে কালো চোখ হাসির চোটে মিট মিট করছে, গায়ের রঙ নিরেট কালো। মেজদাদু ওদের নিয়ে গেছিলেন তৃতীয় দিনে, অন্য সব দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা হয়ে গেলে পর। হয় তো যাতে ওরা কিছুক্ষণের মতো অন্যত্র থাকে। আর উনি একটু শান্তিতে থাকতে পারেন। উনি গোয়েন্দা নবেল পড়তেন।

ফিরিঙ্গি-কালীর মূর্তিটা যে আদৌ কালীমায়ের নয়, তাতে গুপি-পানুর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে হল আবলুশ কাঠের তৈরি সেকালের কোনো জাহাজের মুখে লাগানো মারিয়া-মায়েরি মূর্তি হবে। বুড়ো পুরুতঠাকুর বললেন একবার নিদারুণ খরার সময় নদীর জল নোনা হয়ে গেছিল, শস্যও হল না; মানুষেরো প্রাণ যায়। ওরা তখন সবাই মিলে মা-কালীর মাটির মন্দিরে ধরণা দিল। সেই রাতে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি-ঝড় উঠে মা-কালীর মন্দিরটাকে। ধূলিসাৎ করে, মাটির মূর্তি চ্যাপ্টা করে, তার জায়গায় সদ্য জল থেকে উঠে আসা এই ফিরিঙ্গি-কালীর মূর্তি ফেলে দিয়ে গেল। এর কাছে নাকি ভক্তিভরে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। মন্দিরের দরজার পাশে একটা পুরনো কাঠের ক্রুশ-ও ছিল। ঐ রকম কালো কাঠের তৈরি। ওদের মনে হল এ দুটোই সম্ভবতঃ কোনো ডুবে যাওয়া জলদস্যুদের জাহাজের মাথায় লাগানো ছিল। ঝড়ের দাপটে নদীর গর্ভ থেকে উঠে এসেছিল। সে যাই হক, এরা ভারি ভক্তি করে। এরা কেমন খৃশ্চান আর হিন্দু বিশ্বাস মিলিয়ে মিশিয়ে শান্তিতে বাস করছে। যে কারণেই হক, সবার ঘরে সাইকেল, হাতে হাত-ঘড়ি। পানু একবার গুপির দিকে চাইল। চাষবাস মাছ-ধরা থেকে আয়।

পদো নদীর মোহনার বড় গাঙ থেকে অদ্ভুত চেহারার মাছটাছ

আনত। মাছ বললে ঠিক বলা হয় না। তবে জানোয়ার তাতে সন্দেহ নেই। মেজদাদুর বামুনঠাকুর সেগুলোকে যা রাঁধত, না খেলে বোঝানো যাবে না। সন্ধ্যেবেলায় নদীর ধারে বেড়িয়ে ফেরার পথে ওরা ঠানদিদির গল্প শুনত।

অদ্ভুত গল্প বলতেন। বাইরে বসলে বাতাসের তোড়ে কথা উড়িয়ে নিত, তাই বুড়ি ওদের ভেতরে বসাত। গোলমতো পাথরের ঘর, উঁচু ছাদ। সেই অবধি একটা সরু সিঁড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে গেছে। দেয়ালে তাকের ওপর তাক। তাতে সারি সারি টিনের ট্রাঙ্ক, কাঠের প্যাঁটরা। ও ঠানদিদি, এত জিনিস কার?"

ফোকলা দাঁতে হেসে বুড়ি বলল, "আমার রে দাদা। সব গুছিয়ে রেখেছি, কোন ফাঁকে আমায় নিতে নৌকা আসবে, তার আর তর সইবে না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হবে।"

"কি রকম নৌকা, ঠানদিদি?" ফিক্ করে হেসে ঠানদিদি বলল চোদ্দ-ডিঙা ছাড়া আবার কি? জানিস্ আমার অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাদের দাপটে এ তল্লাটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। ঐ আংটা দেখছিস্, ঐখানে তাদের চোদ্দ ডিঙা বাঁধা থাকত। যবদ্বীপ অবধি তাদের যাওয়া-আসা ছিল। বাড়ির বড় কর্তা একবার গেল তো আর ফিরল না। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। সমুদ্রের বুকে এক সবুজ দ্বীপে সে রাজত্ব ফেঁদেছিল। আমি তার শেষ বংশধারিনী আমাকে সেখানে নে যেতে চোদ্দ-ডিঙাটি পেটিয়ে দেবে।"

"এত কি আছে বাক্সে?"

"দেখবি? আয় দ্যাখ। আমার সারা জীবনের পুঁজি।" পুঁজি দেখে হাসি পেল। পুরনো জরি পাড়ের কাপড়, ফুঁটে, কাঁসার থালা-বাসন, লেস্-বোনা হাতপাখা, তকলি, পুঁতি মালা, হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ, এই সব। হাসিও পেল, শয়াও লাগল। আহা, বুড়ির এই পাগলের স্বপ্ন ছাড়া কিছু নেই। ঐসবের সঙ্গে ওর তোলা উনুন, হাঁড়িকুড়ি, থালা বাটি। বাইরে রাখলে নাকি খারাপ দেখায়।

"আমাদের নেবে না, ঠানদিদি, চোদ্দ-ভিঙায়? আমরা কখনো বিদেশে যাইনি।" বুড়ি হঠাৎ উঠে পড়ে একটা চারকোণা তেলের লণ্ঠন জ্বেলে তরতর করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে, ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে লণ্ঠনটাকে পুরনো আংটায় ঝুলিয়ে দিল।

গুপি-পানুও উঠে পড়ল। রাতের খাবার সময় হয়ে এসেছিল। মেজদাদুর ছেলেদের বৌরা ভারি বদমেজাজী। গুপি হেসে বলল "ঐ ওদের পর্তুগিজ উত্তরাধিকার। আর তো কিছু পেল না। পানুকে একটু ভাবিত মনে হল, "আচ্ছা, বুড়ি ওখানে একদিন মরেও থাকলে কেউ টের পাবে না।"

মেজদাদুর কাছে একদিন কজন লোক এল, নদী-পুলিশের লঞ্চে। ওঁর চেনা লোক। এসেই বলল, "মামাবাবু; আপনার লোকটিকে বলুন সেই গুগ্‌লির পোরে ভাজা করতে। মহা ফ্যাসাদে পড়েছি, মামা! কর্তারা বড় অবুঝ।" পোরে-ভাজার ফরমায়েস দিয়ে ফিরে এসে মেজ-দাদু বললেন, "হয়েছে টা কি?"

"কাগজ পড়েন না, মামা?" মেজদাদু শিউরে উঠে বললেন, "১৯০০ সালের পরে ছাপা কিচ্ছু পড়ি না। কেন?"

"ইন্টার পলের খবর 'ফিলিস্' বলে বিদেশগামী বড় জাহাজ নাকি চোরাই সোনায় বোঝাই হয়ে কলকাতায় আসছিল। আচি-পুরের কাছে এসে রাতের অন্ধকারে সে-জাহাজ ডুবন্ত বালির চরে আটকে গেল। পাইলটের কাজ পথ দেখিয়ে আনা, তার আদেশ নাকি ক্যাপ্টেন শুনলই না। অন্ততঃ পাইলট তাই বলছে। ওরা বলছে ডক্ খালি নেই শুনে ওরা দুদিন ওখানে জিরুবে বলে নোঙর করতে গিয়ে, বালির চরায় আটকে গেছে।"

মেজদাদু বললেন, "ঐ যে গরম গরম পোরে ভাজা খাও।" ওরা খেতে খেতে বলাবলি করতে লাগল, "কি ভালো খেতে আর আমাদের বাড়ির লোকদের গুগ্‌লি শুনলেই গা গুলোয়। "মেজদাদু

বললেন, " বুদ্ধি থাকলে তো থাবে! তবে এ গুলো ঠিক গুগলি নয়, কচি তরমুজের পোরে ভাজা। সেদিন ভুলে গুগলি বলেছিলাম। অনেকটা এক রকম দেখতে কি না। তা তোমাদের সমস্যাটা কি, তাতো বললে না।"

ওরা আমতা আমতা করে বলল, "জানি, আপনার বিশ্বাস আপনি নদী-পুলিশের চাকরি ছাড়ার পর থেকে আর কেউ কোনো কাজ করে না কিন্তু অতি গোপনে, অতি তৎপর ভাবে 'ফিলিস্‌; জাহাজ ঘেরাও করে আগাগোড়া চিরুণী-আচড়া করেও এক কণা সোনা পাইনি। ডুবুরি নামিয়ে জলের নিচেও নয়। জাহাজের তক্তা, লোহা. প্রায় সব খুলে ফেলেও নয়। লুকোবার জায়গা মেলা দেখা গেছে, কিন্তু সব ফাঁকা। কাপ্তেন নাকি ইন্টারপলে আমাদের নামে নালিশ করবে, নির্দোশ পার্টির ওপর হাঙ্গামার জন্য। এক কোটি টাকা খেসারৎ চাইবে। চাকরি আর রইল না। চুপ করে আছেন কেন, কিছু বলুন।"

মেজদাদু বললেন, "হুঁম্। তাহলে ইন্টারপলের খবর বোধ হয় ভুল।" আচ্ছা, খাওয়া হয়েছে, এবার এসো গে। দেখি কি করতে পারি।" দুপুরে খাবার সময় মেজদাদু গুপি পানুকে বললেন, "দেখিস্ তো কিছু যদি চোখে পড়ে। তবে কিছু হলে তো বড় ঠানদিদি আগে দেখতে পেত। রাতে উঠে দুবার বাতিতে তেল ঢালে। আমরা সবাই চাঁদা করে তেলের খরচ দিই।" পরে বললেন, "ওর পূর্বপুরুষরাও কত সময়ে এখানে খেয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে। তোদের মেজদিদিমা দু-বেলা ওর খাবার পাঠায় পদোর হাতে। ওকে রাঁধা বাড়ার বালাই করতে হয় না। ওর ধারণা ও বাতি না দিলে জাহাজ ডুবি হবে। আসলে ওখানে এঁটেল মাটি আছে, তাতে গাছ গজিয়ে এখন আর ঐ মিটমিটে তেলের আলো চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ যখন আগের বাঁকে জোরালো লাইট হাউস আছে। তা বুড়িকে কে বোঝায়। একটা লাল লণ্ঠনও

আছে, নাকি বিপদের সংকেত। এদিকে রাঁধাবাড়া হাঁড়ি কড়াই উনুন ধরানোর জিনিসপত্রের ধারধারে না বুড়ি সারাদিন আলোর ডোম সাফ করে, সলতে ছাঁটে। তাই নিয়েই সুখে আছে।"

মেজদাদুর বাড়ির পাথরের ভিৎ, পুরু ইঁটের দেয়াল। ছোট্ট ছোট্ট ইঁট, রোদে পুড়িয়ে তৈরি, হয়তো তিনশো বছর আগে। ছাদে একটি বড় ঘর, তার চারদিকে জানলা। সে জানলা দিয়ে হু-হু করে দিন রাত হাওয়া দেয়। সেই ঘরে গুপি-পানুর শোবার ব্যবস্থা। পুরনো একটা প্রকাণ্ড তক্তাপোষ, এই উঁচু; তার গায়ে কত গোপন খোপ, টানা দেরাজ। মস্ত একটা আলনা, তার নিচেটা বাক্সের মতো বড়, রোমাঞ্চকর ইংরিজি বইতে ঠাসা। বোধ হয় মেজদাদুর গোপন পুস্তকাগার! একটা লটঘটে টেবিল, তিনটে নড়বড়ে কাঠের টুল—এই হল আসবাব।

তাতে কিছু এসে যায় না। যতদূর চোখ যায়, সব দেখা যায়। নদীর ধারের পাথরের পাড়ি, পাড়ির ওপরে বড়-ঠানদিদির ঘরটি। গুপিদের ঘরে আসার বাইরের একটা সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে এক দৌড়ে তিন মিনিটে বুড়ির বাড়ি পৌঁছনো যায়। পায়ে হাঁটা পথ, পদো হয়তো ঐ পথে ভাত নিয়ে যায়।

নদীর কি রূপ এখানে। ওপার দেখা যায় না। জোয়ার এলে নদীর বাঁক মস্ত এক সাগর হয়ে থাকে; তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই। জল ফুলে ফেঁপে গুম-গুম্ করে পাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। ফেণ ওড়ে; এই ঘর থেকে দেখা যায়। ঠানদিদি আশ্চর্য সব গল্প বলে। সেকালের জলদস্যুদের কিংবদন্তী। ঠাকুর-দেবতায় বেজায় বিশ্বাস; যেমন ভক্তি ফিরিঙ্গি কালীর প্রতি, তেমনি ভক্তি মারিয়া-মায়ের প্রতি। খৃশ্চান হিন্দু তফাৎ বোঝে না। আকাশের সব তারা নক্ষত্র চেনে, এদিককার ইতিহাস ওর নখাগ্রে। অথচ পরীদের গল্পে গভীর বিশ্বাস। নাকি পূর্ব পুরুষরা এখানে টিকতে না পেরে বঙ্গোপসাগরের বুকে একটা সুন্দর দ্বীপে রাজ্য পত্তন করেছিল।

বুড়ি-ই নাকি তার একমাত্র ওয়ারিশ। ওকে নিতে তাই চোদ্দ-ডিঙা আসবে। যে কোনো দিন। বুড়ি তৈরি। পা বাড়িয়ে আছে। তাই রোজ রাতে নিরাপদের সাদা বাতি দেয়। বিপদ দেখলে লাল বাতি দেবে; অমনি নৌকো ফিরে যাবে। আবার যখন ভালো সময় আসবে ওকে নিতে আসবে। জিনিসপত্র তৈরি, নৌকোয় তুলতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না।

শুনলেও কষ্ট হয়। কোনো মৎলবী লোক নিশ্চয় ওকে এসব বুঝিয়েছে ওখান থেকে সরাবার জন্য। হয়তো কিছু দেখে থাকবে বুড়ি। 'ফিলিস' জাহাজের অদৃশ্য সোনা নিশ্চয় জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ডুবুরি দিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে এই গ্রামের লোকরা অনেকেই ডুবুরির কাজ জানে, পদোর কাছে শোনা। তাদের হাতে বুড়ি পড়লে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে।
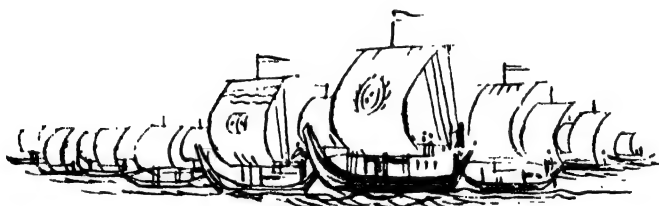
সে রাতে কারো ভালো ঘুম হল না। কখন জোয়ার এসে গুম্-গুম্ করে পাড়িতে আছড়াতে আরম্ভ করেছিল। সেই শব্দ শুনে এক ঘুম দেবার পর গুপি-পানু জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই, তাদের চক্ষুস্থির! এ কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি? বুড়ির ঘরে সাদা আলো ঝুলছে। জোয়ারের ফেণা উড়ছে আর অনেক দূর থেকে সেই উদ্দাম উজান জলের স্রোতে ভেসে আসছে সব কটি সাদা পাল তুলে চোদ্দ-ডিঙা। অথচ এই স্রোতে পালের কোনো দরকার ছিল না। ফিকে তারার আলোয় সব দেখা যাচ্ছিল, যেন পরীদের দেশের কোনো দৃশ্যের মতো। আরো অনেকটা জোয়ারের

জল পেরিয়ে তবে পাথরের আংটায় সেকাল থেকে ফিরে আসা নৌকোটাকে বাঁধা যাবে। সে জায়গাটা পাড়ির পেছনে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল কোনো কিছুই বুড়ির চোখ এড়োয়নি। সাদা লণ্ঠনের আলোয় ঠানদিদি একটা ছোট তোরঙ্গের ভারে নুয়ে পড়ে, পাড়ির পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

আর কি গুপি-পানু ঘরে থাকতে পারে। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে পড়িমরি করে ওরা ছুটল নৌকো আসা বন্ধ করে বুড়িকে বাঁচাতে। কিছু বলে যে তাকে বোঝানো যাবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিন মিনিটে বুড়ির ঘরের সামনে পৌঁছে ওরা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দু-মিনিট পরেই ঘোরানো সিঁড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা গেল মাঝ-নদীতে চোদ্দ-ডিঙা থমকে থেমে আধা অন্ধকারে ঝিমঝিম করছে।

তারপরেই জোয়ারের মাথায় চেপে অসম্ভব বেগে উজানে পাড়ি দিল। যেতে যেতে ঝপ-ঝপ করে পালগুলো পড়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের খাঁড়ি থেকে এক সারি মোটর-বোট পিছু নিল। হয়তো তাই দেখেই হাঁচড়-পাঁচড় করে চড়াই বেয়ে উঠে এসে, হতাশায় ভরা ভাঙা গলায় ঠানদিদি চেঁচিয়ে উঠল, "কে-ও ? কে-ও ? কে ওখানে ?" সে স্বর শুনে ভয় লাগে। গুপি-পানুর গায়ে কাঁটা দিল।

উত্তর দিল অন্য লোকে, চেনা গলায়, আমরা! আমরা! আমরা! পিরু তোমার দিন ফুরিয়েছে—এই রঘু, পিল্লে, জনার্দন. ধর ওকে, একজনের কম্ম নয়।" বিশ্রী একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি কোঁশ-ফোঁশানি, চাপা গর্জন, তারপর ক্লিক্ করে কার হাতে হাতকড়া লাগল। সব চুপ।

নদী-পুলিসের সেই ওস্তাদরা! সঙ্গে মিঃ সমাদ্দার, ডাঙার পথে জিপে এসেছেন সন্দেহ নেই। একটা জোরালো টর্চের আলোতে দেখা গেল বড়-ঠানদিদিকে চারজন লোক জাপ্টে ধরে রেখেছে।

ঠানদিদি রাগে ফুঁশছে, চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে হাতের পেশীগুলো নিস্ফল আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে। ঠানদিদির হাতের পেশী? ঘোমটা খসে গেছিল। একি সত্যি ঠানদিদি?

ওদের ওপর চোখ পড়তেই ঠানদিদি বলল, "ফিরে এসে তোদেরো দেখিয়ে আনতাম রে দাদা। সেখানে সবাই খেতে পায়। গরীব নেই সেখানে রে।" পানুর গলায় ব্যথা করতে লাগল।

তারি মধ্যে মেজদাদু চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিরু! পিরু না? তোর সঙ্গে গাছে চড়িনি? ওরে পিরু, তুই তাহলে বেঁচে আছিস্! তাহলে তোর যমজ বোন ঠানদিদি কোথায় গেল?"

পিরু মুখ তুলে বলল, "মারিয়া-মা তাকে তুলে নিয়েছেন। শেষটা তুমি লাল বাতি দেখিয়ে আমাকে ডোবালে, দাদা।" মেজদাদু ওর কাছে এসে বললেন, "না, না, নারে! তুই নিজেই লাল সংকেত দিয়ে তাদের সাবধান করে দিলি! বড় ঠানদিদি মরেনি। সে মলে চোদ্দ ডিঙা কে চালাচ্ছে? দু মিনিটে অত পাল কে নামাল?" পিরু তখন হাত-কড়া লাগানো দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। "বিশ্বাস কর, আমিও লাল-বাতি দেখাইনি! নিশ্চয় মারিয়া-মা দিয়েছেন।

এমন সময় গুপির কানের কাছে কে বলল, "ইয়ে, কিছু খাবার-দাবার আছে?" গুপি পকেট থেকে এক মুঠো কাজু-বাদাম বের করে ছোটমামার হাতে দিয়ে বলল, "এত সর্বনাশের পেছনে যে তুমি আছ, সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল।"

আরো পরে নদী পুলিশের জিপে করে তাদের লোকদের সঙ্গে পিরু আর মিঃ সমাদ্দার বিদায় নিলে, মেজদাদুর বাড়িতে চায়ের টেবিলে বসে ছোটমামা বললেন, "তাহলে তোমার কাছে পুলিস-গুলোকে পাঠিয়ে বুদ্ধি করেছিলাম বল। তুমি ঠিক আঁচ করেছিলে বুড়ির ঘরে সোনা লুকোনো। কি করে মনে হল?"

মেজদাদু বললেন, "আমার মনে হয়নি। গুপি পানু যেই বলল

বুড়ির বাক্সে রাঁধাবাড়ার জিনিসপত্র ঠাসা, অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল! বুড়ির থালা গেলাস পর্যন্ত এবাড়ি থেকে যায়, ওর বাক্সে তো ও-সব থাকার কথা নয়। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে পিরুকে চিনতে পারলাম না! ষাট বছর আগে একটা নৌকোকে আমরা ঐ রকম চোদ্দ-ডিঙা সাজিয়ে ছিলাম। ওপরটা ভারি হয়ে গেছিল। খালি পিরু আর ওর যমজ বোন, বড় ঠানদিদি—আশী বছরের বুড়োর সঙ্গে পাঁচ বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল, একমাস পরে বিধবা হয়েছিল, এমন ডানপিটে মেয়ে ছেড়ে দাও, ব্যাটা-ছেলেও দেখিনি—আর আমি ওটা চালাতাম। একবার ঝড়ে ভেঙে গেল! এ যেন ঠিক সেই। পিরুটা যদি শেষ বয়সে জেলে যায়! মনটা খারাপ হয়ে আছে।"

বলা বাহুল্য ঠানদিদির ঘরের বাক্স-প্যাঁটরার জিনিসের তলায় সোনাগুলো ঠাসা ছিল। সব উদ্ধার হল। সমাদ্দার কোম্পানি প্রশংসা, পুরস্কার, অনুদান সব পেল। বে-আইনী সোনা উদ্ধার করার জন্য পিরু বে-কসুর খালাস তো পেলই, উপরন্ত সরকার ঘোষিত টাকা-কড়িও পেল। তার পক্ষে একশো সাক্ষী দাঁড়িয়েছিল। সবাই মেজদাদুর চেনা, ভালো লোক।

চোদ্দ-ডিঙারো কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে তিন কিলোমিটার উজানে একটা খাঁড়ি। খাঁড়ির ধারে একটা অকেজো রকমের লম্বা মাছ-ধরার নৌকো, ডাঙার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তারি পাশে কাঠ-গুদাম; কাঠ-গুদামের মালিক এক বুড়ি। পাৎলা পাৎলা কাঠ দিয়ে সে কি সুন্দর পাল তোলা জাহাজ বানাত সে আর কি বলব। গুদোমের কাঠের সে কি যত্ন কাঠের গাদার নিচে অনেকগুলো বড় বড় ক্যাম্বিশের টুকরো পাতা থাকত। একটি মাত্র ভাই ছাড়া নিজের বলতে বুড়ির কেউ ছিল না।

এসব হল গিয়ে অনেক দিন পরের কথা। সে দিনের সকালের ঐ

চায়ের আসরে ছোটমামা বলেছিলেন, “সব ভালো যার শেষ ভালো। একটা রহস্য খালি বোঝা গেল না ঐ লাল বাতির বিপদ-সংকেতটা কে দিয়েছিল ?”

পানু মুখ হাঁ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গুপি তার কোঁকে এমনি খোঁচা দিল যে “ই—ই—ই—ক্ ” করে সে থেমে গেল।

———

প্রাপ্তিযোগ

গুপির ছোটমামা বললেন, গোপালপুর বহরমপুর এ-সব জায়গায় গেছিস্ কখনো ? একবার—

পানু বলল, হ্যাঁ, সেবার দাদুরা মুর্শিদাবাদ বহরম—,ছোটমামা হাসলেন, কীসে আর কীসে! এ সে বহরমপুর নয়। দক্ষিণ ভারতের রেল ধরে গঞ্জামের দিকে যেতে হয়। শেষ রাতে বাঁয়ে চিল্কার হ্রদ পেরিয়ে, বহরমপুরে নামতে হয়। চারদিক ভোঁ ভোঁ। ট্রেনটা ছেড়ে গেলে মনে হবে গোবি মরুভূমির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছিস। যদি কপাল ভালো থাকে এক-আধটা মেছো ট্রাক্ পেলেও পেতে পারিস। নয়তো সেই ভোরের বাস্ ছাড়া গতি নেই। আগে চল্ সেখানে, তারপর বাকিটা বলব।

এতো মহা গেরো। গুপি-পানুকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে দেখে ছোটমামা আরো বললেন, কবে আমার কোন কথাটা শুনে কার এতটুকু ক্ষতি হয়েছে তাই বল্। বরং আমার অনেক সুবিধাই হয়ে গেছে। জানিস-ই তো ছোটবেলায় অন্ধকার রাতে বাদুড়ের ডানার ঝাপটানি খেয়ে অবধি আমি আর সে-আমি নেই। তাই তোদের ডাকা। নইলে নিজেই তো পরম সুখে জীবন কাটাতে পারতাম। যাক্ গে, যার যেমন কপাল! এই বলে ছোটমামা এত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপরকার কাগজ-চাপাটা একটু সরে গেল।

পানু বলল, কোথায় থাকা হবে? ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ওমা, তোদের বুঝি আসল কথাটাই বলা হয় নি? গোপালপুরের শহরতলিতে আমার মায়ের জ্যাঠামশাইয়ের একটা টিলার মাথায় বাড়ি আছে। সেখানে আমার প্রাপ্তি-যোগ আছে।

শুনে গুপি-পানু অবাক। প্রাপ্তি-যোগ আবার কী? কীসের প্রাপ্তি? ছোটমামা রেগে গেলেন কীসের প্রাপ্তি কী করে বলব। সেটা কিছু একটা সমস্যাই নয়—। গুপি বলল এক না পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। ছোটমামা কটমট করে একবার তাকিয়ে বলে যেতে লাগলেন, এখন মুস্কিল হয়েছে যে বড়দাদু আমার মাসতুতো ভাই নাদুকেও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে আগে গিয়ে জিনিসটা খুঁজে বের করবে, প্রাপ্তি-যোগটা তার-ই হবে। অতএব আর সময় নষ্ট করা নয়, আমরা আজ-ই রাতের গাড়িতে রওনা হচ্ছি।

হল-ও তাই। পরদিন থেকেই পুজোর ছুটি, কাজেই কারো বাড়ি থেকে কোনো আপত্তির কথা উঠল না বরং এত কম খরচে এত দিনের জন্য ছেলে দুটো বাড়ি ছাড়া হচ্ছে জেনে বাড়ির সকলে যেন একটু খুশীই হল।

থার্ড ক্লাসে যাওয়া হল। যেখানে শত্রুপক্ষের প্রতিযোগিতার ভয় আছে, সেখানে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকাই ভালো। ছোট-মামা বললেন আর শুধু নাদু কেন, আরো কতজনকে ঐ কথা বলেছেন কে জানে। এককালে সারা পৃথিবী জাহাজে করে চষে বেড়িয়েছেন নানান জায়গা থেকে নানান জিনিস সংগ্রহ করেছেন। মাঝে মাঝে দেশে ফিরে, আমার মার কাছে পরম আদরে দু তিন মাস কাটিয়ে, আবার একদিন কাকেও কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গেছেন। তা মা আদর করবেন না-ই বা কেন? ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি বড়দাদুকে বেচলে ওঁর নিজের ওজনের সোনা পাওয়া যাবে। বুড়ো হয়ে অবধি গোপালপুরের ঐ টিলার মাথায়

দূরবীণ হাতে দিন কাটিয়েছেন নাকি সমুদ্রের গন্ধ না পেলে ওঁর ঘুম হয় না!

পানু বলল, এখন তিনি কোথায় আছেন? নাকি মরে গেছেন? ছোটমামা চটে কাঁই। মরবেন কেন? পঁচাশী বছর বয়স হলেই মরতে হবে, এমন কোনো আইনের কথা তো শুনিনি। আছেন আমার মায়ের কাছেই। নাতুর মা-ও কম চেষ্টা করেন নি ভাঙ্গিয়ে নিতে। তা মা ছাড়লে তবে তো যাবেন। রোজ মাসী গিয়ে তাই বড়দাতুর পায়ের কাছে বসে থাকেন, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!

পানু বলল, পায়ের কাছে কেন?

আহা, মাথার কাছটি আমার মা ছাড়লে তবে তো সেখানে বসবেন! সে যাই হক, নাতুর আগেই হয়তো আমরা গিয়ে পৌঁছব। কারণ মা কাকে দিয়ে ওর বড় সায়েবকে ধরিয়ে ওকে টুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই বলে ছোটমামা একটু মুচকি হেসে চুপ করলেন।

গুপি একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রকাশ্যে এত কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি, ছোটমামা।

ছোটমামা বললেন, আরে, তাতে হয়েছেটা কী? সে ব্যাটা এতক্ষণে হয়তো পাণ্ডুয়ার জন-পরিসংখ্যান করছে!

শেষ রাতে ওরা বহরমপুরে নামল। সেখান থেকে মাইল পনেরো ষোল দূরে সেই টিলার উপরে বাড়ি। ভাগ্য ভালো একটা মেছো লরি সত্যিই পাওয়া গেল। মাথা পিছু এক টাকা দিয়ে তাতে চেপে ওরা রওনা দিল। নামল যখন পূব আকাশ তখন ফিকে হয়ে এসেছে। কানে এল একটা শোঁ-শোঁ শব্দ। এই শব্দ না শুনলে হয়তো ছোটমামার বড়দাতুর মন খারাপ হয়।

ছোটমামা কেবলি তাড়া দেন, চল্, চল্, সবার আগে পৌঁছনো দরকার। গিয়েই খোঁজা শুরু করে দেব। একটা ইংরিজি বইও

এনেছি, তাতে গুপ্তধন পাবার একশো একান্নটা উপায় লেখা আছে। তবে একটা অসুবিধা হল যে সদর দরজার চাবি নাতুর কাছে, বড়দাতুর শোবার ঘরের চাবি আমার কাছে। এই রকম ভাগাভাগি করেছে বুড়ো। এখন ঢুকবটা কী করে তাই ভাবছি।

গুপি বলল সে আবার একটা কথা হল ছোটমামা? আমি ঢুকিয়ে দেব। যতই তাড়াতাড়ি করার দরকার হোক না কেন, এইখানে একটা শেয়ালের বাচ্চা হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে, নাক ফুলিয়ে, ছোটমামার দিকে শুঁকতে থাকাতে তিনি অমনি অঁাউ-অঁাউ শব্দ করে, হাত-পা এলিয়ে মূর্চ্ছো গেলেন। পানুর জলের বোতল থেকে মাথায় জল ছিটিয়ে, মুখে রেলের টাইমটেবলের হাওয়া দিয়েও কিছুতেই তাঁকে খাড়া করা যেত না যদি না গুপি হঠাৎ বলে বসত, এইরে আমাদের আগেই কেউ এ পথে এসেছে! গেটটা দেখছি খোলা!

বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছোটমামা হাঁচড় পাঁচড় করে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে, আঁকা-বাঁকা পথ ধরে, ওপর দিকে দৌড়তে লাগলেন। গুপি-পানুও পেছন পেছন ছুটল। ছোট টিলা, কিন্তু বড় বড় ঝাউ গাছে ঢাকা থাকাতে ওপরের দোতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল না। ওপরে উঠে ওদের চক্ষু স্থির! দরজা জানলা সব খোলা। ঘরের আসবাবপত্র তচনচ। তারি মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেরাজ টেনে, টেবিলের টানা উল্টে, দেয়ালের ছবি নামিয়ে, রান্নাঘরের বাসনপত্র বাইরে এনে ছড়াছড়ি করে দুটো লোক সে যা কাণ্ড বাধিয়েছে, তা আর কহতব্য নয়।

তার ওপর লোক দুটো সমানে পরস্পরকে যা-নয়-তাই বলে যাচ্ছে। পানু তো অবাক। আর ছোটমামা থপ্ করে সিঁড়ির ধাপে চোখ উল্টে বসে পড়লেন। গুপি বলল এ কী নাতুমামা, হাঁতুমামা, এ কী কাণ্ড? তারা তখুনি ঝগড়া থামিয়ে উঠে এল। বুড়ো বুঝি তোদেরও পাঠিয়েছে? চাঁতুমাস্টারেরও কি প্রাপ্তি-যোগ

আছে নাকি? ভালো চাস্ তো ওপরের ঘরের চাবি বের কর্, চাঁদু।

ছোটমামা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে ছুঁড়ে দিতেই, গুপি সেটা ধরে ফেলে দোতলায় চলল। ছোটমামা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। নাদু, হাঁদু চটে কাঁই। বুড়োর চালাকি দেখে বলিহরি! আমাদের দিয়ে সারা বাড়ি খুঁজিয়ে, পেয়ারের নাতি চাঁদুমাস্টারকে শোবার ঘরের চাবি দিয়েছে!

দোতলায় একটি মাত্র ঘর। গুপি তার দরজা খুলে, চারটে জানলাও খুলে দিল। ভোরের ফিকে আলোয় অমনি ঘর ভরে গেল। নাকে এল সোঁদা সোঁদা সাগরের গন্ধ. কানে এল সমুদ্রের গর্জন। ঘরে কিন্তু একটি তক্তাপোষ, কাগজপত্রে বোঝাই একটি লেখার টেবিল, তাকের উপর একটি লম্প আর একটি হাত-বাক্স খাটের পাশে একটি মোড়া আর খাটের তলায় সমুদ্রের শামুক ঝিনুক ভরা ডালাশূন্য একটা পুরনো তোরঙ্গ ছাড়া আর কিছু ছিল না আর ছিল সব জায়গায় রাশি রাশি বালি।

বালি দেখেই ছোটমামার হাঁচি উঠল। নাকে রুমাল চেপে তিনি তক্তাপোষে বসে পড়লেন। নাদুও টেবিলের কাগজপত্র মাটিতে নামিয়ে, আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। হাঁদু একটা তার দিয়ে হাত-বাক্সটা খুলে ফেলেই পেয়েছি, পেয়েছি, বড়দাদুর ভল্টের চাবি! ইউরেকা! এই বলে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে, ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

নাদু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরো কতকগুলো কাগজ এক পাশে সরিয়ে বলল, পেয়েছে না আরো কিছু! ভল্টের গয়না-গাঁটি কোন্‌কালে বুড়ো একে ওকে দান করেছে না! কিন্তু—কিন্তু এটার কথা আলাদা। এই বলে নাদুমামা একটা ছোট হলদে কাগজের কুচি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই লটারির টিকিটেই আমার প্রাপ্তিযোগ! ঘরদোর গুছিয়ে রাখিস্, চাঁদু, বুড়ো নইলে চটে গিয়ে,

উইল ছিঁড়ে ফেলে দেবে, তা হলে তুই আর বাড়িটা পাবি না! এই বলে ধীরে-সুস্থে নাছুমামাও ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে থুপথুপ করে নেমে চলে গেল। ছোটমামা হাতে-পায়ে খিল ধরে থাকবে, তাই তক্তাপোষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন, যা হয় কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে, তোরা দুজন ঘরদোর গুছিয়ে ফেলিস্। আমার বেজায় দুর্বল লাগছে।

গুপি রেগেমেগে ভাঙ্গা তোরঙ্গটাকে উল্টে ফেলল। হুড়মুড় করে শামুক ঝিনুক আর আঁসটে গন্ধে ঘর ভরে গেল। শামুকের ভিতর মরা পোকার গন্ধ। পানু সঙ্গে আনা পুঁটলি খুলে লুচি, বেগুন ভাজা, মাংসের বড়া, সন্দেশ আর ক্ষীরে বরফি বের করল। ছোটমামা অমনি উঠে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাই তুলে বললেন, নিদেন বাড়িটা যখন আমিই পাব, নাছু যেমন বলছে, তখন এটাকে তো এভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। তোরা উঠে সব গুছিয়ে ফেল। আমি শামুক-ঝিনুকগুলো তুলে রাখি।

গুপি পানুর এখানে ক'দিন থাকার মতলব। তারা তাই ছোটমামাকে চটাতে চাইল না। খুব বেশী জিনিসও ছিল না। সব যথা স্থানে তুলতে ঘণ্টা দুই লাগল। স্টোভ ছিল, তেল ছিল, চাল ডাল ছিল, মসলা ছিল। একটা কালো রোগা লোক মাত্র এক টাকায় এই বড় একটা চিংড়ি মাছ নিয়ে এসে, কেটেকুটে দিয়ে গেল। টিলার নিচে একটু দূরে ছোট্ট দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ কেনা হল। তখন ছোটমামা উঠে বললেন, যা, তোরা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আয়, আমি চিংড়ি দিয়ে খিঁচুড়ি রাঁধব।

সমুদ্রের ধারটা উঁচু-নিচু, ঢেউগুলোও তখন অনেক শান্ত। গুপি একটা খুদে সমুদ্রের ঘোড়া পেল। কুড়িয়ে নিতেই সেটা কিলবিল করে উঠল। অমনি গুপি সেটাকে ছুঁড়ে ভাঁটার জলে ফেলে দিয়ে, ধপ করে বালির উপর বসে পড়ে বলল, ছোটমামার

কপালটাই মন্দ। নাকের ডগা দিয়ে নাহুমামার, হাঁহুমামার প্রাপ্তি-যোগ ঘটে গেল আর ও-বেচারা কিচ্ছু পেল না!

পানু বলল, কিচ্ছু পেল না আবার কী? ও-বাড়িতে একটা কিষেণ-ভোগ আমের গাছ, একটা কাঁঠাল গাছ, ঝাউ গাছের শব্দ আর সমুদ্রের গন্ধ আছে। গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, আর আছে এক বাক্স বোঝাই শামুক ঝিনুক।

তাই শুনে পানু হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, গুপি, চল্, ছোটমামার প্রাপ্তি-যোগটা বোধহয় হয়ে গেল। আর কিছু না বলে পানু হনহনিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িময় ভুরভুর খিচুড়ি আর চিংড়ি মাছের গন্ধ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, পানু সটাং দোতলার ঘরে ঢুকে, শামুক-ঝিনুকের বাক্স আবার উল্টে ফেলল। আবার এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে এল। পানু বড় বড় গোল গোল কালোপানা ঝিনুক-গুলোকে আলাদা করতে লাগল। গুপি অবাক হয়ে দেখল ঝিনুকগুলো আস্ত রয়েছে। ভিতরে নিশ্চয় পোকা মরে ঘুঁটে হয়ে আছে, তারি দুর্গন্ধ।

পকেট থেকে সাত ফলা ছুরি বের করে পানু একটা ঝিনুক খুলে ফেলল। কালো পচা পোকা শুকিয়ে ঘুঁটে। তারি বুকে নিটোল একটি মুক্তো জ্বলজ্বল করছে। চল্লিশটা ঝিনুক খুলে সাঁইত্রিশটা মুক্তো পাওয়া গেল। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, কোনোটা বড়, কোনোটা সাদা, কোনোটাতে একটু গোলাপী ভাব। গুপি আর পানু পা ছড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখতে লাগল। নিচে থেকে ছোটমামার হাঁকডাকে কেউ কোনো সাড়া দিল না দেখে, শেষ পর্যন্ত ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে দরজার কাছ থেকে ঝিনুকের খোলার স্তূপ আর মুক্তোর খুদে ঢিপি দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে সত্যি করে মুচ্ছো গেলেন। গুপির ধমকেও উঠলেন না, শেষটা নিচে গিয়ে পানু স্টোভ থেকে তৈরি খিচুড়ি নামাল, আর এক ঘটি জল এনে ছোটমামার মাথায় ঢালতে বাধ্য হল। ছোটমামা চোখ খুলতে গুপি

বলল, তোমার প্রাপ্তি-যোগ হয়েছে, এই কি মুচ্ছো যাবার সময় নাকি ?

শকের চোটে ছোটমামার জিবটিব জড়িয়ে একাকার। শেষটা ঢোক গিলে বললেন, এতে কী এমন ক্ষতি হল তোদের, তাই বল ?

শেষটা মুক্তোগুলোকে রুমালে বেঁধে তক্তাপোষের তোষকের তলায় গুঁজে, কুয়োর জলে স্নান করে, ওরা খাওয়া-দাওয়া সারল। সাত দিন পরে কলকাতায় ফিরে ছোটমামা মুক্তোর পুঁটলি নিয়ে বড়দাদুকে প্রণাম করতেই, তিনি বললেন, আমাকে কেন ? ওটা তোর। বলিনি ও-বাড়িতে তোর প্রাপ্তি-যোগ আছে ?

গুপি বলল, আর নাদুমামাকে হাঁদুমামাকেও যে সেখানে পাঠালে, তাদের কী প্রাপ্তি হল ? বুড়ো বলল, কেন শিক্ষা প্রাপ্তি হল।

———

গারদপার্টি

পানুদের বাড়িতে এ-সময়ে ছোট-মামার আদৌ আসবার কথা ছিল না, তবু সকাল বেলায় উদয় হয়ে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন। বড়-মাস্টারের কাছে গুপি-পানু অঙ্ক কষছিল, মনে হল তিনি এ-বিষয়ে আগের থেকেই কিছু খবর পেয়েছিলেন। বললেন, "ঐ যে তোমাদের পাক—মাস্টার এলেন, বোধ হয় এবার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" শুনে গুপি-পানুর দু-কান খাড়া। সমস্যাটা বেশ একটু গুরুতর রকমের। কিন্তু পাক-মাস্টার আবার কি? বড়-মাস্টার হাসলেন, "তা-ও জান না, যে পাকের অর্থাৎ রান্নার ব্যাপারে ওস্তাদ, অর্থাৎ চাঁদুবাবু।"

পূজোর ছুটি সবে শুরু হয়েছে, পানুর বাবা বললেন, "ওরে আসছে বছর তোদের পরীক্ষার বছর, তোদের আবার ছুটি-ফুটি কিসের? গুপির ছোটমাসির বিয়ে, ওদের বাড়িসুদ্ধু সব তাই সিমলা যাচ্ছে। গুপি এখানে থাকবে, বড়-মাস্টার মশাইয়ের কাছে দুজন পড়াশুনো করবি। বিজ্ঞান আর সংস্কৃতের জন্য চাঁদু একজন লোক ঠিক করবে বলেছে। ওর কে বন্ধু আছে, খুব ভালো।"

তাই বোধ হয় এসেছেন ছোটমামা। তাঁরো সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্সের দু'বছরের ট্রেনিং শেষ হয়ে এল। কে জানে

পুজোর পরেই হয়তো সত্যিকার পুলিসে ঢুকে যাবেন, কিছুই বলা যায় না। গুপি মুচকি হেসে গতকাল পানুকে বলেছিল, "তার মানে বুঝলি তো? আমরাও মিনি-মাগনার পুলিস হয়ে যাব, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে।" পানু বলেছিল, "তবে ঠিক মিনি-মাগনাও নয়, দত্ত কোম্পানির ঐ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মাইক্রোস্কোপটা ওঁর প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে কেনা হবে, মনে আছে তো? অক্রুরদা বলছিলেন নিজের হাতে সরিয়ে রেখেছেন, দুশো টাকাতেই দিয়ে দেবেন। গুপি হতাশ হয়ে বলেছিল, "দিল আর কি ছোটমামা!" "কেন দেবেন না; ওর তদন্তের কাজেই প্রধানতঃ লাগানো হবে, তার উপর আমাদের বায়োলজির——. 'গু'প বলল. "ছাড়ান দে, উনিও পুলিসে ঢুকেছেন, আর আমরাও অনুবীক্ষণ কিনেছি! তুইও যেমন! দিন-রাত মোগলাই রন্ধন প্রণালী নিয়ে ডুবে আছেন।"

তারপর আজকেই ছোটমামার আগমন। একটু পরেই বাবা এসে বড় মাস্টারকে বললেন, "প্ল্যানগুলো একটু বদলাতে হচ্ছে। পানুর মায়ের তো সিমলা যাবার ইচ্ছে, বিয়ের বর ওঁর আপনার পিস্তুত ভাই। উনি গেলে আমাকেও যেতে হয়, অঢেল ছুটি পাওনাও রয়েছে। গুপি-পানুর কথা ভেবে এতদিন কথাটা তুলিনি। এখন চাঁদু বলছে দুঁদে অঙ্ক-ফিজিক্সের মাস্টার ঠিক করেছে। তবে তাঁর এক পা ভেঙেছেন, তাঁর বাড়ি গিয়ে পড়তে হবে। পাশের বাড়িতেই চাঁদু আছে। সেখানে গুপি-পানু স্বচ্ছন্দে পেয়িং-গেস্ট হতে পারবে। বড়-মাস্টারমশাই-ও তো তাঁদের চেনেন, সেখানে গিয়ে পড়িয়ে আসতে পারবেন। তাঁদের কিছু আর্থিক সুবিধা হবে, এককালে বেজায় বড়লোক ছিলেন, এখন পড়তি অবস্থা। কি বলিস্ গুপি-পানু?"

পানুর মা-ও এক গাল হাসি আর এক গোছা গরম জামা নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এরপর কোনো কথাই হতে পারে না। ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে সব পাকা করে ফেললেন। এ-বাড়িতে শুধু

রামকানাই দা চার্জে থাকবে আর সবাই সিমলা যাবে। বড় মাস্টারমশাই-ও ব্যবস্থাটায় যথেষ্ট সমর্থন করলেন। উনিও নাকি ঐ বাড়িতে থাকবেন, তাঁদের মহাপাজি ছেলেকে পড়াবেন।

পর দিনই যাওয়া। বড় মাস্টার উঠে পড়লেন, গুপি-পানু বইখাতা, কাপড়চোপড় গুছোতে লেগে গেল। ছোটমামা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বিদায় নিলেন, মনে হল মুচকি হাসছেন। গুপি পানু পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। গুপি বলল, "দেখিস্‌, এর সঙ্গে চাঁদুবাবুর লাস্ট কেস জড়িত আছে।"

পরদিন কালীঘাটের সবচাইতে পুরনো রাস্তার সব চাইতে বড় ও পুরনো বাড়ির সামনে ওদের ট্যাক্সি থামতেই, ওদের স্তম্ভিত মুখ দেখে ছোটমামা বললেন, "কি দেখছিস্‌? এক সময় এঁদের পূর্ব-পুরুষরা এ-দিককার রাজা ছিলেন, তখন এখানে রাতে বাঘ ডাকত।" একজন আধা-বয়সী ভদ্রমহিলা সদর দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "বাঘ না হক, আমি নিজের কানে এখানে শেয়াল ডাকতে শুনেছি।" ছোটমামা বললেন, "ও-সব রাখুন কাকি। খটুকাকার কোনো খবর পাওয়া গেছে?" কাকি বললেন, "কে জানে?"

বাস, অমনি গুপি-পানুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কিছু নয়, স্রেফ সারাদিন পড়াশুনোর ওপরে খটুকাকাকে খুঁজে দিতে হবে! কাকি মুখ সাদা করে বললেন, "শুধু তাই নয়, ওঁর কর্মস্থল থেকে দরোয়ান এসে বসে আছে, নাকি এখুনি ডিউটিতে যেতে হবে।" ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "দরোয়ান হবে কেন, উনি কেরানীবাবু, গরীব হলেই তাকে দরোয়ান হতে হবে? জাফরাণ আনিয়েছেন?" "কে জাফরাণ আনবে বাবা? ভজা কর্তার অম্বুরী-তামাক মাখছে। অম্বুরী তো আর পাওয়া যায় না, ঐ একটু কফির গুঁড়ো আর নস্যি দিয়ে মেখে দেওয়া হয়। অম্বুরীর সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকে না।—দরোয়ান বড় রাগমাগ করছে কিন্তু।" ছোটমামা গুপি-পানুকে সিঁড়ি দেখিয়ে

দিয়ে কাকিকে বললেন, "কি মুশ্‌কিল, দরোয়ানকে ভাগিয়ে দিলেন না কেন? কেরাণীবাবুকে তো বলাই হয়েছে আমি লোক আনতে যাচ্ছি, যেখান থেকে হোক খটুকাকাকে ধরে আনা হবে। আবার দরোয়ান কেন?"

এমন সময় একজন পাগড়ি-বাঁধা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক ভিতরের উঠোন থেকে উঠে এসে বলল, "কেনে হামি ভেগিয়ে যাব? হামি ভেগিয়ে গেলে হামার চাকরি ভি ভেগিয়ে যাবে, তখন কি আপনারা হামার বৌ-ছেলেকে খিলাবেন? খটুবাবুকে ডেকিয়ে দিন, হামি নিয়ে যাই। বড়-কর্তা রেগিয়ে ফোঁশ-ফোঁশ করছেন।"

ছোটমামাও চটে গেলেন, "কি জ্বালা, বলা হচ্ছে তাঁকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজা হচ্ছে। কেন? তোমাদের কেরাণীবাবু গিয়ে কিছু বলেননি?" লোকটা শুনে অবাক, "কে ঐ কেরাণীবাবু আছে? আমাদের কোম্পানীতে অত ঠিকাদার কেরাণী, বরগা-দার নিয়ে ঢাক পিটিয়ে কারবার করলে চলে না। কেরাণীবাবু কোই নেই হ্যায়।"

তাই শুনে ছোটমামা সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে, গুপি-পানুকে দেখে বললেন, "ওপরে গেলি না তোরা?" ওরাও ওঁর ওপরের ধাপে বসে পড়ে বলল, "শুনিই না কেন এনেছ আমাদের।"

তারপর সামনে তাকিয়ে দরোয়ানের ফ্যাকাশে মুখ দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। দরোয়ান ছোটমামাকে ঠেলে সরিয়ে, পাশে বসে পড়ে বলল, "কি হবে দাদাবাবু? আমাদের কারবারের কথা বাইরে জানাজানি হয়ে গেলেই তো সর্বনাশ।" ভয়ের চোটে বেচারি হিন্দি বাতটাত সব ভুলে গেল। ছোটমামা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দে সবাই চমকে উঠল। পাশের একটা ঘর থেকে বড় মাস্টারমশাই বেরিয়ে গিয়ে, সদর দরজা খুলে দিলেন। একজন খুব রোগা, খুব লম্বা, খুব রাগী চেহারার লোক ঢুকেই বলল, "আর কতক্ষণ অপেক্ষা

করব বলুন ? এ লোকটা আবার কোথেকে এল ? দেখুন, যদি আমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে ভয় দেখাবেন ভেবে থাকেন, সে-গুড়ে বালি। আমার নিজেরো—" দরোয়ান উঠে এসে তেরিয়া হয়ে বলল, "কেন মিছিমিছি চেল্লাচিল্লি করছেন, মামলা-বাবু ? আপনি এখানে করছেনটা কি ? এন্—এন্ কোম্পানির মামলা-বাবুর সঙ্গে আমাদের—ইয়ে—কি বলে—বারোমেসে কর্মীর সম্পর্কটা কি শুনি ?

মামলাবাবু বোধ হয় একটু হক-চকিয়ে গেলেন। তোড়ি-বেড়ি থামিয়ে, ঢোক গিলে, দু-চারবার চোখ পিট-পিট করে নরম গলায় বললেন, "অবাক করলে—!" গুপি বলল, "বলুন, বলুন, থামলেন কেন ?" দুঃখের বিষয় ঠিক সেই মুহূর্তে, উঠোনের ও-পার থেকে খনখনে গলায় কে যেন বলে উঠল, "অ মাস্টারবাবু, ভূতোর আঁক কষা হয়ে থাকলে সয়ার দুধ খেতে পাঠিয়ে দাও তো দেখি। বলতে বলতে ডিগ্‌ডিগে হট্‌কা মতো এক থান পরা আধা-বুড়ি বাটি হাতে বেরিয়ে এসে বোধহয় গুপি-পানুকে দেখে বললেন, "তোমরা বাপু এখানে এসো না, কতবার বলেছি না ? তোমাদের জ্বালায় ভূতোবাবুর লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। এই তোমাদের পষ্ট করে বলে দিলাম, পুজোর থেটারে ও রাবণ সাজতে পারবেনি। ওর পড়াশুনো নেই নাকি—"

ছোটমামা বললেন, "আহা, তুমি থামবে কি না পিসি ? এরা তোমার ঘন্টে মন্টে নয়। গুপি আমার ছোটদির ছেলে আর পানু ডালিমবৌদির নাতি। কাকে যে কি বল তার ঠিক নেই। ওরা ভূতোর সঙ্গে বড়-মাস্টারের কাছে পড়বে, অম্বিকার ছাত্র ওরা।

পিসি জিব কেটে বললেন, "অ মা ! তাই বল, আমি বলি ঘন্টে মন্টের ফুটফুটে চেহারার এ কি হাল হয়েছে, তবেই ওদের সীতে সাজা হয়ে গেল ! কিছু মনে করনি বাছারা, এখন মনে পড়ছে তোমরা খটুকে—আচ্ছা, আচ্ছা, এই চুপ করলাম।"

পিসির কথা শুনে কেরাণীবাবু আর দারোয়ান মুখ লাল করে

কাছে এগিয়ে আসতেই, ছোটমামা গলা তুলে ডেকে বললেন, "ও মাস্টারমশাই, আছেন নাকি? এদের একটু বাড়ির ঐতিহাসিক দিকটা দেখিয়ে দিন না। ও ভূতো, তুইও সঙ্গে থাকিস্।" বড় মাস্টারমশাই বোধহয় একটা মস্ত থামের পিছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিলেন, এখন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "এসো, গুপি-পানু, ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, বুঝলে, ঐ ইঁটটা দিয়ে থামে একটু ঠুকে দেখ।" ঠুকতেই অমনি থামটা ঠুং করে বেজে উঠল। গুপি পানু অবাক! বড় মাস্টারমশাই বললেন, "তা বাজবে না? আগাগোড়া পেতলের তৈরি যে। মাথার মুকুটটা দেখ, খোদাই-কাজের এমন নমুনা সহজে পাবে না। তার মানে সিরাজুদ্দৌলার সময়ে তৈরি, তখন বড়লোকরা—আমাকে কিছু বলছেন?"

পিসি বললেন, "বলছি-ই তো। বলি ভূতো কোথায়? বড়-মাস্টার অবাক্, "ভূতো কোথায় আমি কি করে বলব? ও দিককার ফুটপাথ থেকে দুটো ফরসা ছেলে সিটি দিল আর গুণধর অমনি শাঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে হাওয়া। জানলায় অমন পল্কা শিক্ লাগালে কখনো বাঁদর আটকায়? পায়ে হাতি-বাঁধা শেকল না দিলে ওকে কখনো আটকে রাখা যাবে ভেবেছেন? তার ওপর সয়া-বিনের দুধ খাওয়ানো ধরেছেন। পালাবে না তো কি করবে?"

পিসিকে উত্তর দেবার তোড়জোড় করতে দেখেই বোধহয় বড় মাস্টার গুপি-পানু ডেকে বললেন; "চল হে। ওপরে সব অদ্ভুত ব্যাপার আছে, রত্নাগার ইত্যাদি।" ছোটমামা ফিস্ফিস্ করে বললেন, "দেখা হলে ঘরে থাকিস অম্বিকার ওখানে নিয়ে যাব। পরীক্ষার আগের বছর, একদিন ও নষ্ট করা নয়।"

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেল, পিসি ডেকে বলছেন, "ও চাঁদু, ফিণিটা বলে দিবি তো?" আর ছোটমামা সে দিকে কান না দিয়ে কেরাণীবাবুকে আর দরোয়ানকে বলছেন, "দ্যাখ বাপু, মেলা খ্যাঁচখ্যাঁচ কর না। কাল সকালের মধ্যে খটুকাকাকে

পাওয়া না গেলে, হয়তো পুলিসে—”সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজন আঁৎকে উঠল। কেরাণীবাবু বললেন, আ সর্বনাশ!! ও-কথা মুখেও আনবেন না!! উনি চিরকালের মতো নিখোঁজ হয়ে গেলেও পুলিশ-পেয়াদা নয়। পুলিসে খবর দিলে কিন্তু চাকরি যাবে। তখন আর সয়াবিন খেয়ে বড়-মানুষি করতে হবে না” দারোয়ান ততক্ষণে পুরোদস্তুর বাঙালী বনে গেছে, সে বলল, “চাকরি খাবার মালিক আপনি নন্। বাবু। সে আমাদের এমপ্লয়ি, চাকরি খাবেন আমাদের বড়-কর্তা—কি ভয় দেখাচ্ছেন, মশাই!”

গুপিরা তিনজন সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল, ছোটমামা মরিয়া হয়ে উঠে বলছেন, “আহা, কি লাগালে দুজনে! ডাকব নাকি পুলিস্—!” ততক্ষণে তারা দুজন সদর দরজায় পৌঁছে গেছিল। সেখান থেকে কেরাণীবাবু ডেকে বললেন, “বেশ কাল দেখা যাবে। শুনি কর্তারা কি বলেন। “আর দারোয়ান বলল, “আপনাদের কর্তার কি মাথাব্যথা মশাই?” বাস্তবিক অদ্ভুত বাড়িটা, একটা কেল্লার মতো ব্যবস্থা, বাইরেটা চাঁচা-ছোলা কার্ণিশ টার্নিশ নেই, বেয়ে ওঠে কার সাধ্যি, পিছলামতো পলেস্তারা লাগানো। বড়-মাস্টারমশাই বললেন একবার নাকি একটা টিকটিকি পা পিছলে পড়ে গিয়ে, নিচের ফুটপাথে চার পা এলিয়ে এক ঘণ্টা শুয়ে ছিল। তারপর একটা নেড়ি কুত্তো শুঁকতে এলেই পড়ি-মরি করে রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের চায়ের দোকানের দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ল।

চায়ের দোকান বলতে পানু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে একটা ঝাকড়া-চুল মস্তানি প্যাটার্ণের ছোকরা একটা টিনের চেয়ারে বসে, সামনে এক পেয়ালা চা নিয়ে, বিড়ি ফুঁকছে, কাগজ পড়ছে আর থেকে থেকে কাগজ থেকে মুখ তুলে এ বাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বড় মাস্টারমশাইকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গেলেন ঠ্যাং-ভাঙা অম্বিকার সঙ্গে এদের পড়াশুনো

নিয়ে কথা বলতে। ছোটমামার পাত্তা নেই। বাড়িময় একটা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ভুরভুর করছে। বেজায় খিদে।

পানু চেয়ে দেখল মস্তান ছোকরা তখনো চা, বিড়ি, কাগজ নিয়ে বসে, ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে। গুপিকে বলতেই, গুপি বলল, "আর শুধু তাই নয়, পাশের বিশুদ্ধ হিন্দু কেক-রুটির দোকানের দিকে চেয়ে দ্যাখ, অবিকল এক-ই ধরনের আরেকটা লোকও চা, বিড়ি, কাগজ নিয়ে বসে আড়-চোখে এ দিকে তাকাচ্ছে। প বলল, "এর সঙ্গে যদি ঐ দুই ওস্তাদের চড় না থাকে তো কি বলেছি!" এমন সময় তিনজনের জন্য চা কচুরি আলুর ছোঁকা নিয়ে ছোটমামা ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, টেবিলের ওপর খাবার নামিয়ে, খাটের ওপর বসে বললেন, "উ—উ—য্!"

ওরা জলখাবার দেখে খুশি না হয়ে পারল না। হাত না ধুয়েই বসে পড়ে গুপি বলল, "উ—উ—য্ আবার কি ছোটমামা? ফাঁকি দিয়ে আমাদের এখানে এনেছ কি উদ্দেশ্যে, সব কথা খুলে না বললে আমরা এক্ষুণি চলে যাব।" ছোটমামা শিউরে উঠে বললেন. "বলিস্ কি! তোরা চলে গেলে খটুকাকাকে কে খুঁজে দেবে শুনি! সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের এই আমার শেষ ও চরম কেস্ তা জানিস? তোদের অসহযোগিতায় যদি ভেস্তে যায়, তাহলে তার শোচনীয় ফলাফলের জন্য তোরা দায়ী হবি তা জানিস? সমাদ্দার সার্টিফিকেট দেবে না, বাবা বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবেন আর—আর—" গুপি বলল, "আর তোমার পুলিশের চাকরি গন্! এই তো?"

ছোটমামা আঁৎকে উঠে বললেন, "শ্—শ্—শ্, ও-কথা মুখে আনবি না। এ বাড়িতে পুলিসের নাম উচ্চারণ করা বারণ। পুলিশ ডাকলেই তো এক দিনেই খটুকাকা ডিস্কাভার্ড, তা হলে আর সমাদ্দার ইন্ভেস্টিগেশন্স কেন? এসব পুলিসের কম্ম নয়, বুঝলি?"

পানু আশ্চর্য হয়ে বলল, "আপনি না পুলিসে চাকরি করবেন?"

ছোটমামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, "পুলিসে চাকরি? কে বলেছে?" বলেই কচুরি মুখে পুরে দিলেন, "খেয়ে নে, তারপর খটুকাকার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বলি।" কথা পাল্টানো আর কাকে বলে। পানু বলল, "শুধু এটুকু বলুন, পাশের বাড়িতে অম্বিকা বলে কেউ সত্যি আছে তো? আমাদের কিন্তু সত্যি কোচিং দরকার।

ছোটমামা দুচোখ কপালে তুলে বললেন, "আছেই তো, নয়তো কি আমি মিথ্যে কথা বলছি নাকি? "গুপি বলল, "তা বাপু, মাঝে মাঝে বল বৈ-কি। এই দোলের সময়—"ছোটমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা থাক্‌। দরকার না হলে আমি মিছে কথা বলেছি কেউ বলুক দেখি! এবার আসল কথা শোন। খটকাকা চার দিন নিখোঁজ। খটুকাকা কে বুঝলি তো? আমার নতুন পিসেমশায়ের ছোট ভাই। পিসেমশাই গত হলে উনিই এ-বাড়ির ওয়ারিশ, অবিশ্যি পিসিমার কিছু দাবি আছে। আগে পিসেমশাই তেজারতি করতেন, খটকাকা বসে বসে খেতেন আর এ-বড়ির পেল্লায় ছাদে ঘুড়ি উড়োতেন। তারপরেই হল মুশকিল। পিসেমশাই চোখ বুজলে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। অস্থাবর দ্রব্যাদি যা ছিল সব বেচেবুচে বছর খানেক চলল। দেখছিস তো রাজবাড়ির এই ঘরের-ই অবস্থা, দুটো তক্তাপোষ, দুটো লডঝড়ে কাঠের টেবিল, দুটো মান্ধাতার আমলের চেয়ার, তাও অম্বিকাদের বাড়ি থেকে ধার করে আনা! আর ঐ বর্মার সেগুন কাঠের বিরাট আলমারি। ওটা দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে বসানো না হলে কোন কালে সের দরে বিক্রি হয়ে যেত!

খাওয়া জোটে না এমনি অবস্থা, তার ওপর ভূতো বাবাজির থিয়েটারের শখ, ঝোঁক একবার! এমন সময় একদিন ঘোড় দৌড়ের মাঠ থেকে ফিরে খটুকাকা বললেন তাঁর ভালো মাইনের চাকরি হয়েছে। তবে ঘোরাঘুরির কাজ, অনেক সময় আট দশ মাস-ও বাইরে থাকতে হবে। তা ছাড়া খুব গোপনীয়তার ব্যাপার,

অনেক শত্রুর অনেক প্রতিযোগিতার ব্যাপার। তাই চাকরি সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু চাকরি যে ভালো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাকির সোনার তাগা মহাজনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা হল, পিসির রুদ্রাক্ষের মালা আবার সোনা দিয়ে গাঁথা হল, ভূতোকে কোন স্কুলে নেয় না, তার জন্য একজনের পর একজন বাড়ির মাস্টার রাখা হতে লাগল। বড়-মাস্টার মশাই হলেন ১১ নং। খটুকাকার মোগলাই খানার শখ, বাবুর্চিখানার তালা খোলা হল, নেপালী বাবুর্চি-ও এল। আগে কাজের তেমন চাপ ছিল না, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়িতে বসে থাকতেন, ভালো ভালো ঘুড়ি তৈরি করতেন। ছাদে গিয়ে ঘুড়ির ঘর দেখিস্ বিকেলে। তারপর হঠাৎ ডাক পড়ত, অমনি চলে যেতে হত। কয়েকমাস কোথায় ঘুরতেন ঠিক নেই, চিঠিপত্র পর্যন্ত আসত না। তারপর কাজের চাপ বেড়ে গেল, বছর চারেক থেকে খুব কম-ই বাড়ি থাকতেন। রোজগার-ও খুব বেড়ে গেছিল। এরই মধ্যে এই ব্যাপার! বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ অন্তর্ধান করেছেন। এদিকে কোম্পানির লোক এসে হুড়ো দিচ্ছে। আর কি জানিস—আমার মনে হচ্ছে উনি দু জায়গায় এক ধরনের এবং সমান গোপনীয় কাজ করেন। দু জায়গা থেকেই তাগাদা এসেছে, বোঝ অবস্থাটা। এদিকে খটুকাকার পাত্তা নেই। তোদের কাজ হল দু এক দিনের মধ্যে ওকে খুঁজে এনে দেওয়া। ব্যস্, আর কিছু না।"

গুপি বলল, "এ কি আহ্লাদ পেয়েছ ছোটমামা?" "কেন? তোদের কি আপত্তিটা থাকতে পারে বল? ঐ নেপালী বাবুর্চিকে মোড়ের চৌধুরীরা বোধ হয় ভাগিয়ে নিয়েছে। আমার অবিশ্যি সে ব্যবস্থায় আপত্তি নেই। এখন আমাকে বাবুর্চিখানার একছত্র অধিপতি বলতে পারিস। খাবার মধ্যে ভূতো আর আমরা তিনজন। কাকি পিসির হেঁসেলে খায়।"

পানু বলল, তার ওপর ভূতোও ফেরারী! ছোটমামার

ব্যাপারটার মধ্যে প্যাঁচ আছে কিন্তু, অন্য ফুটপাথের চায়ের দোকান আর বিশুদ্ধ হিন্দু কেক রুটির দোকানের দিকে তাকান। এক-ই রকম দুটো লোক এ-বাড়ির ওপর চোখ রাখছে। খটুকাকার দুই কোম্পানির গুপ্তচর না হয়ে যায় না।"

ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে "ওঁ বাঁবা! ফিক্ ব্যথাটা যে আবার চাঁগিয়ে উঠল!" বলে দুটো কচুরি এক সঙ্গে মুখে পুরে, চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। ওরা তখন কি করত বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময় পানু চেয়ে দেখল রুটির দোকানের লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং বড় মাস্টারমশাই ওদের অম্বিকাবাবুদের বাড়ি নিয়ে যেতে এলেন। ছোটমামা সুস্থ হয়ে উঠে বসে ওদের সদর দরজা পার করিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বেশ তিন-চারটে হুড়কো, ছিট্‌কিনি, শিকলি, তালাচাবি দিলেন। এত সতর্কতা কিসের জন্য ওরা ভেবেই পেল না।

অম্বিকাবাবুর ঠ্যাং প্লাস্টার করা এবং একটা ছোট টুলের ওপর তোলা। দেখাচ্ছে যেন হাতির পা। বেশ লোক মনে হল, এম্-এ পড়েন। ওরা ক্লাস লাইন থেকে টেনে উঠবে শুনে মহাখুসি। "ভালোই হল, আমারো পুরনো পড়াগুলো ঝালিয়ে নিতে পারব; কেমন ভুলে ভুলে যাচ্ছি।" ঠিক হল রোজ সকালে ও-বাড়িতে বড়-মাস্টারের কাছে পড়, বিকেলে এ-বাড়িতে চারটে থেকে সাতটা অম্বিকাবাবুর কাছে পড়া ও চা-পান। সাতটার পর বড়-মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে পড়া বেড়ানো। এই বলে বড় মাস্টার মশাই এক চোখ বুজলেন। তাতেই ওরা বুঝে নিল বেড়ানো মানেই তদন্ত।

বাড়ি ফিরবার পথে পানু জিজ্ঞাসা করল, "আর ছোটমামা এ তো তাঁবি শেষ তদন্ত। বড় মাস্টারমশাই অবাক! "তাঁর অত সময় কোথায়? বাবুর্চি তো খটুবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন অত ভালো বাবুর্চিখানাটা কেউ না আগলালে আমরা কি না খেয়ে মরে যাব? পিসির ঘরে মাছ মাংস ডিম ছেড়ে দে, পেঁয়াজ

রসুন এবং গোরুর দুধ, ঘি পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। গোরু বড় বিধর্মী। সাহেবরা খায়।"

বাড়ি ফিরে ওরা দেখে মহা কান্নাকাটি পড়ে গেছে, খটুকাকার গুণধর ছেলে ভূতো-ও নিখোঁজ। পিসি নিজে গিয়ে ঘণ্টে-মণ্টেদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে যা-নয়-তাই বলে এসেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সেখানে ভূতো নেই। পাশের বাড়ির পাকু গিয়ে ওদের কল-ঘর পর্যন্ত পরীক্ষা করে এসেছে। তবে কি ছেলেটা মাস্টারের তাড়না সইতে না পেরে কপ্পূর হয়ে উড়ে গেছে, এঁ্যা!

আরো কথা হত হয়তো, কিন্তু ছোটমামা রসুণের গন্ধ লাগা খুন্তি হাতে নিরামিষ ঘরের দরজার বিপজ্জনক রকম কাছে এসে বললেন, "খানা রেডি, আওার বিরিয়ানি আর কচ্ছপের গোস্ত! যা, চান করে আয়।"

ওরা তিনজনে কাপড়চোপড় সাবান গামছা নিয়ে মস্ত উঠোনের কোণে বিশাল চৌবাচ্চার জলে স্নান করল। পানু বলল, "চেয়ে ছাখ্, চারদিকে চারতলা উঁচু ঘর আর মধ্যিখানে উঠোন, কেমন যুদ্ধ-জেলের কথা মনে হচ্ছে না!"

গুপি বলল, "হুঁ, কিন্তু পশ্চিমদিকের একতলায় রান্নাঘর, তার ওপর চারতলা অবধি দেয়াল উঠে গেছে, তাতে একটাও জানলা নেই কেন?"

মাস্টার মশাই বললেন, "তার কারণ এটা অন্দরের উঠোন আর ঐ মহল্লায় পাইক-বরকন্দাজদের বাস ছিল। এই রান্নাবাড়ির পিঠোপিঠি ওদের রান্নাঘর। ওদিকে যাওয়া আসার পথ পিছনের গলিতে।"

ছোটমামা বাবুর্চিখানার রকের ওপর এসে দাঁড়ালেন। গুপি বলল, এমনিতে তো একটা সুরক্ষিত কেল্লার মতো। কিন্তু ছাদ থেকে দড়ি বেয়ে কেউ যদি নামে, কিম্বা একটা বিস্ফোরক ফেলে

দেয় ?" ছোটমামা শিউরে উঠলেন, "ও সব বলিস না বলছি—
"বড় মাস্টার বললেন, ওদিকের ছাদে ওঠবার সিঁড়ি নেই।"

প্রকাণ্ড খানা কামরায় মস্ত টেবিলের এক কোণে খেল ওরা। ছোটমামাও সব সাজিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে বসে বললেন, "অনেক ক্ষণ তো হল, হদিস্ পাওয়া গেল ?" মাস্টার মশাই কাষ্ঠ হেসে বললেন, "এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, চাঁদু। রাতের খানার কথা ভাবো। যার যা কাজ। তোরা দুজন খেয়ে উঠে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করবি। তারপর নিজেরা পড়বি। আমাকে দুপুরে একটু তদন্তে বেরুতে হবে। মনে হয় বর্মায় আমার যৌবনের নানান্ লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতা নিতান্ত ফেলনা নয়।" অথচ পানুর মেজকাকা বলেন বড় মাস্টার মশাই নাকি চব্বিশ পরগণার বাহিরে কখনো পা দেন নি! কে জানে। ওপরে যাবার সময় বড় মাস্টার বললেন, "মনে থাকে যেন ঠিক চারটের অম্বিকের কাছে, সাতটায় একতলায় আমার ঘরে জমায়েৎ হবি। একটু কালিঘাটের দিকে যেতে হবে, একটা নতুন কাঠের পা গড়াতে দিয়েছি, দেখিস এখন। নতুন মানেই দুশো বছরের পুরনো একটা কুর্শির পায়া কাটিয়ে ছাঁটিয়ে নিচ্ছি। তেমন কাঠ আজকাল হয় না, শক্ত যেন লোহা, হাল্কা যেন শোলা। আচ্ছা, চলি।"

ওরা সাতটায় পর বড় মাস্টারের ঘরে গিয়ে দেখে তিনি রেডি।

ঘেরাটোপ দেওয়া কালো রঙ করা খুদে একটা টিনের চারকোণা লণ্ঠন পানুর হাতে দিয়ে বড় মাস্টার বললেন, "এটা হাতে নে, এর মধ্যে বাতি ছাড়া হাতিয়ার-ও আছে। কাজে লাগতে পারে।"

গুপি বলল, "স্যার, ঐ নেপালী বাবুর্চিটা এসে বাবুর্চিখানার তাক থেকে খুদে তন্দুরি চেয়ে নিয়ে গেল, ওটা নাকি ওর। কোথায় চাকরি পেয়েছে, ওটা নাকি দরকার। সন্দেহজনক না ?" বড় মাস্টার চমকে উঠলেন, "ওকে যেতে দিলি কেন ? ব্যাটাকে জেরা করলে

হয়তো অনেক কিছু ফাঁস করে দিত। খটুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকত, যদিও ট্যুরে যাবার সময় তিনি কাউকে নিতেন না।"

পান্নু বলল, আটকাব কি করে? পিসিমা বললে 'ওর জিনিস ও নিয়ে যাবে না তো কি? বড় ভালো লোকটা, ওর যত্নে খটুর কেমন চেক্‌নাই চেহারা হত। আর ট্যুর থেকে ফিরত রোগা, হাড়বের করা, চোখ বসা। ছয় মাস লাগত ভালোমন্দ খেয়ে আবার চেকনাই চেহারা করতে। তবে বছরে দু একবারের বেশি ট্যুরে যেতে হত না। কখনো হয়তো সারা বছরে একবারো না। খেয়েদেয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাতেন মাসে মাসে মাইনে আসত।'

বড় মাস্টার বললেন, "হুঁ। তা ওঁর কোম্পানি কি এই দুটো লোককে পাঠিয়ে খবর দিত? এরা তো কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয়নি।"

গুপি বলল, "কেউ নাকি আসত না। বোধ হয় ঘুড়ি উড়িয়ে সঙ্কেত দিত, পান্নু বলছিল। নইলে চিঠিপত্রও নাকি আসত না' লোকও আসত না, তাহলে খটুকাকা জানতে পারতেন কি করে যে এবার ট্যুরে যেতে হবে?"

পান্নু বলল, "জানলা দিয়ে দেখলাম বাবুর্চিটা পাশের গলিতে ঢুকল। বড় মাস্টারের চেহারা বদলে গেল, চোখ ছোট হয়ে দুরবীণের চোখের মতো হয়ে গেল। বললেন, "থাক, আজ কালিঘাট গিয়ে দরকার নেই। আমি সঙ্গে না থাকলে তো আর ঠ্যাংটা পালিয়ে যাবে না। এই গলিটা পাহারা দেওয়া দরকার। তোদের কেউ চেনে না, তোরা একজন গলির মুখে, একজন একেবারে খটুবাবুর বাড়ির পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকবি, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। ওখানে একতলায় কতকগুলো দোকান ছাড়া কিছু নেই। আমি বড় রাস্তায় নজর দিই। বাবুর্চি কিম্বা ভূতো বাবাজির দেখা পেলে আস্তে করে সিটি দেব, তোরা বুঝে নিবি যে ফলো করতে হবে। একসঙ্গে যাব কিন্তু।"

ঠিক তাই হল। গলিতে আলো ছিল না, স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দেওয়া গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা ধরে গেছে, তখন সিটি শোনা গেল। গলির মোড় ঘুরে নেপালী বাবুর্চি সযত্নে একটা ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে এল। তার সঙ্গের হোঁৎকা ছেলেটাই যে ভূতো সে আর কাউকে বলে দিতে হল না। সাবধানে, ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে দুই দোকানের মাঝখানের ছোট্ট দরজাটা ওরা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। মাস্টারমশাই এসে গুপি পানুর সঙ্গে জুটে বললেন, "শ্—শ্—চুপ। ওরা বেরিয়ে যাক। তারপর আমরা ঢুকব।" পানু বলল, "যদি তালা দিয়ে যায়?" মাস্টারমশাই বললেন "লণ্ঠন এনেছি কেন? ওতে এমনি জিনিস আছে, যা দিয়ে পৃথিবীর সব তালা খোলা যায়।

একটু পরেই বাবুর্চি আর ভূতো বেরিয়ে এসে আবার তালা দিয়ে চলে গেল। বোধ হয় খবরটা পৌঁছে দিয়ে আর অপেক্ষা করল না। ওরাও গলির মোড় ঘুরেছে আর এরা তিনজনেও দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। মাস্টারমশাই বললেন, "দরজা খোলা থাক। হঠাৎ পালাবার দরকার হতে পারে।

কাঠের তৈরি সরু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওরা অবাক। দিব্যি সুন্দর করে সাজানো ছোট একটা ফ্ল্যাট। তার বসবার ঘরে একটা টেবিলে নানারকম ভোজ্য সামগ্রী সাজানো। একজন মোটাসোটা ফরসা ভদ্রলোক, কিপকুল গেঞ্জি গায়ে সবে মাত্র খেতে বসবেন, এমন সময় মুখ তুলে ওদের দেখে হাঁ! তার পরেই গুপিকে দেখে মহা খুসি, "আরে, তুমি চাঁদুর বোন খেঁদির ছেলে না? দোলের সময়ে তোমাদের বাড়িতে গেছিলাম যে। এসো, এসো, অনেক খাবার আছে—এরা কে? "গুপি ওদের পরিচয় দিতে যাবে, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল আর সেই দুই মস্তান কাষ্ঠ হেসে ঘরে ঢুকল।

বলা বাহুল্য এই সময়ে গুপি-পানুর রক্ত চন্‌মনিয়ে উঠেছিল।

নিঃসন্দেহে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় সে সব কিছুই হল না।

ওদের দেখেই খটুবাবু তেরিয়া হয়ে উঠে বললেন, "আমিই না তোদের দুজনকে দুটো কোম্পানিতে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলাম, কারণ তোরা ছাড়া কে-ই বা ঘুড়ি ওড়াতে জানত যে আমাকে সঙ্কেত দেবে? এখন আমার পিছনে ছোঁক-ছোঁক কচ্ছিস? জানিস, আমার হার্টের ব্যামোয় ধরেছে, যে-কোনো সময়ে জিব বের হয়ে চোখ উল্টে যেতে পারে? আমার পয়সায় কত খেইছিস বল দেখিনি? হ্যাঁরে গজা? হ্যাঁরে গুঁপো?"

মস্তান দুটো কেমন যেন মিইয়ে গেল। আমতা আমতা করে গজা বলল, "না, কর্তা, কোম্পানির মালিক ডেকেছে, অথচ আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সাতদিন ধরে ঘুড়ি উড়ুচ্ছি, কোন জবাব নেই।" গুঁপো বলল, "আমিও তাই, কর্তা। আমার কোম্পানির মালিক-ও যে ডেকেছে।"

খটুকাকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "বোস তোরা, আমার সঙ্গে খা। ওদের তিনজনের জন্য চাঁদু আজ খরগোশের মুর্গ মশল্লম রেঁধেছে, ওদের জন্য ভাবতে হবে না। আমার একটা প্রস্তাব আছে, শোন্।"

বড় মাস্টারমশাই একটা মোড়ায় বসে পড়লেন, গুপির ঘরের চৌকাঠে। মস্তানরা বেঞ্চি টেনে টেবিলের ধারে বসে বলল, আমরা দু ভাই যে মারা পড়ব, স্যার। জেল-বাবু না থাকলে আমাদের কাজ-ও থাকবে না।"

খটুকাকা বললেন, "কি মুশকিল, তোদের ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখন পাস দুশো, এবার থেকে পাবি এক হাজার। জেল-বাবু হয়ে যাবি। ব্যস্, পায়ের ওপর পা তুলে খাবিদাবি আর দুই কোম্পানির নামে যখনি কেস উঠবে, কাঠগড়ায় দাঁড়াবি আর দরকার হলে দু-চার-দশ মাস জেল খেটে আসবি।

তারপর আবার হয়তো এক বছর কোনো কাজ নেই, তবু মাইনে পাবি। নইলে আমি দশ বছর এই কাজ করব কেন? আবার লোভে পড়ে দুই দুই জায়গায়। এর আগে কখনো দুই কোম্পানির এক সঙ্গে কেস ওঠেনি। এবার গা-ঢাকা না দিয়ে করি কি, তাই বল। সে যাকৃগে, আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেব যে বিছানা থেকে উঠলেই সর্বনাশ। চিঠি দিয়ে আমার কাজে তোদের বহাল করিয়ে দেব। বয়স-ও হয়েছে, রিটায়ার করব না? পেনশান-টেনশান চাই না। কিছু জমিয়েছি, নিচের দোকানগুলো বসিয়েছি। কি বলিস?" খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সবাই মহা খুসি। ছোটমামার লাস্ট কেস উত্তমরূপে সমাধা হল বলে এরাও মহা খুসি।

বড় মাস্টারমশাই গুপি পানুকে বললেন, "তাহলে চল হে, আমারাই বা থেকে কি করব। ঐ তো নিখোঁজ মানুষের খোঁজ পাওয়া গেল।"

খটুবাবু বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও,আমার জিনিসপত্রগুলো হাতে হাতে নিয়ে তোমরা সবাই ও-বাড়ি চল। এখানে অম্বুরী তামাকযে পাইনে। আমার লোকটি বড় ভালো তামাক মাখে।"

গুপি বলল, "জানি, কফির গুঁড়ো আর নস্যি দিয়ে মাখতে হয়। তবেই অম্বুরী হয়।" খটুবাবু বললেন, "ঠিক তাই। নইলে কোথায় পাওয়া যাবে, শুনি?

আরো রাতে এ বাড়িতে এসে দেখা গেল, বাবুর্চিখানা অন্ধকার, ছোটমামা ডিস্যাপিয়ার্ড। তবে নেপালী বাবুর্চি আর ভূতো অনতি বিলম্বে এসে গেল। বড় মাস্টার আর গুপি-পানু পিসির ঘরে লুচি, আলুর দম, পায়েস পাটি-সাপ্টা পেট ভরে খেল। নাকি সয়া-বিনের দুধ দিয়ে তৈরি। তা হতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি।

খটুকাকা বললেন, "চাঁদু যাক্ গে, পুলিসে ঢুকুক। কিন্তু তোমরা সবাই এখানে থেকে যাও, যেমন কথা ছিল। নইলে তোমাদের

বাবারা কি মনে করবেন ? অম্বিকারো টাকা দরকার আর বাড়িতে বেশি লোক থাকলে কাণ্ড্রা রাঁধে ভালো।"

রাতে শুতে গিয়ে গুপি দেখে তার বালিশে সেপটিপিন দিয়ে একটা চিরকুট আঁটা। তাতে লেখা, "স্নেহের গুপি-পানু, বারবার তদন্ত করলে তোদের পড়ার ক্ষতি হয়। সেইজন্য আমি অনেক স্বার্থ ত্যাগ করে শিমলায় সরকারী হোটেলে রান্নাঘরের 'শেফের' চাকরি নিয়ে চলে গেলাম। অনুবীক্ষণের টাকা পিসির কাছে রেখে গেলাম। তোরা পুলিসে ঢুকলে পর সাহায্যের দরকার হলে আমাকে জানাস। ইতি। আঃ ছোটমামা।

পুঃ টাকা কিঞ্চিৎ কম পড়বে।

নন্দগুপি

গুপি আমার সেজমামার ছেলে, আমার সঙ্গে বেজায় ভাব। গত বছর পুজোর সময়টা আমরা কালীঘাটে বড়মামার বাড়িতে কাটিয়ে ছিলাম। কলকাতা শহর তৈরি হবার অনেক আগে ও-সব পাড়ার পত্তন হয়েছিল। ভাঙা সব মন্দির, ঢিপি ঢিপি ইঁট, তার মধ্যে মানুষ থাকে। বড়মামার বাড়িটাও বেজায় পুরনো, আমার অতি বৃদ্ধ বুড়ো দাদামশাইয়ের বাপের ঠাকুরদার বাবা নাকি বানিয়ে ছিলেন। সেই ইস্তক আমার মামার বাড়ির লোকরা ওখানে বাস করে আসছে। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে ওখানে, তুকতাক, যাদুমন্ত্র, ভূতপ্রেত, সাধু-সন্ন্যাসী। সবাই সে-সব কথা বিশ্বাস করে, বড় মামারাও। বিশেষ করে বড় মামার ছেলে রাম কানাইদা।

সে হায়ার সেকণ্ডারি পাস করে কোথায় কোন কারখানায় কাজ শেখে আর পাড়া চষে বেড়ায়। বাড়ির লোকে খাবার সময় ছাড়া তার টিকির ডগাটি দেখতে পায় না। কিন্তু আমরা যে দিন গেলাম রাম কানাইদা বাড়ি থেকে বেরুল না। একটু খুসি না হয়ে পারলাম না। বিকেলে জল খাবারের পর আমাদের সঙ্গে শোবার ঘরে এসে বলল, "দেখি মনিব্যাগ।"

গুপি চটে গেল। "মনিব্যাগ আবার কি? আমরা না ছোট ভাই কোথায় তুমি আমাদের কিছু দেবে, না মনিব্যাগ চাইছ!"

রামকানাইদা কাষ্ঠ হাসল।" ট্যাক গড়ের মাঠ, চাইব না তো কি? পুজোর খরচা আছে না। তোরা তো দিব্যি এখানে আমার বাবার হোটেলে দুবেলা ভাত মারবি। আবার বিকেলে তোদের জন্য লুচি হালুয়া হল! নে, বের কর। গুপি বলল, "সেটি হচ্ছে না বাপু, মানব্যাগ বড় জ্যাঠার কাছে রেখেছি। আমাদের কেনা কাটা আছে, কালীঘাট থেকে মেলা জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। রামকানাইদা বলল, "আচ্ছা দশটা টাকা দেতো।" গুপি বলল, "উঁহু!"

রামকানাইদার মুখটা কালো হয়ে গেল। "আচ্ছা, দেখা যাবে।" এই বলে সে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। টাকাটা অবিশ্যি গুপির জামার ভিতরের গোপন পকেটেই ছিল। সে কথা সে বলতে যাবে কেন? দুতিন দিন গেল। রাম কানাইদার দেখা নেই। টাকাটা খরচ করে ফেলতে পারলে বাঁচি। দশটি টাকা, গুপির পাঁচ আমার পাঁচ। ভেবেছিলাম দুদিন সিনেমা দেখব একটা পুজো বার্ষিকী কিনব আর গুপি বলছিল একটা লটারির টিকিট কিনে যদি এক লাখ টাকা পাওয়া যায়, একেকজনের ভাগে হবে পঞ্চাশ হাজার। তাই বা মন্দ কি। এখন মনে হচ্ছিল টাকাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচা যায়।

আলিপুরের দিক থেকে এলে চেতলার পুল পার হয়েই বাঁ হাতে একটা সরু গলিকে বুড়ি গঙ্গার ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যেতে দেখা যায়। তাতে ঘেঁষাঘেঁষি দুসারি অতি পুরনো বাড়ি কোনো রকমে পরস্পরকে ঠেকো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খালের দিকে থেকে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গাও আছে, সেখানকার ইঁটের গাদা দোতলার সমান উঁচু মোষগাড়ি, মোষ, কাদা। কিন্তু কোন রকমে ইঁটের গাদা পার হয়ে একবার খালের ধারে পৌঁছতে পারলেই, ব্যস আর ভাবনা নেই। চুপচাপ, নিরিবিলি, বড়দের সাধ্য নেই যে দেখতে পায়।

সেই রকম একটা জায়গার ভাঙ্গা পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে গুপি বলল, "বেশ জায়গাটা নারে? ভারি বদনাম এর।" আমি একটু অবাক হলাম। "বদনাম কেন?" "বদনাম হবে না? তাকিয়ে দেখ, ভিৎগুলো মাটির নিচে বসে গেছে। এদেশে ইংরেজরা এসে জমিদারি পত্তন করার অনেক আগে ও-গুলো তৈরি। এখানে হয় নি এমন দুর্ঘটনা নেই।"

ভাঙ্গা ঘাটের কয়েক ধাপ নিচে একটা রোগা সিড়িঙ্গে ছোকরা একটা বেজায় মোটা ছাগলের গলার দড়ি নিয়ে বসেছিল। সে ফিক্ করে একটু হেসে বলল, "হবে না দুর্ঘটনা! তখন বড় গঙ্গার ঘাটে নৌকো থেকে নেমে, এখন যেখানে বড় পোস্টাপিস সেখান থেকে দল বেঁধে, ঘোর বেঘো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাত্রীরা আসত মা-কালীর পুজো দিতে। সারতে সারতে সন্ধ্যা হয়ে যেত রাত কাটাবার আস্তনার দরকার হত। তখন এই সব বাড়িগুলোতে সামান্য খরচে আশ্রয় পাওয়া যেত। তবে ও-রকম আশ্রয়—

এই অবধি বলে ছেলেটা থেমে ছাগলকে বলল, "হেট, হেট, ওদিকে নয় দাদা। ঐ খ্যাঁদা ছেলেটা যেখানে বসেছে ওখানে গোখরোর বাসা।"

তাই শুনে আমি এক হাত লাফিয়ে উঠে সরে বসলাম। ভারি রাগ হল, "তুমি তো বেশ লোক হে! এতক্ষণ বসে আছি কিচ্ছু বলনি, আর যেই তোমার পেয়ারের ছাগল এদিকে এসেছে অমনি বলছ গোখরোর বাসা! আমাকে যদি কামড়াত?"

ছেলেটা একটা খড় চিবুতে চিবুতে বলল, "কামড়াবে কেন? তবে ছোবল মারতে পারত। তাতেই বা কি এমন হত? হয়তো

তোমার মাথা ঘুরত, হাত-পা ঝিম-ঝিম করত, মুখ দিয়ে ফেনা উঠত, চোখ উল্টে যেত। তার বেশি কি-ই বা এমন হতে পারত? হ্যাঁ, মুখটা নীল হয়ে যেত বোধ হয়। কিন্তু তোমার বন্ধু যদি তক্ষুণি আমার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিত, আমি ছুটে গিয়ে ভণ্ড

গোঁসাইকে ডেকে আনতাম। তিনি একটা ফুঁ দিলেই তুমি চোখ রগড়ে উঠে বসতে। কি আর এমন ক্ষতি হত, তাই বল।"

গুপি এতক্ষণ হাঁ করে ওর কথা শুনছিল। এবার বলল, "তা হলে ছাগলের জন্যই বা অত ভাবনা কিসের? তাকেও তো ভণ্ড গোঁসাই ফুঁ দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতেন।"

ছেলেটা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "তা হয় না। আমার টাকাও নেই। তাছাড়া ওর উপর গোঁসাইয়ের রাগ আছে। নইলে উকাল না হয়ে ও ছাগলই বা হবে কেন?" এই বলে সে ফোঁৎ ফোঁৎ করে খানিকটা কেঁদে নিল।

আমরা বেজায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হাফ প্যান্টের পায়া দিয়ে নাক মুছে ছেলেটা বলল, "কামিখ্যে পাহাড়ের নাম শুনেছ? সেখানে সহজে কেউ রাত কাটাতে চায় না। কাটালে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ছাগল হয়ে যায়। গোঁসাই হলেন গিয়ে কামিখ্যের পাণ্ডা। ইঁটের গাদার ওপরে ঐ পোড়া বাড়িতে ওঁর আস্তানা। পয়সাওলা লোক, পাঁঠার মস্ত ব্যবসা। আর—আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আজকাল পাঁঠার বড্ড দাম।"

আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, "তবে কি—তবে কি—ছেলেটা চোখ কটমট করে, ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলল, "শ্—শ্—শ্—চুপ। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, কানাঘুঁষো সবই ওঁর কানে পৌঁছয়।"

তারপর উঠে ছাগলটাকে বলল, "চল, দাদা, আর দুঃখ করে কি হবে। দশ টাকা না পেলে তো গোঁসাই তোমার রূপ বদলাবে না।" তাই শুনে ছাগলটাও মহা ব্যা-ব্যা করতে করতে, আমার কান চেবানো ছেড়ে দিয়ে, উঠে পড়ল।

চলেই যেত ছোকরা, গুপি আবার ওর গেঞ্জি ধরে টেনে বলল, "ভয় কিসের? খুলেই বল না।"

ছেলেটা ইদিক-উদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "ও ছাগল নয়।" ছাগল নয়? বলে কি ছোকরা, দিব্যি আমার পকেট

চেবাচ্ছে! চারটে দো-ভাগা খুর, বেঁড়ে ল্যাজ, ঝুলো কান, কেমন যেন গন্ধটা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে! ছেলেটা বলল, ছাগল বনে গেলে শুধু কি চেহারাটাই ছাগুলে হয় ভেবেছ? মনেও ছাগুলে ভাব ধরে। এই দাদা, ওকি হচ্ছে!" এই বলে ছাগলের দড়ি ধরে টেনে সরিয়ে নিল। বাস্তবিক ভালো করে দেখতে দেখতে ছাগলের মুখের সঙ্গে ছেলেটার একটু আদল আছে মনে হল।

"কিন্তু—কিন্তু—?"

ছেলেটা বলল, "আবার কিন্তু কি এর মধ্যে? স্রেফ কথা হল দাদা গোঁসাইয়ের বেজায় ভক্ত। কারো বারণ শুনল না, ঠাকুমার 'বিছেহার, বাবার সোনার ঘড়ি, নিজের পৈতের সোনার বোতাম, সব নিয়ে গুরুর সঙ্গে কেটে পড়ল।' নাকি তীর্থে যাচ্ছে। ছয় মাস পরে গোঁসাই ঐ ছাগলকে দিয়ে গেলেন, বললেন নাকি হাজার বারণ করা সত্ত্বেও দাদা কামিখ্যেতে রাত কাটাল। সকালে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, শুধু ঐ ছাগলটি ব্যা ব্যা করতে করতে যখন ওঁদের সঙ্গে পাণ্ডুঘাট অবধি হেঁটে এল, তখন আসল ব্যাপার বুঝতে কারো বাকি রইল না।" গুপি বলল, "ওকে আবার মানুষ করা যায় না?"

ছেলেটা বলল, "এতক্ষণ সেই কথাই বলছি। দশ টাকা খরচ লাগে। সে আমি কোথায় পাব? বাবা দেবেন না, বলছে ঐ ছাগলই ভালো।"

"আর ঠাকুমা?" "তিনি আরো খারাপ। বলছেন সের দরে গোঁসাইয়ের কাছে বেচে দিতে। উঃ!" ছাগলটাও তাই শুনে আকাশ পানে এমনি বেজায় ব্যা—ব্যা করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত গুপি পকেট থেকে দশটাকার নোটটা বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, "যা চলে।" ছেলেটা কৃতজ্ঞতায় ভেঙ্গে পড়ল। "দাও, দাও, চাট্টি পায়ের ধুলো দাও, বাপ। কাল সন্ধ্যে নাগাদ ঐ আমাদের তেরো নম্বরের বাড়িতে খোঁজ নিলে, সুখবর পাবে।

তারপর কাঁদোকাঁদো মুখ করে ছেলেটা বলল, "ভাই, গত চারশো বছরের মধ্যে আমাদের বাড়িতে একটাও ভালো কাজ হয়নি। তোমাদের দয়ায় এবার হবে।" এই বলে ছাগল টানতে টানতে বোঁ দৌড় দিল। ছাগলটাও আনন্দের চোটে ব্যা—ব্যা করতে করতে বেজায় ছুটতে লাগল।

গুপি বলল, "আহা, হাজার মন্দ লোক হক, এদ্দিন পরে মুক্তির আশা পেয়েছে, হবে না ফুর্তি! দশ টাকা দিয়ে এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারত!"

সে দিন রাতে রামকানাইদার দেখা পেলাম না। পরদিন ভোরে আমরা উঠবার আগেই হয়তো কারখানায় চলে গেছিল। মোট কথা দেখা পাই নি। ওর হাত থেকে টাকাটা বাঁচাতে পেরে দুজনেই খুব খুসি। তবু মাঝে মাঝে—যাক গে।

সন্ধ্যেবেলায় তেরো নম্বরের বাড়িতে সদর দরজায় টোকা দিতেই এক রুদ্রমূর্তি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাও হে ছোকরা? নাদু ভাদু বাড়ি নেই, নৌকো করে তারা পাঁঠাভাতি করতে গেছে, রামকানাই রাস্কেলের সঙ্গে। এখন যাও আমার মন মেজাজ ভালো নেই। নেদো হতভাগা কোত্থেকে দশটা টাকা জুটিয়েছে, তাই দিয়ে নৌকো ভাড়া করেছে। ও কি হল?"

গুপি বলল, "যা চ্চলে।"

———

নাকি রাতে পৌঁছলেই ভালো, যাতে কেউ দেখতে না পায়। যাওয়াও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়; প্রথমে লড়ঝড়ে বাস, তারপর নৌকো। সে যা নৌকো সে আর কহতব্য নয়। তবে বলা পয়সার ব্যবস্থা, অন্য লোকে সব ঝামেলা পোয়াচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ভালো; কাজেই কিছু বলা উচিত নয়। তবে খালেতে নদীতে কুমীর নাকি থিক থিক করছে।

ব্যবস্থা তো যথা সম্ভব ভালো হবেই, কারণ যারা সে সব করছে তাদেরি গরজ। তবু বড় বেশি সরু খাল দিয়ে নৌকো তিনটে চলেছিল। থেকে থেকে জলে ঝপাং করে কিছু পড়ছিল। নাকি বেশ গভীর; পলেই হয়ে গেল। দু পাশের গাছগুলোর ডালে ডালে ছোঁয় আর কি। যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। ছোটমামা শেষ অবধি থাকতে না পেরে বললেন 'বাবাঃ, গা শিরশির করে।' পাশের লম্বা-চুল পান-খাওয়া ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'তা করবে না, এটা যে ইতিহাসের শ্মশান।' তার পাশের লোকটা বলল, 'কিম্বা আশা-ভরসার গোরস্থান' এখান থেকে গঙ্গা-সাগর অবধি কম করে ২৪১টা জাহাজ ডুবির লিখিত প্রমাণ আছে।'

ছোটমামার অপিসের চৌধুরী সাহস দিয়ে বলল, 'ও কিছু না, আগে এ-সব জায়গায় নরবলি হত। আগের ঘাটটার নাম নৃমুণ্ডের ঘাট।' চৌধুরীর ওপাশে ছোটমামাদের মক্কেল বটুকবাবু বললেন,

'আর বাঘের পেটেই কি কম গেছে।' মক্কেল চৌধুরীকে চেনে না। ওদের আপিসের কেউ অন্য কারো মক্কেল চেনে না। ছোটমামা একটু রাগরাগ ভাব করে বললেন, 'দিনের বেলা এলেই হত। এরকম রহস্য জনক ভাবে আসার মানেটা কি? ই-ইক!' লম্বা মতো কি একটা ফোঁস শব্দ করে ছোটমামার প্রায় গা ঘেঁসে জলের উপর দিয়ে ছুটে গেল। লম্বা-চুল বলল, ভয় পেলেন নাকি? ও কিছু না, ও নোনা জলের ভোঁদড়, মাছ খেয়ে ওদের পেট ভরে না, বড় জানোয়ারও খায়।'

পারলে ছোটমামা হয়তো নৃমুণ্ডের ঘাটেই নেমে যান আর কি। বটুক বাবু শাঁসালো মক্কেল, তাঁকে অবিশ্যি চটালে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের কর্তা এবং মালিক মিঃ সমদ্দার কি করতে কি করে বসবেন। ছোটমামার চাকরী রাখা দরকার, দুবছর পুরো হলে, সার্টিফিকেট পাবেন, তখন সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে ঢুকবেন।

নৌকোতে আরেকজনও ছিল, যে একটাও কথা না বলে নাক অবধি কাশী সিল্কের চাদরে জড়িয়ে পানুর গা ঘেঁসে বসেছিল। নাকি চৌধুরীর কে হয়, পিলুদা নাম, তবে তার সঙ্গে কথা বলতে চৌধুরী মানা করে দিয়েছেন। সে লোকটা গুপির কানে কানে বলল, 'কেয়ার-ফুল। বটুক একটি ঘুঘু! কিছু ফাঁস না করাই ভালো।' শুনে গুপি হাঁ, পুজোর ক দিন আমোদ করতে এসেছে, ঝুমুরদহের আশে পাশের দশ বারোটা বনগ্রাম নিয়ে পাঁচ বছর অন্তর এ অঞ্চলে একবার করে গিরীশচন্দ্র নাট্য প্রতিযোগিতা হয়। সে এক এলাহি ব্যাপার। নিয়ম কানুন খুব সহজ। এই অঞ্চলে পাঁচ-পুরুষের বাসিন্দা হওয়া চাই আর একই লেখা নাটক সবাইকে করতে হবে। এ বছর নাকি এ-অঞ্চলের নাম-করা ব্যবসাদার ফটিক সরকারের 'রাবণবধ, পালা হবে। এক মাস আগে থাকতে 'হিট' শুরু হয়েছে, ফাইনেল হবে বিজয়ার পরদিন। শেষ প্রতিযোগিতা ঝুমুরদহের সঙ্গে কালিয়াগ্রাম এক দিনেই দুবার নাটক হবে, একই বিচারক মণ্ডলী বিচার করছেন।

তাঁদের সঙ্গে শুধু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পছন্দ করা বাইরের দুজন প্রধান বিচারক ফাইনেলে থাকবেন ছোট মামাদের বস ঝুমুরদহের স্বার্থরক্ষার জন্য ছোটমামাকে আর কালিয়াগ্রামের জন্য চৌধুরীকে আলাদাভাবে পাঠিয়েছেন। আলাদা বলা হল এইজন্য যে বটুকবাবু যে ছোটমামকে এনেছেন সেটা পিলুদা জানে না, আবার পিলুদা যে চৌধুরীকে এনেছেন সেটা বটুকবাবু জানেন না, দুজনেই সমাদ্দারের মক্কেল। সমাদ্দার বলে দিয়েছেন যেন উভয় দিক রক্ষা হয়। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় গুপি পানুর কেউ বুঝতে পারছিল না। তবে হ্যাঁ উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদক পাইয়ে দেওয়া একটু শক্ত।

নমুণ্ডের ঘাটে চৌধুরা পিলুদা আর গুপি নেমে যেতেই বটুকবাবু পা মেলে দিতে দিতে বলল, 'বাবা, এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও ব্যাটা থাকতে একটা কথা বলতে পারছিলাম না। বুঝলেন চাঁদুবাবু, আমি টিকটিকি এনেছি খবরদার ফাঁস করবেন না। সমাদ্দার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সব সমস্যার সমাধান করেন আপনারা। যেমন করে পারেন ঝুমুরদহকে গিরীশ পদকটা পাইয়ে দিতে হবে। গতবার কালিয়াগ্রাম পেয়েছিল সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। জানেন মুরলীর মেয়ের বিয়েতে ঝুমুরদহের লোকদের আলাদা বসিয়ে ছিল।' ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার মশাই, খুলে বলুন তো।, 'কি আবার ব্যাপার—ঝুমুরদহের যে লোকটা রাণী সাজে তার তুলনা হয় না, কিন্তু রামটা ক্যাবলার এক শেষ, খালি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচায়, অথচ ওর বাবা পূজো কমিটির চাঁই।' ছোট মামার কানদুটো অমনি খরগোশের কানের মতো খাড়া হয়ে উঠল। 'আর কালিয়াগ্রামের দল?' বটুকবাবু হাসলেন, 'ওদের রাম ভালো হতে পারে, কিন্তু রাবণটা যেন ভাঙ খায়, সদাই ঝিমুচ্ছে।' 'আর হনুমানরা?' প্রশ্ন শুনে বটুক অবাক হলেও, পানু খাড়া হয়ে উঠে বসল। ব্যস্, আর ভয় নেই, ছোটমামার বুদ্ধি খুলেছে। বটুক বাবু বললেন হনুমানই নাকি ভালো। আরে সবাই তো একই

গাঁয়ের ছেলে। নৃমুণ্ড-ঘাট হাইস্কুলে সবাই পড়ে; ওদের হেডমাস্টার আগে অ্যাকটর ছিল, সে-ই শেখায়। কিন্তু গাঁয়ের নিজের দল নেই। মোড়লের গুরুর বারণ আছে। তার ছেলে বখে যাবার ভয়।

এই অবধি শুনে ছোটমামা নোট বুকে কিছু লিখে রাখলেন। উত্তেজনায় পানুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। বটুকবাবু বললেন 'আপনার পরিচয়টা দাদা ঐ পিলু হতভাগাকে দেবেন না। ও ব্যাটা ক্যায়সা চালাক দেখলেন? কোত্থেকে এক ছুঁচো মুখো ধরে এনেছে দেখলেন? ভাবছে বুঝি সার্ট পেন্টেলুন পরালেই শেয়াল চেনা যাবে না! ছোট ছেলেটাকে পর্যন্ত দলে ভিড়িয়েছে, ওকে দিয়ে দুষ্কর্ম করাবে নিশ্চয়ই।' পানু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ছোটমামার চিমটি খেয়ে 'উঃফ' বলে থেমে গেল।

বটুকবাবু বললেন, 'কি হল?' তারপর নৌকোর ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে পানুকে ভালো করে দেখে নিয়ে, খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক হয়েছে। আপনার ভাগ্নেটির কি রকম কাঁচপানা মুখ, ওকে দিয়েই কাজ হাঁসিল করতে হবে।' ছোটমামা বললেন, 'শ্-শ্ লণ্ঠনেরও কান আছে! ওসব কথা পরে হবে।'

একটা ভালো যে নৌকোর ঘাট থেকে বটুকবাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। আম জাম সুঁদরি গাছের বনের মাঝে একটা কোঠা বাড়ি বাকি টিনের চালের পাকা ঘর। আগুনের ভয়ে এদিকে কেউ নাকি খড়ের চাল করে না। ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি,এ-সব জল-ঝড়ের দেশেও দাবানল হয় নাকি?' বটুকবাবু নাক দিয়ে ফোঁস শব্দ করে বললেন, "দাবানল কেন হবে? স্বহস্ত-প্রস্তুত আগুন মশাই, এই নাটকের ব্যাপার নিয়েই যেমন হতে পারত। কালিয়া গ্রামের এমনি আস্পর্ধা যে অত ভালো রামটাকে আগে থাকতেই, বাগিয়ে নিল। ওদের যদি একদিন'—ছোটমামা ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললেন, 'শ্-শ্ অত উত্তেজিত হবেন না। সে এতক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে।' বটুকবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছো গেলেন।

সুখের বিষয় ততক্ষণে দালানের দোর গোড়ায় এসে গেছিলেন, কাজেই তখুনি উঠেও পড়লেন। উঠেই ছোটমামার পায়ের বুড়ো আঙুলের জায়গাতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। লাগল কিনা কে জানে। ছোটমামা বললেন, 'সমাদ্দার সাহেবের পরিকল্পনাতে কোন খুঁত থাকে না, মশাই। আপনারা গিরীশ পদক না পেলেই আশ্চর্য হব। কিন্তু এখন মুখে চাবি! সমাদ্দারের চররা ইতিমধ্যে কাজে লেগে গেছে'। মশালের আলোতে কুয়োর ধারে ঠাণ্ডা জলে স্নান, এই মুস্কো চেহারায় দুটো লোক গায়ের ওপর হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। তারপর চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া এক বাটি করে ঘন দুধ খাওয়া। বটুকবাবু বললেন সূর্যাস্তের পর চা খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ওদের জন্য আলাদা একটা সুন্দর ঘর দেওয়া হয়েছিল, বাঁশের দেয়াল লাল টালির ছাদ। রাতে খাবার আগে সেখানে বটুকবাবু আর সেই লম্বা-চুল পান খাওয়া ছোকরা, তার নাম বেন্দা, আর তার পাশের কালো লোকটা, তার নাম কেষ্ট, এরা সবাই এল। এরা নাকি নাটক করবে। অমনি ওরা নাটকের পার্ট বলতে আরম্ভ করে দিল! সে কি ভালো অ্যাক্টিং, পানু শুনে অবাক। একশোবার মহড়া দিয়ে আর একই নাটক শুনে সব পার্ট সবার মুখস্থ। হঠাৎ বটুকবাবু সোনার চেন ঘড়ি দেখে দেখে বললেন, 'ন'টা বেজে গেছে এ্যাঁ!' পদু এল না কেন?'

ঠিক সেই সময় হুটি পড়ি করতে করতে ছুটে এসে একটা বেঁটে মোটা লোক সেখানে আছড়ে পড়ল, তার বুকটা হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে, বড়কর্তা, পদুকে পাওয়া যাচ্ছে না।' পানু উঠে এসে বলল, 'বাঘে নিল বুঝি?' সে লোকটা রেগে গেল, বাঘে নিবে কি! কাগজ পড় না? মাত্র সাতচল্লিশটা বাঘ বাকি আছে, তাদের অনেকেই নিরামিষ খায়, এই হরিণ টরিন। বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্করে নিয়েছে।'

বটুকবাবুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। 'কি হবে মশাই? সর্বনাশ

হয়ে গেল যে।' ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই। রাত হয়েছে, খিদে পেয়েছে।' 'কিন্তু--কিন্তু—গিরীশ পদক—' 'এতে কোনো কিন্তু কিন্তু নেই! বলছি তো গিরীশপদক পেয়ে যাবেন। গোলমাল করে সব পণ্ড করবেন না।'

দিব্যি খাওয়া হল। আটার লুচি, বেগুন ভাজা, পাঁঠার কালিয়া কুল্কুমের চাটনি, পায়েস। খেয়েই ঘরে এসে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ছোটমামা শুয়ে পড়লেন। ঘুমোবার আগে শুধু বললেন, 'চৌধুরী, গুপি এদের আমরা চিনি না, মনে থাকে যেন।'

কি করে দিনগুলো কাটল পানু ভেবে পেল না। কোনো লুকোনো জায়গায় রোজ নাটকের মহড়া হত। ছোটমামা ঘরে বসে কি-সব পরামর্শ দিতেন। সকলের সে কি উত্তেজনা। কালিয়া গ্রামে কি হচ্ছে কে জানে। তাদের সেরা অভিনেতা আগেই গায়েব হয়েছে। ঝুমুরদহই বা বিনা রামে কি করছে কে জানে।

দেখতে দেখতে পূজো হয়ে গেল, সে কি ঘটা, সে কি বাজনা বাদ্যি, সে কি খাওয়া-দাওয়া, এই বড় বড় পোনা মাছের চাকলা, সে আর ভাবা যায় না। বিজয়ার দিন ঝুমুরদহের বড় বিলে ঠাকুর ভাসান হল: নদীতে খালে ভাসান দিলে জোয়ারের জলের সঙ্গে ভাসা ঠাকুর ফিরে আসে। মা ঠাকুমারা কান্নাকাটি করেন, তাই এই ব্যবস্থা।

তারপর সেই বহু-প্রত্যাশিত একাদশীর সন্ধ্যা এল। প্রায় সারা রাত নাটক হবে। সাতটা থেকে দশটা এক দলের অভিনয়! একটা মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখ দেওয়া মোটা রূপোর টাকা ছুঁড়ে ঠিক হল কারা আগে অভিনয় করবে। যেমন প্রত্যেকবার হয়ে এসেছে।

বড় চাঁদমারির মাঝে প্রকাণ্ড কানাতের নিচে অভিনয়। এক মাস ধরে কানাত পড়েছে। সব অভিনয় এখানে হয়েছে। ফুটবল খেলার মতো জোড়ায় জোড়ায় বাছাই হয়ে, এই শেষ দুটিতে

দাঁড়িয়েছে। গিরীশ ঘোষই এই ব্যবস্থা করে গেছিলেন। ফুটবলের মাঠেও তখন এ ব্যবস্থা হয় নি। কে জানে ওঁর কাছেই ওরা শিখেছিল কি না।

কালিয়াগ্রাম টসে জিতে আগে অভিনয় করল। পানু দেখল ওদের পাণ্ডাদের দলে মেনি বেড়ালের মতো মুখ করে চৌধুরী আর গুপি বসে যখন তখন মিছিমিছি হাততালি দিচ্ছে। দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। তবু স্বীকার করতেই হবে যে অভিনয় ভালো হয়েছিল। প্রত্যেকটি অ্যাকটর ভালো অভিনয় করেছিল। রাবণের জয়-জয়কার, কি তেজ, কি গর্ব, আকাশ-বাতাশ গুম-গুম করতে থাকল। মরবার সময়ও রাবণ বুকে কীল মেরে হা—হা করে হেসে মল। সকলের রক্ত টকবগ করে ফুটতে লাগল। দলে দলে লোক মেডেল পুরস্কার ইত্যাদি ঘোষণা করল। কে একটা রাম সেজেছিল কেউ চেয়েও দেখল না। তারপর যে যার আস্তানায় ফিরে গিয়ে খাওয়া। তারপর সাড়ে এগারোটায় ঝুমুরদহের দল মঞ্চে উঠল।

রাত বেড়েছে, চারিদিক থম্ থম্ করছে। উঁচু উঁচু গাছ থেকে বড় বড় ফোঁটায় হিম পড়ছে, যেন গাছরা মনের দুঃখে কাঁদছে। একই দৃশ্য, একই কথা, তবু মনে হতে লাগল যেন একেবারে নতুন একটা নাটক হচ্ছে। তার বাহাদুর রাবণ নয়, সে রাম। সে কি দুঃখ সে কি ব্যথা, সীতা হারানোর সমস্ত হতাশা দলা পাকিয়ে মেঘ হয়ে মঞ্চের ওপর জমা হয়ে রইল। দর্শকরা কেঁদে কেটে একাকার। কে রাবণ সাজল সে কথা কারো মনেও হল না পিলুদা গোড়ায় দুবার শেম বলে চ্যাচালেও শেষে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। সেই যথেষ্ট। তাছাড়া ওদের অভিনয়ের সময় বটুকবাবুও দুবার পচা টমেটো ছুঁড়েছিলেন ভুলে গেলে চলবে না। রাত আড়াইটায় নাটক শেষ হলে, চারদিকে চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই। রাবণ মরে গেছে, তবু সীতার দুঃখ ঘোচে নি, রাম কড়া কথা বলেছেন। কে কি বলবে? কার কি বলার আছে?

এমন সময় জেলা কমিটির সভাপতি নিজে উঠে চিৎকার করে ভাঙ্গা গলায় ঘোষণা করলেন, 'এ বছরের গিরীশ পদক একটির জায়গায় দুটি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পদকের খরচ সরকার বহন করবেন।' এই বলে দু-একবার চোখ নাক মুছে বসে পড়লেন। তখন সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস! বটুকবাবু পিলুদাকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করলেন! শোনা গেল ওঁরা নাকি ভায়রাভাই, অর্থাৎ ওঁদের স্ত্রীরা দুই বোন। সেই বিপুল আনন্দোল্লাসের মধ্যে সেই গায়েব হওয়া দুই অ্যাকটরের কথা লোকে ভুলেই গেল। দেখা গেল তারাও এসে চোখে মুখে কিছু কিছু রং-মাখা অবস্থাতেই বেজায় নাচানাচি করছে। তাই শুনে গুপি পানু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না। তার পর দিন সবাই বেলা দশটা অবধি ঘুমিয়ে ওঠে, কলকাতার দল ফিরবার জন্য গোছ গাছ করতে লাগল। বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি ও সহ-সভাপতি নাকি বর্ধমানে থাকেন; তাঁরা চা জলখাবার খেয়েই জেলা কমিটির মোটর বোটে চড়ে বিদায় নিলেন। বাকিরা দুপুরের ভূরি ভোজের পর আধঘুমন্ত অবস্থায় নৌকোয় উঠলেন।

স্থানীয় লোকদের তখনো অনেক কাজ বাকি, কানাত তোলানো, কর্মী বিদায়, হিসাব মেটানো ইত্যাদি, কাজেই ছোট মামা তাঁদের সঙ্গে যেতে বারণ করলেন। প্রথম নৌকোটিতে রইলেন ছোট মামা, পানু, চৌধুরী, গুপি আর ডেকরেটর কোম্পানির চারজন ভদ্রলোক। দিনের বেলা খালের অন্য চেহারা। কত বাড়ি ঘর।

একটু পরেই পানু বলল, 'আমাদের রাবণ গায়েব হয়ে কোথায় গেছিল?' চৌধুরী বলল, 'কেন, সে আমাদের রাবণ হয়েছিল। গুপি বলল, 'আর আমাদের রাম?' ছোটমামা বললেন, 'সে আমাদের রাম হয়েছিল। আর আমাদের রাম আমাদের রাবণ হয়েছিল আর তোমাদের রাবণ তোমাদের রাম হয়েছিল। হবে না কেন? সবার সব পার্ট মুখস্থ, ক্ষতিটা কি হল? সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্স

দুজনকেই গিরীশ পদক পাইয়ে দেবে বলেছিল, দিয়েছেও তাই। তবে—'

গুপি পানু এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। 'তবে কি?' চৌধুরী বলল, 'ঐ পিলুদা আর ঐ বটুকবাবু দুজনেই গোপনে যদি মিঃ সমাদ্দারকে বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি আর ওঁর শ্যালাকে সহ-সভাপতি না করত তা হলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না! যাই হক, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

———

শিমলার মতো জায়গা খুব কম-ই আছে। তা হবে না, ওখানে ইংরেজ আমলে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। এখনো তার বোল-বোলাটি কম নয়। শীতের সময় কুফ্রতে স্কি করতে যায় লোকে। ফাগু বলে একট জায়গা আছে, তার দৃশ্য ইহলোকের নয়। সেখানে ধাপে ধাপে আলুর চাষ হয়। তাছাড়া কি ভালো ভালো খাবারের দোকান। এক দিন আকাশে গোল্ডেন ঈগল দেখলাম। আবশ্যি এ গল্পটা আদপেই শিমলার বিষয় নয়, সমস্ত ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছিল শিমলা পৌঁছবার অনেক আগে।

পুজোর ছুটিতে যাচ্ছিলাম শিমলায় বড় মাসির বাড়িতে। একাই যাচ্ছিলাম। দুই রাত দেড় দিনের ওয়াস্তা, স্লিপার কোচে শোবার জায়গা রিজার্ভ করা; সঙ্গে শুকনো খাবার দাবার ও তিনটে পুজো বার্ষিকী। তার ওপর পরদিন এলাহাবাদে বড় মাসির ভাগ্নে জম্বু উঠল, এই বড় টিপিন-ক্যারিয়ার বোঝাই লুচি বেগুন ভাজা, আলুর দম, মাংসের বড়া আর প্যাঁড়া নিয়ে। জম্বুর জায়গা আমার মাথার উপরের বার্থে।

গাড়িতে উঠেই জম্বু ব্যস্ত হয়ে চারিদিক তাকিয়ে আমার কানে কানে বলল, 'চার দিকে পুলিসের চর আর গুপ্ত-গোয়েন্দা গিজগিজ করছে। সিকিউরিটি ভল্টের ডাকাতরা নাকি এই গাড়িতে মাল

পাচার করবার চেষ্টা করবে। সোনার তাল, হীরে, জহরৎ।' চেয়ে দেখলাম বাস্তবিকই গাড়ির ভেতরে, বাইরের প্ল্যাটফর্মে কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্য। একটা কিছু যে হচ্ছে সেটা স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘাবড়ে গেলাম, বাবা তিন তিনটে নতুন পুজো-বার্ষিকী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কে জানে কি হয়।

জম্বু বললে 'কে গোয়েন্দা কে আইন ভঙ্গকারী বোঝে কার বাবার সাধ্যি! শুনেছি চোর-চার চেহারা দেখেই নাকি গুপ্ত-গোয়েন্দা বিভাগে লোক নেওয়া হয়। তুই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস্। বিনু তালুকদারের কেস্, বাবা! সে নাকি একশো হাত দূর থেকে শুঁকে শুঁকে বলে দিতে পারে কে সাধু কে চোর! নিজেরা স্রেফ একটা মিনমিনে শয়তানের মতো চেহারা। কে বলবে অত বড় দুঁদে ডিটেকটিভ। আমি অবশ্যি নিজের চোখে দেখি নি তাকে। আমার খুড়তুতো ভাই গুপির কাছে শুনেছি। ওরা সবাই টিকটিকি হবে। সেই রকম চেহারাও। হয় চোরের মতো দেখতে হওয়া চাই, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতো।'

পাশের লোকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ঠিক তাই। আমিই বিনু তালুকদার। বড় শক্ত কাজে হাত দিয়েছি, তোমাদের সাহায্য চাই!' অবাক হয়ে গেলাম, এই চাষাভুষো প্যাটার্নের লোকটা সেই বিখ্যাত বিনু তালুকদার, যার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়! বেঁটে, রোগা মতো, তিন চার দিন খেউরি হয় নি, মাথায় চুল কম, আধ ময়লা সার্ট ধুতি, খাটো করে পরা খালি পা, সঙ্গে গামছা বাঁধা পুঁটলি। শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। চোর ধরতে হলে এই রকমই সাজতে হয়। কেউ সন্দেহ করবে না। অতি সহজেই কাজ হাসিল হবে।

লোকটার দুই কষ বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছিল। আমাকে বলল, 'পান খাবে?' ...... 'না' স্যার 'বাড়িতে রাগ করে।' ভ্রূকুটি করে বিনু তালুকদার ফিসফিস করে বলল, 'স্-স্ চুপ।

আমাকে নেকু বলে ডাকবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে এলাহাবাদে গুপাদের বাড়িতে কাজ করি। তিন বছর আছি তোমার পকেটে কি খলবল করে?'

কি করে টের পেল ভেবে অবাক হলাম। বললাম, 'গুলতি আর বাছাই বাছাই নুড়ি। সেগুলো ছাড়া কোথাও যাই না। কি ভালো ভালো নুড়ি, মধুপুরে গিয়ে ছোট নদী থেকে কুড়িয়েছি, চকমকি, ফটিক, আরো কত কি! ছুঁড়তে মায়া লাগে।' এক মুঠো বের করে দেখলামও। নেকু—তাকে এরই মধ্যে জম্বুদের বাড়ির তিন বছরের পুরনো চাকর নেকু বলেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম—নেকু নিজের হাতের নুড়িগুলো নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, আবার আমার পকেটে পুরে দিয়ে বলল, দিন দাদাবাবু, টিপিন ক্যারিয়ারটা; খাবার সময় হল।' এই বলে নিচে উবু হয়ে বসে পড়ল। বুঝলাম ছুঁদে টিকটিকি স্রেফ চাকর বনে গেছে।

গাড়ি অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যত লোকের যায়গা তার চাইতে অনেক বেশি লোক। যতটা চলাফেরা হওয়া উচিত, তার চাইতে অনেক বেশি চলাফেরা। বোঝা যাচ্ছিল যাত্রীদের সঙ্গে চোর টিকটিকি দুইই মিশে রয়েছে। কোনটা কে বোঝার জো নেই। আমাদের পাশে দুটো চিমড়ে লোক সরু পেণ্টেলুন আর নাইলনের সার্ট পরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এমন কি তারাও আমার নুড়িগুলো চেয়ে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখল। তাদের আমার চিনতে বাকি রইল না। যদি খুব দামী জিনিস হত, তা হলে আমার নুড়ি ফেরৎ পেয়েছিলাম আর কি!!

নেকু প্ল্যাস্টিকের প্লেটে লুচি টুচি সাজিয়ে আমাদের খুব যত্ন করে খাওয়াল। তারপর নিচে বসে বসেই নিজেও এক টুকরো খবরের কাগজে লুচি নিয়ে খেল। বাকি লুচি গুছিয়ে আবার টিপিন

ক্যারিয়ারে ভরে, বন্ধ করে ফেলল। লোকদুটো ততক্ষণ ধৈর্য হারিয়ে গাড়ির অন্য কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিনু তালুকদারের নিখুঁৎ অভিনয়। আরেকটু রাত হলে আমাদের পাশাপাশি দুটো বার্থে বিছানা পেতে দিল। কানে কানে বলল, 'ওপরে আমি শোব, চারদিকে চোখ রাখার সুবিধে হবে। মাচায় শোয়ার অভ্যাস আছে। দিল্লী পৌঁছবার আগেই আমার লোকরা খানাতাল্লাসী করবে। খবরদার কিছু ফাঁস করবে না। আমি চাকর সেজেই থাকব, যাতে চুনো পুঁটিরাও জালের ফাঁক দিয়ে পালাতে না পারে। জম্বু হঠাৎ বলল, 'খানাতাল্লাসি হবে, নেকু, তোমার টিকিট আছে তো? ও বার্থটাতো খালিই ছিল।'

নেকু চটে গেল। টিকিট? কিসের টিকিট? সরকারের গোপন তদন্ত যারা করে তাদের নেই-মানুষ বলে, তাদের আবার টিকিট কিসের? কোনো ভয় নেই দাদাবাবু, ধর পাকড় শুরু হলেই একেবারে নেই হয়ে যাব। শুধু আমার পুঁটলিটা পড়ে থাকবে, সেটাকে খুঁজলে গেঞ্জি বিড়ি আয়না চিরুণী ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। অত কাঁচা কাজ করি নি স্যার।'

গুপ্ত গোয়েন্দার ব্যাপার হলেও গাড়ি সুদ্ধ সকলের মুখে কেবল এক কথা। কবে কোন রেলগাড়িতে আইন ভঙ্গকারীরা কিভাবে কি করেছিল। ওদের কথা শুনে শুনে ভালো মানুষের মধ্যেও নানা রকম কু-মতলব গজাতে খুব দেরি হবার কথা নয়! কোন ঘোমটা পরা মেয়ে আঘাটায় নেমে গাড়ির দরজা হাট করে খুলে রাখল আর দস্যুদের দলবল গাড়িতে ঢুকে সব নিয়ে গেল। কার গয়নার বাক্সর অবিকল নকল রেখে, আসল বাক্সটি নিয়ে কে কবে হাওয়া হয়ে গেল ইত্যাদি।

খানা-তল্লাসি শুরু হল দিল্লী পৌঁছে। পুলিসে পুলিসে প্ল্যাটফর্ম ছেয়ে গেল। সব গাড়ির দরজা সীল করে সার্চ হল। আমাদের জিনিসপত্র মায় টিপিন ক্যারিয়ার পর্যন্ত খুলে দেখালাম। পকেট

থেকে গুলতি নুড়ি বের করতে যাব, সরু পেণ্টেলুনদের একজন হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ভাই, ও আমাদের দেখা, মধুপুরের ছোট নদীতে কুড়নো!' তা হলে এরাও টিকটিকি! বিনু তালুকদারের মাথা নিচু করার মানে বোঝা গেল। নিজের দলের লোকের কাছেও ধরা পড়তে চায় নি। ওস্তাদ বটে।

অন্য সরু প্যাণ্ট বলল, 'তোমাদের লোকটা কোথায়?' তাইতো বিনু, অর্থাৎ নেকু যে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে! তার বদলে একটা নতুন লোক, চোস্ত টেরি কাটা, কালো প্যাণ্ট হলদে সার্ট পরে, এক টাকায় একটা ডট পেন আর একটা ফাউণ্টেন পেন বিক্রি করছিল। কিন্তু বিনুর মতো তারও কপালে ছোট একটি কাটার দাগ।

ধরল তাকেও পুলিস। কলমের বাক্স উল্টে, পকেট ফাঁক করে, প্যাণ্ট সার্ট ঝেড়ে ঝুড়েও কিছু না পেয়ে, এক টানে মাথার পরচুলা খুলে ফেলে দিয়ে, সন্দেহজনক আচরণ করেছে বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে লাগল যেন এক্ষুনি খেয়ে ফেলবে। অথচ আমরা তো কিছুই বলি নি!

তার পরেই সেই সরু প্যাণ্টদের একজনের সঙ্গে জম্বুর খুড়তুতো ভাই গুপি এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল, ···'এই জম্বু, মা বলে দিয়েছে তোরা আজ আমাদের কাছে থেকে কাল যাবি। তোর মা লিখেছে। বিনুকাকা, এই আমার জ্যাঠতুতো ভাই জম্বু আর ওর বন্ধু নগা।'

বিনুকাকা! বলে কি ছোকরা! তবে কি—তবে কি—আর ভাবতে পারছিলাম না। গুপিদের বাড়ি পৌঁছেই বিনুকাকা আমাদের টিপিন ক্যারিয়ার খুলে লুচির তালের তলা থেকে একদলা সোনা বের করে দিলেন। আর আমার পকেটের নুড়িগুলোর মধ্যে থেকে চারটে বড় বড় অ-কাটা হীরে। অবশ্যি সে গুলোর চেয়ে আমার চকমকিগুলো অনেক ভালো দেখতে।

বিনু তালুকদার বললেন, 'বলিনি গুপি, সাধারণতঃ যারা ভালো মানুষের মতো আচরণ করে তারাই আইনভঙ্গকারী যেমন এই রঘু

ডাকাত। আর যাদের দেখে দুষ্টলোক মনে হয়, তারাই ঝুঁদে ডিটেকটিভ, যেমন আমি। কি হে নগা, টিকটিকি হবে নাকি? চোরাই মাল কোথায় লুকিয়েছে আগেই সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু তোমাদের এর মধ্যে জড়াতে চাই নি বলে কিছু বলি নি। রঘু নিশ্চয় ভেবেছিল যে ওর কাছে কিছু না পেলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। তারপর এক সময় তোমাদের কাছ থেকে ওর জিনিস উদ্ধার করা খুব শক্ত হবে না। চল সবাইকে মতি-মহলে আচ্ছুরি খাইয়ে আনি।'

তারপর দিন আমরা কালকা হয়ে শিমলা চলে গেলাম। আমিও বি এ পাশ করে টিকটিকি হব। জম্বুও হবে।

মহালয়ার আগের দিন পানুর নামে ইলশেঘাই থেকে একটা হাতে লেখা টেলিগ্রাফ এল 'কম শার্প ছোটমামা।' হাতে লেখা, মানে একটা সত্যিকার টেলিগ্রাফের ফর্মে সবুজ কালি দিয়ে হাতে লেখা, চাঁদু মামার নিজের হাতে লেখা, আর কারো লেখা অত খারাপ হতে পারে না। ঝাঁকড়া চুল ছেঁড়া সরু পেন্টেলুন পরা যে ছোকরা টেলিগ্রাফ এনেছিল, সে পানুর বাবাকে বুঝিয়ে বলল, এই ভাবেই নাকি ইলশেঘাইয়ের সব তার পাঠানো হয়, তাতে খরচা একটু বেশি পড়লেও, তাড়াতাড়ি আসে। বাস ভাড়া দু টাকা আর টিপিন এক টাকা দিলেই ও ফিরে যাবে। জবাব থাকলে ওর হাতে পাঠানো যায়, যার টেলিগ্রাফ তার কাছ থেকে সে খরচা আদায় হবে, এই রকমই ওদের নিয়ম।

পানু কিছু বলবার আগেই হাতে হাতে তিনটাকা দিয়ে বাবা ছেলেটাকে ভাগিয়ে দিলেন। সেজকাকা চটে গেলেন। 'ব্যাটার চোখ দুটো দেখেছিলে? নাকের কাছ ঘেঁসে বসানো, কানের লতি জোড়া আর তার হাতেই কি না তিনটে টাকা দিলে!' বাবা তো অবাক। 'তাতে কি হয়েছে?' 'দুষ্কৃতকারীদের ওরকম হয়।' পানু বলল, 'দাদুর তো কানের তলা জোড়া, দাদু কি'—বাবা

ধমক দিলেন, 'থাম দিকি। তা চাঁদু এখানে টেলিগ্রাফ পাঠাল কেন, নিজের ভাগ্নে গুপিকে না পাঠিয়ে?' 'ইয়ে—মানে, বোধ হয় কোনো বিপদে পড়েছেন, বাবা, কাল থেকে ছুটি আরম্ভ, আমরা যাব তো?'

বাবা ঐসবই ভালোবাসেন, বললেন, 'তা যেতে পার, তবে একা একা ঘুরবে না, তেলে ভাজা খাবে না, চাঁদুর সঙ্গে থাকবে।' শুনে বড় মাস্টার ফিক্ করে হেসে ফেললেন। 'তা থাকবেই তো, নইলে চাঁদু বাবুকে কে আরশুলার হাত থেকে রক্ষা করবে?' বাবা অবাক হয়ে তাকাতেই, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন 'মানে কে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। আমিও যেতাম, কিন্তু আমার এই কাঠের ঠ্যাংটা একটু মেরামত করে না নিলেই নয়। ও জায়গা আমার চেনা। ভারি ইনটারেস্টিং জায়গা, তিনশো বছরের পুরনো ঘরবাড়ি, ইংরেজরা এখানে আসবার বহু আগে ওখানে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। এখনো নাকি মাঝে মাঝে তাদের লুকোনো সোনা-দানা বেরিয়ে পড়ে। বজবজ ছাড়িয়ে মাইল পনেরো যেতে হয়। বাস যায়। বড় বড় গাছ, ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব কাকের চোখের মতো টলটলে জলে ভরা পুকুর তার নিচে মাছ কিলবিল করতে দেখা যায়—দেখবি সব।'

পানুকে কিছুই করতে হল না, বাবাই গুপিদের বাড়ি গিয়ে খুদে ব্যাগ সহ গুপিকে সুদ্ধ নিয়ে রাতে ফিরলেন। রামকানাইদা চেতল মাছের বড়া করেছিল, গুপিকে পায় কে!

পরদিন যখন ইলশেঘাইতে দুজনে বাস থেকে নামল তখন বেলা একটা হলেও চারদিক কেমন থমথম করছিল। জায়গাটার নাকি বড্ড বদনাম। নাকি একটাও সৎলোক বাস করে না। বড় মাস্টারের কথা। দুপুরের খাবার পানুর মা সঙ্গে দিয়েছিলেন, একটা বটগাছের নিচে বসে তার সদ্ব্যবহার করা হল। মুখে একটা মাংসের বড়া পুরে গুপি পানুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, 'সরু

'কিসের অসুবিধা ? ওনার তদন্ত তো কেল্লার মধ্যিখানে, তলায়ও বলতে পার। বরং সুবিধাই হয়েছে, খরগোশের ভয়ে উনি রেতে পালিয়ে যেতে পারেন না। জানালা দিয়ে আমাকে বহাল করেছেন তোমাদের নিয়ে আসবার জন্য, বলেছেন তোমরা আমাকে যথেষ্ট খুশি করে দেবে। তোমাদেরো অনেক কাজে লাগতে পারি, যেতে এদিকেই থাকি, শহরে খরগোশের মাংস সরবরাহ করি কি না'—গুপি বলল, 'কলকাতায় ? কোন বাজারে বল তো ?' সরু ঠ্যাং হাসল, 'ও মা! কলকেতা আবার কোথা পেলে ? সে তো বলতে গেলে বোম্বাইয়ের কাছে। শহর বলতে আমরা বুঝি বজবজ সে-ও কিছু কলকেতার চেয়ে কম বড় নয়, তার ওপর অনেক বেশি পুরনো-ও বটেক। এই যে এসে গেলাম, ঘন্টির ছিক্‌লি টানো। আমার পুল পেরুতে মানা।'

চার মানুষ উঁচু দেয়াল, ফটকটাও কম করে দশফুট তো হবেই, মোটা কাঁঠাল কাঠের ওপর লোহার পাত দিয়ে মোড়া, নিশ্চয় সেই সান পিদ্রোই বানিয়েছিল। তবে শেকল টানতে হল না, ফটকের গায়ে কাটা একটা খুদে দরজা খোলাই ছিল, ভিতরের উঠোনে ছোট মামা ব্যস্ত-সমস্তভাবে পাইচারি করছিলেন। ওদের দেখে ছুটে এসে বললেন, 'ঐ চোঙামতো জিনিসটার মধ্যে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে, তাই বেয়ে একেবারে ছাদের চুড়োর ঘরে গিয়ে বোস্‌, আমি এই চিংড়ি মাছের ঝাল-ফ্রেজিটা নামিয়ে এক্ষুনি আসছি, ধরে গেলেই কেলেঙ্কারি। দেখিস্‌ তোরা এসেছিস্‌ কেউ যেন টের না পায়।'

গুপি অবাক হয়ে বলল, 'সে কি, তুমি কি এদের বাবুর্চি বনে গেলে নাকি ? তাহলে সমাদ্দারের তদন্তটা কে করবে শুনি ?' ছোট মামা মুচকি হাসলেন, 'বাবুর্চি ছাড়া আবার কে ? এখানকার গলি-ঘুঁজি সে জানবে না তো কি আমি জানব ? এখানে জন্মেছিল, ওর আগে ওর বাবা বাবুর্চি ছিল, তার আগে তার বাবা, তিন চারশো

বছর আগে সান পিত্রোর মুর্গমুশল্লম ওর অতিবড় প্রপিতামহ রাঁধত। কিন্তু এ ব্যাটার রান্না মুখে তোলা যায় না, অগত্যা আর কি করা। যাই হক, এখন তোরা যখন এসে পড়েছিস—এই রে!' বাবুর্চিখানা থেকেই বোধ হয় ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ বেরুতেই ছোটমামা সেই চোঙা মতো জিনিসটার পাশের একটা নিচু দরজা দিয়ে ছুটে ঢুকে গেলেন। গুপিরাও চোঙায় ঢুকে, আগাগোড়া পাথরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একেবারে চার তলার ছাদের ওপরে চূড়োর নিচেকার গোল ঘরে উপস্থিত হল। অমনি মুখে ঝিরঝির করে এক ঝলক সমুদ্রের হাওয়া লাগল। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

তখন হয়তো বেলা চারটে; এ সময় কেউ যে চিংড়ি মাছের ঝাল-ফিরেজি রাঁধে পানুর সেটা জানা ছিল না। গুপি বলল, 'আহা, ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই, তেলের বাতি জ্বেলে ছোট মামা রাঁধল আর কি! শেষটা যদি কিলবিলেরা উড়ে আসে!' ঘরে একটা প্রকাণ্ড কারিকুরি করা সেগুনকাঠের তক্তাপোষ, তিনটে হাল্‌কা নেয়ারের খাট আর একটা কাঠের নিচু টেবিল ছাড়া কোনো আসবাব ছিল না। দেয়ালে অনেক কুলাঙ্গি মস্ত মস্ত জানলা, তার একটায় মান্ধাতার আমোলের এক দূরবীন বসানো। নেয়ারের খাটে দিব্যি বিছানা পাতা। তার ওপর ঝপাঝপ শুয়ে পড়ে ওরা বলল, 'আঃ! কি আরাম!'

শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে নদী তো নয় যেন সাগর! ওপার দেখা যায় না। পাথরের খাঁড়ির নিচে জোয়ারের জল আছড়ে পড়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেরুচ্ছে, যেন বিকট একটা ড্রাগন রাগে ফুঁসছে! 'এই ঘরে ছোট মামা একা শুত! আশ্চর্য!' গুপি বলল, 'না শুয়ে করে কি, বাইরে তো হিংস্র খরগোশের পাল আলু গাছ চিবুচ্ছে! তবে একা নিশ্চয় শুত না। বাবুর্চিকে আনাত, পর দিনের মেনু ঠিক করত।' এর মধ্যে ছোটমামা ঘরে ঢুকে বললেন, 'হাসছিস যে বড়? জানিস এ বাড়িতে চারশো বছর কেউ হাসেনি!'

তারপর নিজের হাঁটু চাপড়ে বললেন, 'পুরো পাঁচ দিন ধরে হয়রাণ হয়ে গেলাম, মাটির তলায় মৌচাকের মতো চোরা কুঠরি, অথচ তার একটা ঢুকবার রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না!'

পানু বলল, 'আমি পেয়েছি। কিন্তু খিদেও পেয়েছে, চা জল খাবার কোথায়?' সে কথার উত্তর না দিয়ে ছোট মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'এ্যা! পেইছিস নাকি? কোথায়?' জানলার কাছে গিয়ে পানু নিচে পাথরের ঢিপির দিকে দেখাল, 'এই দূরবীন দিয়ে দেখ। ঐ যে কচ্ছপের মতো দেখতে পাথরটার পিছনে, ওটা একটা গুহার মুখ না? ঐ না হয়ে যায় না।' দেখে ছোট মামার মুখ পাংশুপানা। 'কিন্তু—কিন্তু—ওখানে যাওয়া হবে কি করে?' গুপি বলল, 'কেন? দিনের বেলায় যেতে দোষ কি? খরগোশরা তো রাতে আসে।' ছোট মামা বিরক্ত হয়ে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ঐ পাথর বেয়ে তো নামা যায় না।' পানু বলল, 'দুষ্কৃতকারীরা নদী থেকে বমাল সমেত ঐ পথে ঢুকে চোরা কুঠরীতে লুঠের মাল রাখত। এ দিক থেকেও যাবার একটা পথ নিশ্চয় আছে, সেইটেই বের করতে হবে। ওরা নিশ্চয় প্রকাশ্যে বাইরে দিয়ে যাওয়া-আসা করত না, তাহলে নবাবের সৈনিকরা আর ওদের আস্ত রাখত না।'

ছোটমামা অবাক হয়ে গেলেন, 'নবাব? কোনো নবাবের কথা তো শুনিনি। তবে বিনু তালুকদারের বিশ্বাস বোম্বেটেদের সোনা টোনা বাজে কথা, এর ভিতরে নিশ্চয় বে-আইনী সোনা পাচারের ষড়যন্ত্র আছে। দলে ভাঙ্গন ধরেছে, এক দল লুকিয়েছে, এক দল হন্যে হয়ে খুঁজছে, তারাই সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের শরণাপন্ন হয়েছে। স্যারকে আগে থাকতেই এক হাজার টাকা দিয়েছে, সে তো আর চাট্টিখানিক কথা নয়! এদিকে—'

এই বলে বেজার মুখ করে ছোটমামা বসে রইলেন। চা জল খাবারের কথা কিছু বললেন না। শেষটা পানু আরেক বার সে কথা

তুলতেই, তেড়িয়া হয়ে উঠে বললেন, 'কেন, তোদের মারা এতদূর ছেলে পাঠিয়েছে, সঙ্গে জলখাবার দেয়নি?' গুপি রেগেমেগে পোঁটলা খুলে আলু ফুলকপির সিঙ্গাড়া আর নারকেল নাড়ু বের করে বলল, 'দিয়েছে, তবে তোমার জন্যে নয়।' এই বলে পানুর হাতে দুচারটে দিয়ে, নিজে খেতে আরম্ভ করল।

ছোটমামা বললেন, 'ঐ দেখ অমনি চটে গেল! আরে তোরা কি ঠাট্টাও বুঝিস না? তা ছাড়া এই অসময়ে খাবার দাবার বের করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। বাইরের লোকের ঐ পুল পেরুনো মানা, কেউ ঢুকলে তাকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ানো হয়'— 'খরগোশ দিয়ে খাওয়ানো হয় বল, কুকুর-টুকুর নেই। বাড়িটাতে ভালো করে খানা তল্লাসি করেছ কি? রান্না ঘরের উনুনের নিচে, শোবার ঘরের খাটের তলায় চোরা দরজা থাকতে পারে।' কোঁশ করে একটা শব্দ করে ছোটমামা বললেন, 'সব দেখা হয়েছে! দুই কর্তার পেয়ারের খানসামাদের, বুড়ি-ঠাকুমার আর বৌমাদের খাস দাসীদের প্রত্যেককে যথাসাধ্য ঘুষ দিয়ে খুঁজতে আর কিছু বাকি রাখিনি। কিচ্ছু পাইনি, মাঝখান থেকে আমার ঠ্যাংটা—, এই বলে ছোটমামা বাঁ হাঁটুতে হাত বুলুতে লাগলেন। পানু তাঁকে সিঙ্গাড়া নারকেল-নাড়ু খাওয়ালে পর তবে একটু সুস্থ হলেন।

স্থির হল ওসব কোনো কাজের কথা নয়, চোরা দরজা এক তলায় কোনো অপ্রত্যাশিত অথচ সহজে নাগাল পাওয়া যায়, এমন জায়গায় হবে! রাতে তদন্ত করতে হবে, বাড়ির মধ্যে তো আর খরগোশ নেই, ছোটমামার অত ভয়টা কিসের? ধরা পড়ার ভয়ে ওরা ঐ ঘরে সারাদিন আটক রইল, ছাদে আর অন্য ঘর ছিল না। বাড়িতেও খুব বেশি লোক আছে মনে হল না। এক কালে বড়লোক হতে পারে, এখন তাঁদের অবস্থা যে পড়ে গেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু নাকি দুবেলা চর্ব্যচোষ্য খাওয়া চাই, বাড়ির যত ভালো ভালো আসবাব, কাঁসার বাসন, ঝাড় বাতি বেচে বেচে ওঁরা কোর্মা-কাবাব

খান, পেস্তা দিয়ে ক্ষীর হয় রোজ। পায়ের নিচে যাদের সোনার পাহাড় তাদের এর চাইতে বেশি দুর্দশা কি হতে পারে! আজকাল নাকি ছোট মামাকে বড় কর্তা মেজকর্তা চোখা চোখা কথা শোনাতে শুরু করেছেন। বুড়ি ঠাকুমা বেঁটে একটা মুগুর এনে রেখেছেন। ভাগ্যিস এক তলায় কেউ নামেন না' তাই রান্নাঘরের অদল-বদল ব্যবস্থার কথা কেউ জানেন না। এদিকে কাল থেকে বাবুর্চির দেখা নেই, চোরা দরজা খুঁজে পেয়ে, তাই দিয়ে নেমে কোনো নতুন বিপদে পড়ল কিনা তাই বা কে জানে! ছোটমামা ঘনঘন কপালের ঘাম মুছে, রাতের জন্য বাকরখানি বানাতে নিচে নেমে গেলেন। হরেকেষ্ট বলে একটা লোক সর্বদা রান্নাঘর আগলায়, নইলে ছোট মামার গা শিরশির করে। নালা দিয়ে নাকি জিব-চেরা চার ফুট লম্বা গো-সাপ আনাগোনা করে।

অনেক রাতে কর্তাদের দোতলা তিনতলার ঘর চুপচাপ হয়ে গেলে ওদের দুজনের জন্য সে কি ভালো খাবার নিয়ে এলেন ছোটমামা! গুপি বলল, 'পুলিসে না ঢুকে তুমি অশোকা হোটেলে ঢুকলে পার, ছোটমামা! এমন রান্না কেউ কখনো রাঁধেওনি, খায়ওনি! প্রকৃতির দেওয়া গুণ নষ্ট করতে হয় না। ছোটমামাও রান্না ঘরের শিকলি তুলে ওদের সঙ্গে খেতে বসলেন। পাশের স্নানের ঘরে তোলা জলে বাসন ধোয়া হল, পানুরা প্ল্যাস্টিকের থালা গেলাস এনেছিল তারপর টর্চ নিয়ে সবাই নিচে নেমে এল। রবারের জুতোয় এতটুকু শব্দ হল না।

সমস্ত একতলাটাতে গরু খোঁজা করে ফেলা হল। স্রেফ একটি গোলক ধাধাঁ, এখানে একটা গলি বাঁক নিয়েছে, ওখানে দুটো সিঁড়ি, সেখানে একটা ঘুপসি খোপ, তাতে ঘুঁটে রাখা হয়েছে। ঘোরানো সিঁড়ি মাটি ফুটে নিচে নেমে গেছে। সেখানে সারি সারি কুঠরিতে পর্তুগীজরা তাদের রসদ মজুত রাখত। বড় বড় পিপে মস্ত মস্ত পাথরের হাঁড়া, তাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত, ধেনো মদ চোলাই

হত। ছাদে বড় বড় আংটা, আঁকড়া, দেয়ালে লোহার তাক। ছোটমামা বললেন, 'এর প্রতিটি বর্গ-ইঞ্চি হাতুড়ি ঠুকে দেখা হয়েছে, কোথাও এতটুকু ফোঁপরা আওয়াজ নেই।' অদ্ভুত সব শব্দ কানে আসছিল, বগবগ করে কোনো জায়গা থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল নিশ্চয় গঙ্গার প্রচণ্ড জোয়ারের জল, অথচ তার সঙ্গে কোথাও কোনো যোগাযোগ নেই, সব শূন্য খাঁ-খাঁ করছে শুধু এক জায়গায় বুড়ি-ঠাকুমার তৈরি সারি সারি লঙ্কার আচার রয়েছে, সে নাকি এমনি ঝাল যে যেকোনো দিন বোয়ম ফেটে পাথরের দেয়ালে আগুন লেগে যেতে পারে! সে যাই হক এখান থেকে যে বেরুবার পথ নেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটমামা বললেন, 'থাকবেই বা কেন? বোম্বেটেরা তো দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল, তারা যাতে বাড়ির মধ্যে সেঁদুতে পারে, এমন কোনো পথ নিশ্চয়ই রাখা হয়নি।'

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ওরা আবার রান্নাঘরের সামনের চাতালে গিয়ে বসল। গুপি সন্দেহের চোখে দোতলা তিনতলার জানালার দিকে তাকাল। খুদে ঘুলঘুলির মতো এদিকে জানলা, মাটি থেকে অনেক উপরে, আলমারির মাথায় না চাপলে পৌঁছনোই যাবে না। ছোটমামা বললেন, 'ওকি? অত সন্দ কিসের? কর্তাবাবুদের খাবার সময় বলে রেখেছি যে কিছু কিছু হদিশ্ পেইছি বলে দুজন সাকরেদ আনাচ্ছি! ওঁরা মত দিয়েছেন, তবে এই সর্তে যে কাল সকালের মধ্যে সোনা বের করে দিতে হবে—ই-ই-ক্!'

তারার আলোয় দেখা গেল এই লম্বা একটা গোসাপ ছোটমামার গা ঘেঁষে, উঠোনের দেয়ালের কাছেকার খাবার জলের ন্যাড়া কূয়োর মধ্যে দিব্যি নেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কূয়োর মধ্যে থেকে বিশ্রী একটা ওঁয়া ওঁয়া শব্দ' বেরুতে লাগল! ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে 'ব্-ভূত! ব্-ভূত!' বলে হাত-পা এলিয়ে মুচ্ছো গেলেন। অথচ বিনু তালুকদার একশোবার ভূতে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন!

পানুদের সঙ্গে সর্বদা দড়ি, মগ, এসব থাকত। পানু এক দৌড়ে ন্যাড়া কুয়োতে দড়ি বাঁধা মগ নামিয়ে দিল। সঙ্গেসঙ্গে রে-রে-রে করে বেঁটে মুগুর হাতে চুল ছাঁটা থান পরা বুড়ি ঠাকুমা ওর দিকে ধাওয়া করলেন। অমনি পানুও কুয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বুড়ি ঠাকুমা থমকে দাঁড়িয়ে, মুহূর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

অগত্যা গুপি কুয়ো থেকে জল তোলার মোটা দড়ির এক মাথা থাম্বাতে বেঁধে, অন্য মাথা হাতে নিয়ে কুয়োর কিনারা দিয়ে উঁকি মারতেই, সেই গোসাপটা দিব্যি সুন্দর টিকটিকির মতো বেরিয়ে এসে বুড়ি ঠাকুমা আর ছোটমামাকে মাড়িয়ে টাড়িয়ে রান্নাঘরের বড় নর্দমার মধ্যে ঢুকে গেল। ওঁদের দুজনার মুচ্ছোও অমনি কেটে গেল। তবে এ সব কিছুই গুপি দেখতে পায়নি।

গুপি হাতে টর্চ নিয়ে, সযত্নে কুয়োর মধ্যে আলো ফেলেই চমকে উঠল! হাত দশেক নিচেই কুয়ো সরু হয়ে গেছে, চারদিক ঘুরে একটা হাত-দুই চওড়া কার্নিশের মতো বেরিয়ে এসেছে আর তার ওপর পানু বসে মগ ঝুলিয়ে জল তুলতে চেষ্টা করছে। গুপি ডেকে বলল, 'দরকার নেই, মুচ্ছো ভেঙে গেছে।' আর অমনি কুয়োর ভিতর থেকে সেই বিশ্রী 'ওঁয়া ওঁয়া' শব্দ উঠতে লাগল। প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পানু আরেকটু হলে পড়েই যায় আর কি। কার্নিশের কানায় কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বিকট চ্যাঁচাতে লাগল, 'আমাকে তোল্।' শীগগির তোল্।' দড়ির মাথায় ফাঁস দিয়ে পানুকে তুলতে খুব কষ্ট হল না। বুড়ি ঠাকুমা হাত লাগালেন। পেল্লায় জোর তাঁর গায়ে।

উপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে পানু বলল, 'পেয়েছি।' ঠাকুমা আঁৎকে উঠলেন, 'কি? কি পেইছিস্ রে ড্যাক্‌রা?' 'সোনার তাল!' 'এ্যাঁ! কোথায়? শীগগির বল কোথায়?' পানু বলল, 'কুয়োর দেয়ালের খাঁজে। আমার পা লেগে খাঁজের মুখের পাথর খুলে পড়ে

গেছে! তার পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে দেখলাম, সিঁড়ি নেমে গেছে!'

শুনেই ঠাকুমা লাফিয়ে উঠলেন, 'এ্যাই! এ্যাই তবে ঘাটে নামার পথ! এরা বলে কিনা গঙ্গা চান করতে হলে ফটক দিয়ে বেরিয়ে টাঙ্গা ভাড়া করে যেতে হবে! অথচ একেবারে উঠোনের মধ্যেখানে পথ। সর তোরা, আমি নামব! বলে গঙ্গাতীরে পঞ্চাশ বছর বাস করলাম আর একবারো গঙ্গাচান করলাম না!' বলে হুড়মুড় করে নেমে পড়েন আর কি!

এমন সময় ফটকের বাইরে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার, 'বাপরে মারে! এই কামড়ালে! এই খেলেরে! ওরে বাবারে! মরে গেলুম রে!' ছোটমামা উঠিপড়ি করে ফটকের মাঝখানের ছোট দরজা খুলে দিলেন, পড়ি মরি করে জনা দশেক পুলিসের লোক আর তাদের পিছন পিছন হুড়মুড় করে গোটা পাঁচেক খরগোশ হালুম হালুম করতে করতে ঢুকে পড়ল! ততক্ষণে বড় কর্তা, ছোট কর্তা, দুই গিন্নিমা, হরেকেষ্ট গিন্নি-মাদের খাসদাসীরা, কর্তাদের পেয়ারের বেয়ারারা সব এসে জুটেছিল। দেখতে দেখতে খরগোশের দফারফা, রাতে ভোজ, ছোটমামা প্রধান বাবুর্চি। প্রধান আবার কি, বলতে গেলে একমাত্র বাবুর্চি। কারণ আসল বাবুর্চিকে টাকাকড়ি দিয়ে এক মাসের ছুটিতে বজবজ পাঠিয়ে যে লোকটি বাবুর্চি হয়ে বসে থেকে, ছোটমামার হয়ে তদন্ত করত, সে বিনু তালুকদারের লোক ছাড়া আর কেউ নয়। সেই রিপোর্ট করতে গেছিল। হরেকেষ্টও একজন পেয়াদা, তবে তার আজকাল রান্নার শখ চেপে গেছে, পুলিসের কাজ ভালো লাগে না।

আর সোনার তাল? সে সব নাকি কর্তাবাবুদের বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি, বুড়ো কর্তার উইল মতে বুড়ি ঠাকুমা আর কর্তারা সমান সমান ভাগ পাবেন। বিনু তালুকদারের লোকগুলো মহা হতাশ। 'আরে মশাই, দুষ্কৃতকারী ধরা আমাদের কাজ।

দুষ্কৃতকারী না থাকলে আমরা হতাশ হই। এঁরা বলছেন নাকি স্ট্যাম্প ফ্যাম্প যা দেবার সব দেবেন। ধেত্তেরি ছাই।'

এরো অনেক পরে, যখন ওরা বাসে করে কলকাতায় পৌঁছে পানুদের দোতলার ঘরে বসে রামকানাইয়ার তৈরি পাঁঠার ঘুগ্‌নি খাচ্ছিল, তখন ছোটমামা পকেট থেকে দুটো গত বছরের ফার্স্ট ডে কভার বের করে বললেন, 'আমার একটু খট্‌কা লাগছে যে সেই বুড়ো কর্তা মারাই গেছেন পঞ্চাশ বছর আগে, তাঁর সোনার সঙ্গে এগুলো এল কি করে? তবে কি—।'

পানু কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তবে কি আবার কিসের? ঐ কুয়োর খোপে সোনার তালের নিচে এগুলো ছিল, আরেকটাও ছিল, বোধহয় কেউ দেখতে পান নি, সেটা আমি বিনু তালুকদারের কাছে দিয়েছি। এবার খেল্ শুরু হল বলে।'

আরো অনেকদিন পরে বিনু তালুকদার পানুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বেজায় চালাক তো তুমি। ঐ সোনার তালটি হল গিয়ে কর্তাদের চোরা কারবারির মাল। ওগুলোকে নিজেরা লুকিয়ে রেখে গোয়েন্দা লাগিয়ে খুঁজে বের করিয়ে, অজানা পৈত্রিক সম্পত্তি বলে চালাবার তালে ছিলেন ওঁরা। এখন সব ফেঁসে গেল, সোনাগুলো গচ্ছা গেল, তবে ওঁরাই যে লুকিয়েছেন তার কোন প্রমাণ না থাকাতে ওঁরা নিজেরা পার পেয়ে যাবেন। নিতান্ত পথেও বসবেন না, ঐ সব জমিজমাতে নাকি কোন দামী ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে তাই খনি বিভাগ থেকে ন্যায্য দামে সম্পত্তিটা কিনে নেওয়া হচ্ছে।'

বুড়ি ঠাকুমা প্রথমটা বেঁটে মুগুর নিয়ে তেড়ে গেছলেন, তারপর সবটা বুঝিয়ে বলতে বললেন, 'ওমা, তাই নাকি, আমাকেও আবার টাকার ভাগ দেবে নাকি? তবে রামকেষ্টপুরে গিয়ে গঙ্গার ওপর বোনপোর বাড়িতে থাকতে আর বাধাটা কি? কবে থেকে বলছে ওরা।'

ডিমাপুর থেকে ছোটমামা হঠাৎ গুপিকে তার করল, 'কাম সার্প।' আগেও গুপি একবার ডিমাপুর গেছিল, খুব ভাল লেগেছিল। পাহাড়ি জায়গা, চারদিকে ঝাউগাছ আর চা-বাগান। রাতে ঝোপে ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে কান ঝালাপালা, মুরগি, মুরগির ডিম, ঝর্ণাবনির মাছ আর বুনো স্ট্রবেরি।

বড়মামুর বন্ধু অনন্তমামার চা বাগান। ঐ বাড়িটাতে কেউ বারোমাস থাকে না। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটাতে যায়। বড় বড় ঘর কাঠের মেঝেতে নারকেল ছোবড়ার গালচে পাতা, তাতে পিস্সু হয়। পিস্সু এক রকম ছোট পোকা, দেখা যায় না। বেজায় কামড়ায়। চৌকিদার আছে, বেজায় ভালো রাঁধে, আর ফটকের পাশে আলু-বখরার গাছটার তুলনা হয় না।

পূজোর ছুটি, গুপির যেতে কোন বাধা নেই। নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু ঘোরেল ব্যাপার আছে, নইলে 'কাম সার্প' কেন? গুপি মহাখুসি। সেই নেপোর ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ইস্তক শুধু পড়া। এই দেড় বছরে ছোট মামা পর্যন্ত সত্যি সত্যি বি-এস-সি পাস করে ফেলে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির

চাকরি পেয়েছে। একটু হাত পাকলে বিনু তালুকদার ওকে পুলিশে ঢুকিয়ে নেবে।

এই সময় ছোটমামার ডিমাপুরে থাকার কথা নয়। আপিসে সব চেয়ে কম মাইনে পেলে কি হয়, আসলে সে সমাদ্দার সাহেবের ডানহাত। যত ক্রুর তদন্ত সব ওদের দ্বিতীয় টিকটিকিকে দেওয়াই নিয়ম। কারণ প্রথম টিকটিকির মুখ চিনতে কোনো নিয়মভঙ্গকারীর আর বাকি নেই। এদিকে ছোটমামার নাম পর্যন্ত ওদের খাতায় লেখা নাই। এমন কি অন্য কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা যে ছোটমামা সমাদ্দারের একজন মক্কেল। এই রকমই দরকার। দ্বিতীয় টিকটিকি আছে কি নেই কেউ জানবে না, আর মাঝখান থেকে সে-ই তদন্ত চালিয়ে সব ফাঁস করে দেবে। কিন্তু তখনো তার নাম গুহ্য রাখা হবে। সবাই সমাদ্দারের বুদ্ধির তারিফ করবে। এই নিয়ে ছোটমামা গুপির কাছে অনেক দুঃখও করেছে, এবারও নিশ্চয় কোনো বিপজ্জনক কাজ নিয়েই ওখানে গেছে। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। কারণ সমাদ্দারের আপিস বর্ধমানে। সেখানে এক জন ভালো ভালো হাত-আয়না ও লজেঞ্চুষ-ওয়ালার সঙ্গে ছোটমামা থাকে। ওর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না। সবাই ওকে ম্যালেরিয়া বাবু বলে ডাকে। তাদের বিশ্বাস ছোটমামা কোনো খবরেরকাগজের মফঃস্বল রিপোর্টার। চেহারা দেখেই ম্যালেরিয়া রুগী বলে বোঝা যায়।

ছোটমামার এ সব বিষয়ে কোনো দুঃখ নেই। ভালো টিকটিকি-দের তো এই রকমই হতে হয়। ভিড়ের মধ্যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। চোরদের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও কিছু মালুম দেবে না। রোগা লিকলিকে চেহারা, তার উপর ভীতুর একশেষ; বেড়াল দেখলে লোম খাড়া হয়। আরশুলার শব্দ পেলে ভির্মি যায়, একবার শিষ্য-গুরু প্যাঁচার ডাকে হাত পা এলিয়ে গেছল। দ্বিতীয় টিকটিকি সাহস বা গায়ের জোর দেখিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন?

তার কাজ আড়ালে, অজ্ঞাত থেকে ছোঁক ছোঁক করে অন্যায়-কারীদের হাঁড়ির খবর বের করে আনা। কাঁচা কাঁচা প্রমাণ লাগানো।

এইজন্যেই নিশ্চয় ডিমাপুর যাওয়া। কোনো জটিল তদন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বাড়ির লোকেদের ধারণা অন্যরকম। মা বললেন, 'যাক্ তবু যে অনন্তবাবুদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছে, তাও ভালো।' দাদু বললেন, 'ভালো জায়গায় সৎসঙ্গে থাকা এখন সহ্য হলে হয়।'

এদিকে গুপি খুব ভালো করেই জানত যে অনন্তবাবুরা বড় মামাদের সঙ্গে রামেশ্বর গেছেন। তবে বড়দের কথার মধ্যে থাকার কি দরকার এই ভেবে চুপ করে রইল। তাছাড়া কিছু বললেই তো হয়ে গেল। ছোটমামা বেচারী একলা অকুস্থলে ম্যানেজ করতে পারছে না, একজন বিশ্বস্ত সহকারী দরকার, তাই না 'কাম সার্প'। এহেন অবস্থায় তাকে তো আর হতাশ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাবার তুষটাকে ছোট স্যুটকেসে ভরে ডিমাপুর রওনা।

ছোটমামা সেই পুরনো দাড়িটা পরে ছোট গাড়ির স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস সেই নেপোর ব্যাপারের সময়ে দাড়িটা চেনা হয়ে গেছিল নইলে ছোটমামাকে চেনা গুপির সাধ্য ছিল না। বললে, 'এ সব ছদ্মবেশ খুবই সহজ, স্রেফ দু'গালে দুটো আস্ত সুপারি আর সামনের চুল ছোট, পিছনের চুল লম্বা। ব্যস, কোনো দুঁদে টিকটিকিও চিনতে পারবে না। দ্বিতীয় টিকটিকির আসল রূপ যত কম লোকে দেখে ওর উন্নতির পক্ষে ততই ভালো।'

হেঁটেই আসছিল ওরা, ওখানে গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে। ঘোড়া অবিশ্যি ছিল। কিন্তু ছোটমামার 'হে ফিবার' কিনা, ঘোড়া দেখলেই হাঁচি আসে। তবে বেশি দূরও নয় আর গুপির লম্বা লম্বা হাঁটা দেওয়া অভ্যাস। পাহাড়ের গা কেটে বাজারের মাঠ। তার পাশেই খেলার মাঠ। সেখানে মস্ত একটা ছেঁড়া তাঁবু পড়েছে

দেখা গেল। দূর থেকে দেখেই গুপির মহা উৎসাহ।—'ওকি ছোটমামা, সার্কাস নাকি? দেখাবে তো?'

ছোটমামা গুপির কোঁকে কোঁকে খোঁচা দিয়ে ফিস ফিস করে বলল—'স্-স্-স্, এক্ষুনি সব ফাঁস করে দিচ্ছিলি! ওটাই অকুস্থল, তদন্তের ক্ষেত্র। এখন চুপ কর দিকি, কে কোথায় শুনবে। বাড়ি গিয়ে সব বলব।'

কে কোথায় শুনবে শুনে গুপি অবাক। কোথাও তো জনমানুষের সাড়া নেই। অথচ সবে বিকেল পাঁচটা হবে। আরেকবার ভালো করে দেখতে গিয়ে গুপির হাত পা ঠাণ্ডা। দুটো গুণ্ডা চেহারার লোক ওদের পিছু নিয়েছে। 'ও ছোটমামা, গুণ্ডায় পিছু নিয়েছে যে।'

ছোটমামা চটে গেল। 'আহা, আবার গুণ্ডা কোথায় দেখলি। ও তো ছটু আর পালক। আমার বডিগার্ডই বলিস বা ফলোয়ারই বলিস। ওরা সর্বদা সঙ্গে থাকে। নইলে দ্বিতীয় টিকটিকি গুমখুন হলেই হয়েছে। তদন্ত বন্ধ। তাছাড়া রাফ কাজ করার জন্যে তো লোক চাই। একলা হিংস্র—ঐ যা বলেই ফেলেছিলাম আরেকটু হলে। আমার আবার লোকের গন্ধে হাঁপ ধরে।'

গুপি বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু শিরার মধ্যে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আঃ, বিপদ কী ভালো জিনিস! প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। পিছনে ছটু আর পালক। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই ছটু আর পালক পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেলল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, 'চাঁদুবাবু, আজ আমি মাংস পরিবেশন করব।' ছোটমামা কোন উত্তর না দিয়ে, গেটের পাশের ছোট চোরা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ল।

চৌকিদার বসবার ঘরে দুটো বড় বড় তেলের বাতি জেলে দিয়ে বলল, 'বড় সাহেব আমার ভয় করছে। আমাকে দুদিনের ছুটি দিন। দিদিমার বড় বেমারি।'

সঙ্গে সঙ্গে ছটু আর পালকও বলল, 'আমাদেরও খরচা দিন। শেষটা কি বেঘোরে প্রাণ দোব ঐ বিকট ভাবে?'

ছোটমামা শুধু বলল, 'আগে খাওয়া দাওয়া হোক। তোদের অত ভয় কিসের রে? কালই সব চুকেবুকে যাবে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে গুপি চারিদিকে চেয়ে দেখল। জানালার কাঁচ দিয়ে দেখা গেল বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা এসব জায়গায় সূর্য ডোবার সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার হয়। বুকটা একটু ঢিপঢিপ করতে লাগল। থমথমে চুপচপ। পাশের ঘরে চৌকিদার বাসনপত্র নাড়ছে, তার যা একটু শব্দ। হঠাৎ তারি মধ্যে দিয়ে খড়র খড়র করে করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো আওয়াজ হল। অমনি চৌকিদার মাংসের হাঁড়ি ফেলে ছুটে ছোট-মামাকে জাপটিয়ে ধরল আর ছটু আর পালক আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঐ শুনুন, খাঁচার শিকে নখে শান দিচ্ছে। তাকাতে ভয় করে। রেল ভাড়াটা দিয়ে দিন।'

ছোটমামা বলল, 'ছালটা ছাড়িয়ে ফ্যাল, হাত পা বেঁধে দে, ব্যস তোদের ছুটি। এই রকম সাহস নিয়ে তোরা সমাদ্দারের টিকটিকি হতে চাস?'

তখন গুপি বলল, 'ছোটমামা, সব ব্যাপার যদি খুলে না বল তো এই আমি চললাম। আমার রিটার্ন টিকিট আছে।'

ছোটমামা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'আগে খাওয়া যাক! তারপর বলব। ও ছটু, ও পালক, তোমরা তিনপোয়া মাংস নাও, আমাদের একপোয়াতেই হবে।'

গুপি বলল, 'না, মোটেই হবে না। ছোটমামা প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি? 'আর বাড়াস নি রে গুপে। সব খুলে বলব, তখন তুই আর তোর মামাকে একা ফেলে পালাতে পারবি নে।'

চৌকিদার বলল, 'একা কেন হবে বড় সাহেব! ওরা তো আছেন।' ছোটমামা তাই শুনে দুহাতে মুখ ঢাকল।

কোন রকমে খাওয়া চুকল, অথচ একশোবার বলতে হবে খাসা রান্না।

মুখ-হাত ধুয়েই ছোটমামা বলল, 'দেখবে চল, তবে। পালক আলো নিয়ে আয়।'

চৌকিদার বলল, 'আমি বাসনপত্র মুচ্ছি। আপনারা যান। এই ছটুটা ভারি ভীতু।'

বড় আস্তাবলের এক কোণে বড় একটা খাঁচা। তাতে চাকা লাগানো। লাইনের আলোয় গুপি দেখল, ভিতরে একটা ভালুক। শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। ঠোঁটের কোণা দিয়ে নাল গড়াচ্ছে। মনে হল বিড় বিড় করে কি বলছে। গুপি একহাত পিছিয়ে গেল।

নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুপিকে ঠেলে দিয়ে ছোটমামা বলল 'ঐ দেখ আগে থাকতেই ভয়ে আধমরা। বলছি ওটা সত্যিকার ভালুক নয়। কুখ্যাত জালিয়াৎ নুটবিহারী, গোয়েন্দার হাত এড়াবার জন্য ভালুকের ছাল পরে সার্কাসের জানোয়ারদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কি আর বলব রে, রোজ ঐ ভালুকের খেল দেখতে শহর শুদ্ধ ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়ছে। আর কেন নুটুবাবু, এবার খেল শেষ হয়েছে। ভাল মানুষের মতো ছাল ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আমাদের সমাদ্দার সাহেব গবরমেণ্টকে বলে-কয়ে তোমাকে মাপ করিয়ে দেবে। ঐ খাঁচায় তো আর জীবন কাটাতে পারবে না।'

ভালুক চুপ করে রইল। শুধু মিটমিটে আলোয় মনে হল চোখ দুটো একবার চকচক করে উঠল।

ছোটমামা গুপিকে আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'যা না, এ তো কিছুই না। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ঠিক করে রেখেছি। তুই বললেই এই দড়ি ধরে টানব, খাঁচার দরজা উপরে উঠে যাবে, ব্যস, আর কিছু নয়। তুই দৌড়ে গিয়ে এক হাতে ওকে জাপ্টে ধরে

অন্য হাতে চোয়ালটা ধরে এক টান দিবি অমনি খট্ করে মুণ্ডু খুলে যাবে আর নুটুবিহারী—সপ্রকাশ।'

গুপি বলল—'তুমি গিয়ে জাপ্টে ধর না। আমি চোয়াল টানব। ছোটমামা বেজায় চটে গেল, 'বলেছি তো, আমার হে-ফিবার আছে, ভালুক দেখলে হেচকি আসে,—হিচ্।' গুপি বলল, 'ছটু, ও পালক।' ছটু পালক দরজার বাইরে থেকে বলল, 'সাতদিন ধরে বড় সাহেবের কথায় আমরা চাকর সেজে সার্কাসে নাম লিখিয়ে ভালুকের খাঁচা ধুয়েছি, ভালুকের গোবর সাফ করেছি। কাল রাতে সবাই ঘুমোলে প্রাণ হাতে করে খাঁচা ঠেলে এখানে এসেছি। সত্যি ভালুক না হতে পারে কিন্তু নুটুবাবুর নখগুলোও তো কিছু কম যায় না।' এই বলে ওদের গায়ে হাতে আঁচড় কামড়ের দাগ দেখাল। নুটুবাবু একটু মুচকি হেসেই আবার গম্ভীর হল।

পালক আরো বলল, 'নিজেরা তফাতে থাকবেন আর আমাদের নুটুবাবুর সামনে ঠেলে দেবেন। ওর ঐ ভালুকছালের পকেটে বোমা নেই বলেছে? নিজেদের যদি একটু সাহস থাকত—'

ছোটমামা বলল, 'না আর অপমান সহ্য হয় না,—গুপে, যা বলছি। তোকে দূরবীনটা দিয়ে দেব।'

এবার আর বলতে হল না। গুপি এক দৌড়ে খাঁচার কাছে গেল। ছোটমামা দরজা টেনে তুলল আর নুটুবাবু বেরিয়ে গুপিকে জাপটিয়ে ধরে, শূন্যে তুলে সে কি মড়াকান্না জুড়ে দিলে! সকলের গায়ের রক্ত জল। ছোটমামা দু-একবার 'ও কি নুটুবাবু, ওকে ছেড়ে দিন বলছি, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?'

নুটুবাবু গুপির কানের কাছে ঘ্যোতে ঘ্যোত করতে লাগল। আর তাই দেখে চৌকিদার ছটু, পালক সে যে কি হল্লা লাগাল। 'ভালুক ধরল রে, ভালুক খেল রে, ওরে বাবা রে!'

আশেপাশে ধুপধাপ শব্দ। হুড়মুড় করে সার্কাসের লোক এসে উপস্থিত। তারা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছিল, তাদের দেখেই

ভালুক গুপিকে ছেড়ে দিয়ে ওদের একজনের গলা জড়িয়ে সে কি হাঁউমাউ। সেও ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আরে চুন্নি রে, তোকে না দেখে আমারো খাওয়া-দাওয়া মাথায়—উঠেছিল রে! কিছু মনে করবেন না স্যার, দশ বছর ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি ওকে। ও আমার মেয়ের মতো!'

শুনে গুপিও লাফিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ। মেয়ে নাকি? তবে যে ছোটমামা বলল নুটবিহারী?' সবাই শুনে অবাক! ছোটমামাও আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে—কি—বলে আমার কোন দোষ নেই। সমাদ্দার সাহেবের কাছে বেনামী চিঠি এসেছিল, নুটুবাবু ভালুক সেজে সার্কাসে ঢুকেছে।'

তাই শুনে চৌকিদার কপাল চাপড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরি বাবা, কি তাজ্জবের ব্যাপার। এই তারটা দুপুরে এসেছিল, দিতেই ভুলে গেছি।' সমাদ্দারের তার, 'বেনামা চিঠি হোকস, নুটুবাবু বামাল সমেত ধরা পড়েছে।'

এতক্ষণ পরে ছোটমামার সব ব্যাপারটা মালুম হল। অমনি 'তবে কি ঘরের মধ্যে সত্যি ভালুক ঢুকিয়েছিলাম নাকি রে! ওরে আমাকে ধর!' এই বলে হাত পা এলিয়ে স্রেফ ভির্মি। তারপর দশদিন বিছানায়। সেই দশদিন গুপির যে কি আনন্দে কেটেছিল। রোজ সকালে সার্কাসের জানোয়ারদের খাওয়া দেখতে যেত, বিকেলে খেলা দেখত। ভালুক সরানোর জন্য মালিক এতটুকু রাগ করেননি। বরং উল্টে বলেছিলেন এরকম দক্ষ টিকটিকির বাড়িতে রোজ মুরগি খেতে পাওয়াও সৌভাগ্য। তাছাড়া যখন ছটু আর পালক, যারা আসল চোর তারাই ফেরারী, তখন পুলিশ ডাকার কোনো মানেই হয় না। আজও মুরগির দো-পেঁয়াজী হবে নাকি?' গুপি ভাবছে দ্বিতীয় টিকটিকি তো বাড়িতে একজন আছেই। আবার তৃতীয় টিকটিকি না হয়ে সার্কাসে ভালুকের খেলা দেখালে কেমন হয়? কিন্তু ছোটমামা নাকি টেলিস্কোপটা খুঁজে পাচ্ছে না, এই যা দুঃখ।

ট্রেন থেকে নেমে বেশ খানিকদূর টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে যেতে হল। টাট্টু দুটো আবার ভারি অদ্ভুত ধরনের। গুপিরটার রঙ পাটকিলে, সামনের দিকটা উঁচু, পিছন দিকটা নিচু, কেবলি ল্যাজের ওপর দিয়ে পিছলে পড়ে যাবার ভয়। গুপি বাঁ হাতে দড়ির লাগাম আর ডান হাতে টাট্টু ঘোড়ার ঘাড়ের কর্কশ চুল খামচে ধরে বসে রইল। টাট্টু ঘোড়া আবার থেকে থেকে মাথা ঘুরিয়ে হলুদের মত চোখ দিয়ে আড় চোখে ওকে দেখার চেষ্টা করছিল। গুপির কিছু করবার-ও উপায় ছিল না, পথ-ও ঐ একটাই, তার এক দিকে পাহাড়ের পাথুরে গা, অন্য দিকে খাদ, কাজেই টাট্টু ঘোড়া যে অন্য পথে যাবে তারো জো ছিল না। ঘুরবারো জায়গা ছিল না। তাছাড়া গুপির পিছনেই পানুর টাট্টু ঘোড়া। সেটার রঙ একেবারে সাদা, মায় চোখের পলক পর্যন্ত। কে না জানে সাদা ঘোড়াকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। এর আবার সামনের দিকটা নিচু, পিছনদিকটা উঁচু ঘোড়ার মাথা ডিঙিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়বার ভয়। পানু বাঁ হাতে দড়ির লাগাম আর ডান হাতে টাট্টু ঘোড়ার ল্যাজের এক গোছা চুল আঁকড়ে ধরে বসে ছিল। টাট্টু ঘোড়া থেকে থেকে ল্যাজের গোড়া নেড়ে ল্যাজ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল আর মাথা ঘুরিয়ে ছাইয়ের মতো চোখ দিয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। দুটো টাট্টু ঘোড়ারি

বড় বড় চারকোনা দাঁত দেখা যাচ্ছিল, দুটোরি মুখে কেমন একটা খিদে-খিদে ভাব। তাছাড়া দুটোতেই মাঝেমাঝে দাঁত দিয়ে শূন্যে কপ্‌ চাচ্ছিল।

বোঝাই যাচ্ছে যে এ পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা গুপি-পানু দুজনার মধ্যে কারো ছিল না। তবু ক্রমে যে ওরা ধূলোময়লার দেশ থেকে উঠে পরিষ্কার আবহাওয়াতে পৌঁছচ্ছে সেটা না বুঝে উপায় ছিল না। টাট্টুঘোড়াওয়ালারা দুজন এতক্ষণ অনেক পেছিয়েছিল বোধহয় যাতে হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলে দেখতে না হয়। এবার তারা পাহাড়ের গা বেয়ে অদ্ভুতভাবে পাকদণ্ডি ধরে নেমে এসে বলল যে সামনের বাঁকে হাকিমসায়েবের ভাইয়ের লোক অপেক্ষা করছে। শুনে তো পানুর চক্ষু চড়কগাছ। গুপি সাহস দিয়ে বলল, 'আরে বুঝলি না, হাকিম-সায়েব মানে বড়মামা, তাঁর ভাই মানে ছোটমামা, ছোটমামাই বোধ হয় নাস্তা পাঠিয়েছেন।'

টাট্টুঘোড়াওয়ালারা খুসি হয়ে বলল, 'হুঁ, হুঁ, চায় বিস্কুট ভেজিয়েছেন।' বলে বড় বড় পা ফেলে সেই দুর্গম পথ বেয়ে নিমেষের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। গুপি এই সময়ে খানিকটা অ-সাবধান হয়ে গিয়ে থাকবে, পাটকিলে ঘোড়াও সুযোগ পেয়ে, অনেকখানি গলা বাগিয়ে ওর জুতোর বগ্‌লেশ-সুদ্ধ অনেকখানি স্ট্র্যাপ কপ্‌ করে মুখে পুরে নিল। ভীষণ রেগে, ভয় ভুলে, গুপি তাকে কষে এক হাঁটুর খোঁচা দিতেই সে বগলেশ ছেড়ে ঐ খাড়া পথে পারত্রাহি ছুটে আধমিনিটের মধ্যে একটা ছাউনির সামনে গিয়ে এমনি হঠাৎ থেমে গেল যে গুপিও পত্রপাঠ বিনা চেষ্টাতেই তার ল্যাজ বেয়ে মাটিতে নেমে এল এবং খটাখট হাঁই-মাই করতে করতে পানুর সাদা ঘোড়াও হঠাৎ থেমে মাথার ওপর দিয়ে পানুকে গুপির পাশে মাটিতে নামিয়ে দিল।

গুপি অবাক হয়ে টাট্টুঘোড়া দুটোর দিকে চেয়ে বলল, 'কোন

এক সময়ে ওদের পেছনের পাদুটো অদল বদল হয়ে গেছিল। কই আমাদের নাস্তা কই?' কিছু মন্দ নাস্তাও নয়, কচুরি, আলুভাজি ক্ষীরের বরফি। যে লোকটা খাবার এনেছিল তার কিন্তু সাংঘাতিক চেহারা, ছয় ফুট লম্বা, কান অবধি কাঁটা কাঁটা চুল, চোখ প্রায় নেই বললেই হয় নাম নাকি গুটি। এদিকে টাট্টু ঘোড়াওয়ালারা পেটপুরে খেয়ে বলল আর ওপরে তারা কিছুতেই যাবে না কারণ এমন সব বেয়াড়া সোয়ার যে টাট্টু বেচারিরা বেজায় ভয় পেয়েছে, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, মুখে ফেনা জমছে। ও-সব যে স্রেফ ওদের বদমায়েসি সে-কথা কে শোনে! তবে পানু গুপি একটু খুসি না হয়েও পারল না। খুব একটা কষ্ট ও হল না, ছাউনির ও ধার দিয়ে পথটা নেমে গেছে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে হেঁটেই ওরা হিমখন্দে পৌঁছে গেল। এইখানেই গুপির বড়মামার হেডকোয়াটার, অবিশ্যি তাঁকে এই সমস্ত অঞ্চলটায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তবে তাঁর আস্তানাটি যেমন সুন্দর, তেমনি আরামের। এইখান থেকেই বড় মামা কিছুদিন হল নিখোঁজ হয়ে গেছেন। ওদের দেখে দোতলা থেকে ফ্যাকাশে মুখে ছোটমামা নেমে এলেন, এসেই বললেন, 'টাট্টু-ওয়ালাদের কাছে কোন গোপন কথা ফাঁস করিস নি তো?' গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিছু জানলে তো বলব। তুমি এলে শরীর সারাতে, এসেই তার করলে, 'এল্‌ডার ব্রাদার মিস্ট্রী কম শার্প।' বাড়িতে কাঁদাকাটি পড়ে গেছে। 'কি ব্যাপার বল দিকিনি?'

ছোটমামা ইদিকউদিক তাকিয়ে গলা খাটো করে বললেন, 'বোধ হয় কিড্‌ন্যাপড্‌। স্রেফ ধরে নিয়ে গেছে।' শুনে পানু হাঁ। ধরে নিয়ে গেছে! ঐ তাগরাই ছয় ফুট লম্বা চারমনি বদামেজাজী মানুষকে ধরে নিয়ে গেলেই তো আর হল না। নেবে কি করে?'

ছোটমামা চটে গিয়ে তো-তো করে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে, কিছু খাইয়ে—সমাদ্দার সায়েবের কাছেও নক্ আউট ড্রপ থাকে তা জানিস, এক ফোঁটা লুকিয়ে চায় বা কফিতে ঢেলে দিতে

পারলে আর দেখতে হবে না, পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা বে-মক্কা ঘুম! নাকে নস্যি দিলেও জাগবে না',—গুপি বলল, চায়মণি ঘুমন্ত মানুষকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে, ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে গেল আর তুমি পাশের ঘরে শুয়েও কিছু টের পেলে না? সমাদ্দারের ট্রেনিং বটে!'

ছোটমামা বললেন, 'আহা, ঐ ভাবেই নিয়েছে তো আর বলছি না, ভুলিয়েও নিয়ে থাকতে পারে।' গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'বড় মামাকে ভোলাবে সে বান্দা এখোনো জন্মায়নি।' ছোটমামা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কিম্বা নাঃ, থাক, তোরা ছেলেমানুষ।' গুপি কোমরে হাত দিয়ে ছোটমামার সামনে দাঁড়াতেই, উনি এক হাত পেছিয়ে গিয়ে বললেন, 'সে-সব কথা লোকের সামনে বলবার নয়।' বলে নাক দিয়ে গুটির দিকে দেখালেন!

ততক্ষণে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সমস্ত সামনের দিকটা জুড়ে, কাঁচ দিয়ে মোড়া চওড়া একটা বারান্দার মতো ঘর, তার মেঝেতে মাদুরের গালচে পাতা, জানলায় গোলাপি পরদা, তার বাইরে দোতলার ঝোলানো বারান্দা থেকে তারের ঝুড়িতে বেগনি ফুল ঝুলছে। জানলার পরদার ওপর দিয়ে ঘন নীল আকাশের ওপর রূপোলি পেনসিল দিয়ে আঁকা ছবির মতো হিমালয় দেখা যাচ্ছে। গুপি সেই দিকে চেয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাদের রাঁধবার লোকটাও কি অদৃশ্য হয়ে গেছে নাকি?

গুপির হৃদয়হীনতা দেখে অবাক হয়ে ছোটমামা ল্যাজ দোলানো পুরনো দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাকের ওপর-কার তিব্বতী ঘণ্টাটা বাজিয়ে দে। সেকালে ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে লামারা ভূত তাড়াত। এদ্দুর এলি স্নানটান করবি না, গরম জল বলি?

গুপি কপালে ভুরু তুলে বলল, আচ্ছা, তুমি কি রকম পাষণ্ড বড়মামাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর তুমি কি বলে চানের কথা মুখে আনছ? এদিকে আয় পানু, হাত ধুয়ে বসে পড়। এবার সব কথা খুলে বল, ছোট মামা।'

ঘরে আর কেউ ছিল না, তবু ছোটমামা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'তোরা গুণ, ভেল্কি, কুহক, ইন্দ্রজাল, এসবে বিশ্বাস করিস?' ওরা দুজন উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে বলল, 'কোথায়? কোথায়? টাউন হলে দেখাচ্ছে বুঝি?' ছোটমামা কাষ্ঠ হাসলেন, 'বলি টাউন কোথায় যে টাউন-হলে দেখাবে? এই বাড়িটাই হেডকোয়ার্টার, অফিস, আদালত থানা, মায় জেলাখানা। সায়েবদের আমোলে এ বাড়ির ভাঁড়ার-ঘরে কত লোক যাবজ্জীবন কারাবাস করে গেছে। তবে এটাকেই-টাউনহল-ও বলতে পারিস, কুহকের খেলাও হয়তো এখানেই হয়, এখান থেকেই বড়দা অদর্শন হয়েছেন এবং তদন্ত-ও শুরু করতে হবে এখান থেকেই।'

শুনে পানু এমনি অবাক হয়ে গেল যে আরেকটু হলেই আলজিব গিলেটিলে একাকার কাণ্ড হত ভাগ্যিস্ ঠিক সেই সময় অতি ধূর্ত চেহারায় বাবুর্চি চোখ পিটপিট করতে করতে, এদিক ওদিক চোরা-চাউনি দিতে দিতে টেবিলের ওপর এই বড় একটা ট্রে রেখে কোন কথা না বলে, আড় চোখে তাকাতে তাকাতে আর দেয়াল ঘষটাতে ঘষটাতে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ট্রের ওপর ধূমায়মান খিচুড়ি, আলুর দম, কপি ভাজা, ডিমের বড়া। বলা বাহুল্য এর পর কথাটা চাপা পড়ে গেল, যদিও গুপি-পানুর মনে এখন আর এই বাড়ি থেকে তদন্ত শুরু হবার কথাটা তেমন অ-বিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল না। চাই কি, সেই প্রাচীন ভাঁড়ার ঘরে ঐ বাবুর্চিই হয়তো—।

খাওয়া শেষ করে, সবেমাত্র মুখে সেই রকম দুটি ক্ষীরের বরফি দিয়েছে, এমন সময় 'আঁই—মাঁই—উঁয়া—উঁয়া' করতে করতে-হুঁটকো বাবুর্চি উঠি পড়ি করে ঘরে ঢুকে ছোটমামার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলল, বিল্লি হুজুর! চুল খাড়া, চোখ গোল ছোটমামাও আর এক দণ্ড অপেক্ষা না করে হুড়মুড় করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন. সঙ্গে সঙ্গে গুপি পানু।

সিঁড়ির মাথায় বড় শোবার ঘরের দরজা খোলা, তার সামনে

একটা ট্রে, কতকগুলো ভাঙা গেলাস আর জলে-জলাকার পাপোষের ওপর প্রকাণ্ড একটা পাটকিলে রঙের বেড়াল প্যাটার্নের জানোয়ার জলের দিকে থাবা বাড়িয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছে !

তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গুপি বলল, 'ব-বড় মামা !' তাই শুনে বিশ্বাস কর আর নাই কর, ফ্যাচ্ করে হাসল বেড়ালটা। তারপর দিব্যি সুন্দর বড়মামার খাটে উঠে লেপের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। ছোটমামা কেঁদে ফেললেন।

গুপি দরজাটা বন্ধ করে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বলল, 'ও ওটা কে ? কোত্থেকে এল ? ছোটমামা সিঁড়ির মাথায় বসে পড়ে, হাতের পাতা উল্টে মুচ্ছো গেলেন। ওরা ধরা ধরি করে তাঁকে পাশের অন্য শোবার ঘরটিতে নিয়ে যেতেই চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ে—কি বলে—সেই গোঁফ সেই দাঁত খিচুনি, উঃফ্ ! পই-পই করে বড়দাকে বললাম বনবাসীদের ঘাঁটিও না, ওদের নানা রকম ক্ষমতা থাকে। তা কে কার কথা শোনে। নাকি মাদকদ্রব্য চালান দেয়। আরে ওরা চালান দেবে কোথায় ? ওদের বিশ্বাস এই পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে পৃথিবীও সেখানে শেষ হয়েছে, এখানকার তুরি নদী নাকি পাহাড়ের নিচে পৌঁছেই হুড়হুড় করে পৃথিবীর কিনারা দিয়ে শূন্যে পড়ে যায়। তাই এ সব দেশে বন্যা হয় না। ওদের কথা ছেড়ে দে। তা বড়দা পেয়াদা পাঠিয়ে ওদের তিন সরদারকে ধরে ফাটকে দিল। ওদের গাঁয়ে নাকি গাঁজার চাষ হয়।

পানু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ফাটকে দিল ? এই যে বললে এই বাড়িটাই আদালত এটাই জেলখানা।' ছোটমামা বললেন, 'দরকার হলে দুষ্কৃতকারীদের এখানকার ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সেটাই ফাটক।'

গুপি বলল, 'তাহলে তো চুকেই গেল, ওদের জিজ্ঞাসা কর না বড় মামার কি হল।' 'তারাও নিখোঁজ। ঘর যেমন চাবি বন্ধ ছিল তেমনি আছে, সরদাররা 'নেই' হয়ে গেছে। বলিনি ওরা

ধূপকাঠ ঘষে আগুন জ্বালে বটে, কিন্তু নানা রকম গুণ আছে। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ওদের কাছে যে কিছুই নয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছিস্। এবার খাওয়া দাওয়া হয়েছে, তদন্ত শুরু করে দে।'

গুপি পাশের খাটে শুয়ে গলা অবধি কম্বল টেনে দিয়ে বলল, 'কিসের এত তাড়া। পাশের ঘরে বেশ তো আছেন।' সঙ্গে সঙ্গে দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা খচর খচর করে আঁচড়ানোর শব্দ শোনা গেল। পাতলা দরজা, ফেড়ে টেড়ে ফেলবে না তো? বেশ বড় জানোয়ারটা একটা ছোটখাটো পাঁঠার মতো হবে। গুপির আর ছোটমামার মুখ পাংশুপানা।

পানু জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁকে খেতে দিয়েছিলে?' ছোটমামা আঁৎকে উঠলেন, 'এ্যাঁ? কই, না তো। ইয়ে কি বলে আমার আবার হাতে পায়ে সেই রকম খিল ধরেছে, তোরা ওঁকে খেতে দিয়ে আয়, বাপ। নিচের ডুলিতে সব আছে। আর দ্যাখ্ তাকের ওপর থেকে ওঁর কানা তোলা স্টেনলেস স্টিলের থালাটা নামিয়ে তাতে করে দিস। অন্য কিছুতে দিলে যদি রেগে টেগে যান।' বলে চোখ বুজে ছোটমামা কি রকম ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগলেন।

তাই দিয়ে এল ওরা। ভবিষ্যতে যারা পুলিসের গোয়েন্দা হবে তাদের কি আর বনবেড়াল ভয় করলে চলে। ছিটকিনি খুলতেই পাটকিলে জানোয়ারটা খাট থেকে নেমে এল। ওরা মেঝের ওপর থালা নামিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজাটা একটু ফাঁক করে ধরল। গুপি সাহস করে ডাকল, "বড়মামা! ও বড়মামা!' জানোয়ারটা লাল লাল চোখ করে বলল, 'গ্‌র্‌র্‌র্‌র্' ওরা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়ে এ-ঘরে চলে এল।

গুপি খাটে বসে বলল, 'একটু খোঁজই নেওয়া যাকরে, পানু। যদি কিছু ওষুধপত্র করা যায়। নইলে দিদার ফিটের ব্যামো বেড়ে যাবে। তাছাড়া—না, ওঠ্।' পানু উঠে পড়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'তাছাড়া কি?—কি বড় বড় নখ দেখেছিলি, আচ্ছা

উনি কি নখ কাটতেন না ? আর দ্যাখ, চার মণি মানুষটা দিয়ে কি আর ঐ রকম শুধু একটা জানোয়ার হয়েছে, কম করে গোটা আষ্টেক হয়ে থাকবে।' গুপি বলল 'এ্যাঁ। । বলিস্ কি ! তা হলে ওষুধপত্র করতেই হয়। বনবাসীরের গাঁ-টা কোথায় কি করে জানা যায় বল্ দিকি ? আমার জন্মদিনে পাইলট পেন দেবেন বলেছিলেন।'

পানু বলল, 'ছোটমামা যাবেন না ? ও ছোটমামা, ওঠ, বনবাসীদের গাঁ খুঁজতে যাব।' ছোটমামা শিউরে উঠে বললেন, 'খুঁজে দ্যাখ।' তাই দেখাই হল প্রথমে, গোটা বাড়িটাকে সরু চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে ফেলা হল! অদ্ভুত সব জিনিস বেরুল। পঞ্চাশ বছর আগেকার বুড়ো সাহেবের ডাইরি পর্যন্ত। তাতে অদ্ভুত সব কথা লেখা ছিল। ততক্ষণে গুপি পানুর আবার খিদে পেয়ে গেছিল বলে সদর দরজার চাবি দিয়ে সেই বিখ্যাত ভাঁড়ার ঘর খোলা হল। এ-বাড়ির একটা সুবিধা হল যে সব চাবি দিয়ে সব দরজা, কুলুপ, বাক্স-প্যাঁট্‌রা খোলা যায়। ভাঁড়ার ভোঁ-ভাঁ, একটা টিন কাটা আর রাশি রাশি খালি খাবার দাবারের টিন আর মাটি থেকে ছাদ অবধি শক্ত কাঠের চওড়া তাক আর বেজায় কড়া তামাকের গন্ধ ছাড়া স্রেফ পিঁপড়েদের খাবার পর্যন্ত কিছু ছিল না। হ্যাঁ, পিঁপড়ে বলতে মনে পড়ল তাকের ওপর একটা মস্ত চারকোনা কাঁচের বাক্সে কিছু পরিষ্কার বালি রাখা ছিল। বাক্সের ঢাকনিটাও পাশেই ছিল। গুপি বলল, 'এ সব হল অদৃশ্যকরণের ক্লু।' তাছাড়া একটিন খুব ভালো জাতের বিস্কুটও ছিল, বলা বাহুল্য সেগুলো নষ্ট হতে দেওয়া হল না। সব চাইতে ওপরের তাকে, প্রায় ছাদের কাছাকাছি ডাইরিটা পাওয়া গেছিল।

সবটা বিশ্বাসযোগ্য কি না বোঝা গেল না। নাকি রডো ডেনড্রন গাছে রোজ অজগর ঝুলতে দেখা যেত। কমলা গাছের মৌচাক থেকে প্রায়ই লালচে মেটে ভালুক মধু খেতে আসত।

বনবাসীদের ভিলেজে একা থাওয়া নিরাপদ নয়, তারা নানারকম তুকতাক জানে, যে যায় সে আর ফেরে না। বেয়ারারা বলে যে ফিরলেও তাদের চেনা যায় না, কারণ তাদের মানুষ চেহারা থাকে না। 'ভেরি সুপারস্টিশাস্ দিজ্ হিল্ পীপ্ল।' তারপর আর মাত্র এক দিনের কথাই লেখা ছিল। সাতাশ বছর আগেকার তারিখ দিয়ে লেখা, 'দেশে ফিরে যাবার আগে একবার বনবাসীদের গাঁয়ে যেতে হবে। আমার কুক্ বলছে সেখানে মস্ত তালাও আছে আর হেবেনের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই।' বাস্, তার পরের পাতাগুলো একেবারে ফাঁকা। স্পষ্টই বোঝা গেল ঐ উঁচু তাকে ৯৪৭ থেকে ডাইরিটা পড়ে ছিল, কেউ দেখেনি। গুপিরাও যদি খচ্মচ্ করে তাক বেয়ে না উঠত তো দেখতে পেত না। সঙ্গে একটা ভোঁতা কপি-ইং পেন্সিল পর্যন্ত ছিল। সায়েব তালাও দেখে ফিরেছিল কিনা সন্দেহ।

ডাইরি আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে গুপি পানু ভাঁড়ারের দরজটা সেই সদর দরজার চাবির সাহায্যে বন্ধ করে সটাং গেল রান্নাঘরের পাশে বাবুর্চির ঘরে। ওদের দেখেই বাবুর্চি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ইয়ে ইয়ে আমতা আমতা করে যা বলল তার মানে হল বনবাসীদের গ্রাম কোথায় ও জানে না, বনবাসীই দেখেনি কখনো চোখে, সাহেব যাবার আগে তাকে একশো টাকা বখশিস আর এক মাসের ছুটি দেবেন বলে গেছিলেন। ওর বাক্স-বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে, টাকাটা পেলেই চলে যায়, লাল ভালুকের সঙ্গে ও এক বাড়িতে থাকতে রাজি নয়, কে না জানে ওরা সত্যিকার জানোয়ার নয়।

এমন সময় গুটি এসে বলল ওর বাড়ি ঐ দিকে, ছোট সায়েবরা ওর সঙ্গে যেতে পারে, ওরা ওকে পেন্টেলুন দিয়েছে সে কি ভুলবার মতো কথা! তাই গেছিল ওরা, ছোটমামা তাঁর ঘরে শুয়ে রইলেন। বড়মামার ঘরের দরজায় সেই বিকট জানোয়ারটা তখনো নখ দিয়ে

আঁচড়াতে থাকল, কোনো বাড়তি জামা কাপড় না নিয়েই ওরা রওনা হয়ে গেল।

খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে টিকটিকির মতো গুটি উঠে গেল, ওরাও পিছন পিছন হাঁচড় পাঁচড় করে চলল। দেখে গুটি মহা খুশি। এই তো মরদের বাচ্চা। ও-ই নাকি বলে কয়ে ওদের এখানকার বনের পাহারাদারের চাকরি পাইয়ে দেবে। উঠতে উঠতে যখন মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে হাপর চলছে, তখন গুটি থামল। ওরা চেয়ে দেখল সামনে মস্ত নীল হ্রদ, তার পিছনে গাঢ় সবুজ পাহাড়ের সারি, তার পিছনে ফিকে সবুজ পাহাড়, তার পিছনে ঘন নীল পাহাড় আর সবার পিছনে সাদা বরফের পাহাড়ে বিকেলের রোদ পড়ে লালচে দেখাচ্ছে। ওরা তো থ'।

তালাওয়ের অন্য তীরে, বনের ধারে, পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ি, আঁকাবাঁকা পথ, খচ্চরের সারি, ছিপ হাতে লালমুখো সাহেব-মেম। বাবা! কি তাদের রাগ! 'কে তোমাদের এখানে আসবার অনুমতি দিয়েছে? তোমরা নিশ্চয় নিগ্রো টিগ্রো হবে. ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের পারমিট আছে? এখানে যাকে তাকে মাছ ধরতে দেওয়া হয় না।'

ওরা যত বলে মাছ ধরতে আসেনি, ওরা ভারতীয় নাগরিক, ওদের পারমিট লাগবে না, কে কার কথা শোনে। 'আচ্ছা, সরদারদের আর ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি হলে কত তেড়িবেড়ি কর দেখা যাবে। মাঝখান থেকে চ্যাঁচামেচি করে দিলে তো সব মাছ

তাড়িয়ে! এখন কাল সকালের আগে ওরা তীরের কাছে আসবে না।'

সত্যি সত্যি ধরে নিয়ে গেল ওদের সরদারদের কাছে। হ্রদের কাছে লাল টালির ছাদ দেওয়া কাঠের সাদা বাড়ি, তার বারান্দায় খুব আড্ডা জমেছে। পানু সব দেখে থ' মেরে গেছিল। কানে কানে গুপি বলল, 'হয়তো সত্যি সাহেব নয়, গুন করে বানিয়েছে।' এমন সময় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে রেগে মেগে যে লোকটি নেমে এলেন, তিনি সত্যি বড়মামা ছাড়া কেউ নন। বললেন 'দিলি তো সব পণ্ড করে, বড় পিঁপড়ে পালার প্রণালীটাও শিখতে দিলি না তো! তার জন্য মিছিমিছি এত তোড়জোড় করলাম!' বলে গুপির ঘাড় চেপে ধরলেন।

এমন সময় গুটি বলল, 'আমি শিখিয়ে দেব স্যার. আমার বাড়ি এইখানে, মা-পিঁপড়ে. ডিম, সব নিয়ে যাব। চলুন, বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।'

হলও তাই। বড় মামার কাঠের বাড়িতে ওরা যখন পৌঁছল তখন রাত দশটা। চারদিকে ফুট ফুটে চাঁদের আলো, রাতকে দিন করে রেখেছে। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আর সুমধুর গন্ধ আসছে, ছোটমামা গুলি কাবাব বানাচ্ছেন। বাবুর্চি হাওয়া।

খাওয়া-দাওয়ার পর বড়-মামা বললেন, 'লোকটা সত্যি চলে গেল? বেশ তো সুখে ছিল।' ছোটমামা বললেন, 'গুটি নাকি ভয় দেখিয়েছে ফিরে এসে যদি ওকে দেখতে পায় ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবে। না গিয়ে করে কি। গুটির বাবুর্চি হবার ইচ্ছা, রাঁধেও খাসা।' বড় মামা বললেন, 'গুটে!'

গুটি বলল, 'স্যার, কিছু বলবার আগে একবার আমার রান্না খেয়ে দেখুন তো। তারপর কাকাবাবুর রান্নাও মুখে রুচবে না। পিঁপড়েগুলোকে চিনি দিয়ে কাঁচের বাক্সে ভরিয়ে দিয়েছি!'

অমনি বড়মামা গলে জল। 'এক ইঞ্চি লম্বা ডিম দেয় ঐ

পাহাড়ি পিঁপড়ে ঐ ডিম না হলে মাছ ধরে সুখ আছে ? সেকালের সারদারঞ্জন রায় যে 'ইধর আও' মাছ ধরার চার বানিয়েছিলেন, এর কাছে সে-ও লাগে না, হুঁঃ! এরি জন্যে সরদারদের বন্দী করলাম, রাতে ছেড়েও দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বনবাসীদের গাঁয়ে গেলাম। তবু কিছু ভেঙে বলে না। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ফলাও ব্যবসা করছে কিনা ব্যাটারা। ভাগ্যিস্ গুটি ছিল যাঃ, তোকে আমার বাবুর্চিই করে দিলাম উঃফ ! শরীরটা যা ক্লান্ত, শোব আর ঘুমোব !'

অমনি সবার চক্ষু ছানা বড়া ! শোবে আর ঘুমোবে কি ? ঘরে তো সেই পাটকিলে জানোয়ার নখে শান দিচ্ছে। গুপি আগে গিয়ে দরজা খুলল থালাবাটি চাঁচা পোঁছা, ঘরে কেউ নেই, জানলার জাল ওপর থেকে নিচে অবধি নখ দিয়ে ফাড়া ! ঘরময়, চিড়িয়াখানার গন্ধ। বড়মামা বাতাস শুঁকে বললেন, 'রেকুনটা এসেছিল বুঝি ? বড় জ্বালাতন করে। চাদর বদলে দে, গুটে।'